বৌদ্ধধর্ম

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

বৌদ্ধধর্ম

বাংলা সাহিত্যের সমুদ্র হইতে
আরো কিছু মনি-মুক্তো সংগ্রহ করুন

নীচের লিংক হইতে

www.banglabooks.in

বৌদ্ধধর্ম

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

নবযুগ প্রকাশনী
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

©
প্রকাশক

নবযুগ সংস্করণ : মাঘ ১৪১৭, জানুয়ারি ২০১১

মূল্য : ২২০.০০ টাকা

প্রকাশক : অশোক রায় নন্দী, নবযুগ প্রকাশনী, ৬৭ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ। মোবাইল : ০১৭১১-৫২১৯৯৮, ০১৯৪০-১১২৬৭২
মুদ্রক : আবির কম্পিউটার, ০১৭১০-৫৪৬৩০১, মুদ্রণ : নিউ এস. আর প্রিন্টার্স
প্রাপ্তিস্থান লন্ডনে : সঙ্গীতা, ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন, ফোন : ০০৪৪২০৭২৪৭৫৯৫৪
ভারতে : দেজ পাবলিশিং, নয়া উদ্যোগ কোলকাতা, সুবর্ণরেখা (শান্তিনিকেতন)।
প্রচ্ছদ : সুখেন দাস

Bouddha Dharmo : By Haraprasad Shastri.
Published By Ashok Roy Nandi of Nabajuga Prokashani
67 Paridas Road, Banglabazar, Dhaka-1100, Bangladesh.
Date of publication January 2011. Price : Tk. 220.00.
ISBN–978-984-8858-22-6

সূচিপত্র

বৌদ্ধ কাহাকে বলে ও তাঁহার গুরু কে? — ৭
প্রাসঙ্গিক তথ্য — ১৫
নির্বাণ — ২২
প্রাসঙ্গিক তথ্য —
নির্বাণ কয় রকম? — ৩২
প্রাসঙ্গিক তথ্য — ৩৪
কোথা হইতে আসিল? — ৩৭
প্রাসঙ্গিক তথ্য — ৪৯
হীনযান ও মহাযান... — ৬২
প্রাসঙ্গিক তথ্য — ৬৮
মহাযান কোথা হইতে আসিল? — ৭২
প্রাসঙ্গিক তথ্য — ৭৭
সহজযান — ৮২
প্রাসঙ্গিক তথ্য — ৮৯
বৌদ্ধধর্মের অধঃপাত — ৯৫
প্রাসঙ্গিক তথ্য — ১০১
বৌদ্ধধর্ম কোথায় গেল? — ১০৬
প্রাসঙ্গিক তথ্য — ১১০
এখনো একটু আছে — ১১৪
প্রাসঙ্গিক তথ্য — ১২১
উড়িষ্যার জঙ্গলে — ১২২
প্রাসঙ্গিক তথ্য — ১২৯
জাতক ও অবদান — ১৩৭
প্রাসঙ্গিক তথ্য — ১৪১
দলাদলি — ১৪২
মহাসাংঘিক মত — ১৪৬
প্রাসঙ্গিক তথ্য — ১৪৯
থেরাবাদ ও মহাসাংঘিক — ১৫০
প্রাসঙ্গিক তথ্য — ১৫৪
মানুষ ও রাজা — ১৫৮
প্রাসঙ্গিক তথ্য — ১৬২

পরিশিষ্ট — ১৬৩
বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম — ১৬৫
প্রাসঙ্গিক তথ্য — ১৭২

১

বৌদ্ধ কাহাকে বলে ও তাঁহার গুরু কে?

বৌদ্ধধর্ম যত লোকে মানে, এত লোকে আর-কোনো ধর্ম মানে না। চীনের প্রায় সমস্ত লোকই বৌদ্ধ। জাপান, কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া, মঙ্গোলিয়া এবং সাইবিরিয়ার অধিকাংশ লোকই বৌদ্ধ। তিব্বতের সব লোক বৌদ্ধ। ভুটান, সিকিম, রামপুরবুসায়রের[১] সব লোক বৌদ্ধ। নেপালের অর্ধেকেরও বেশি বৌদ্ধ। বর্মা, সায়াম[২] ও আনাম[৩] অবচ্ছেদাবচ্ছেদে বৌদ্ধ। সিংহলদ্বীপে অধিকাংশ বৌদ্ধ।

বৌদ্ধধর্ম না মানিলেও ভারতবর্ষের অধিকাংশ হিন্দুই বৌদ্ধদিগের অনেক আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের মধ্যে এখনো অনেক জায়গায় বৌদ্ধ মত একটু বিকৃতভাবে চলিতেছে। চাটগাঁ, রাঙামাটির তো কথাই নাই। উহারা বর্মা আরাকানের শিষ্য। উড়িষ্যার গড়জাত মহলের মধ্যে অনেকগুলি রাজ্যে এখনো বৌদ্ধ মত চলে। তাহার মধ্যে বোধ নামক রাজ্য যে বৌদ্ধমতাবলম্বী তাহা নামেই প্রকাশ পাইতেছে। বৌদ্ধেরা এই-সকল মহলে অনেকদিন প্রচ্ছন্নভাবে ছিলেন। সম্প্রতি তাঁহারা মহিমপন্থ[৪] নামে এক নূতন বৌদ্ধ মত চালাইয়াছেন। বাংলায় যাহারা ধর্মঠাকুরের পূজা করে তাহারা যে বৌদ্ধ একথা এখন কেহ অস্বীকার করেন না।[৫] বিঠোবা ও বিল নারায়ণের প্রতিমূর্তি বলিয়া পূজা হয়, কিন্তু এই দুই দেবতার ভক্তেরা আপনাদিগকে বৌদ্ধ বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। বাঙালিদের মধ্যে যে তন্ত্রশাস্ত্র চলিতেছে তাহাতে বৌদ্ধধর্মের গন্ধ ভরভর করে। যাহারা বলেন ৫ম মহাশূন্যে তারা ও ৬ষ্ঠ মহাশূন্যে কালিকা, তাঁহারা বৌদ্ধ ভিন্ন আর-কিছুই নহেন কারণ কোনো হিন্দু কখনো শূন্যবাদী হন নাই, হইবেন না ও ছিলেন না।

এককালে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব আরো বিস্তার হইয়াছিল। তুর্কিস্তান এককালে বৌদ্ধধর্মের আকর ছিল। সেখান হইতে সাময়েদরা[৬] এবং তুর্কিস্তানের পশ্চিমের লোকেরা বৌদ্ধধর্ম পাইয়াছিল। পারস্য এককালে বৌদ্ধধর্মপ্রধান ছিল। আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তান পুরাই বৌদ্ধ ছিল। পারস্যের পশ্চিমে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব নিতান্ত কম ছিল না। কারণ রোমান কাথলিকদিগের অনেক আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, পূজা-পদ্ধতি, বৌদ্ধদেরই মতো। রোমান কাথলিকদের মধ্যে দুইজন 'সেন্ট' বা মহাপুরুষ আছেন, তাঁহাদের নাম 'বারলাম' ও 'জোসেফট'[৭]। অনেক পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন যে, এই দুইটি শব্দ বৌদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব শব্দের রূপান্তরমাত্র।

অনেকে এই বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস লিখিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু কেহই ইহার সম্পূর্ণ ইতিহাস দিতে সক্ষম হন নাই। কারণ বৌদ্ধেরা বড়ো আপনাদের ইতিহাস লিখেন নাই। মুসলমানেরা সাত শত বৎসর ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা

ভারতের বৌদ্ধধর্মের নামও শুনেন নাই। তবকতিনাশিরি[৮] ওদন্তপুরী বিহার ধ্বংস হইবার ইতিহাস দিয়াছেন। তিনি বলেন, মহম্মদি বক্তিয়ার ঐ বিহারটাকে কেল্লা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন এবং যখন উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সমস্ত "দুর্গরক্ষী সৈন্য" বধ করিয়া ফেলিলেন, তখন দেখিলেন, সৈন্যদিগের চেহারা আর-এক রকম; তাহাদের সব মাথা মুড়ানো ও পরনে গেরুয়া কাপড়। তখন তিনি মনে করিলেন, ইহারা "সব মাথা মুড়ানো ব্রাহ্মণ"। আবুল ফাজল এত বড়ো 'আইনি আকবরি'[৯] লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও বৌদ্ধধর্মের নাম গন্ধ পাওয়া যায় না। বৌদ্ধদের ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা হিন্দুতে করে নাই, মুসলমানেরাও করে নাই, বৌদ্ধেরাও বড়ো করে নাই; করিয়াছেন ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা, আর সেই ইউরোপীয়দিগের শিষ্য শিক্ষিত ভারতসন্তান। কিন্তু ইহাদের চেষ্টা কিরূপ হইতেছে? শোনা যায় এককালে কোনো অন্ধনিবাসের লোকে হাতি দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। সকলেই অন্ধ, সুতরাং তাহাদের জীবন্ত হাতি দেখানো কঠিন। সেইজন্য অধ্যক্ষ অন্ধগুলিকে একটি মরা হাতির কাছে লইয়া গেলেন। কানারা হাত বুলাইয়া হাতি দেখিতে লাগিল। কেহ শুঁড়ে হাত বুলাইল, কেহ কানে হাত বুলাইল, কেহ দাঁতে হাত বুলাইল, কেহ মাথায় হাত বুলাইল, কেহ পিঠে হাত বুলাইল, কেহ পায়ে হাত বুলাইল, কেহ লেজে হাত বুলাইল, সকলেরই হাতি দেখা শেষ হইল। শেষে সকলে বাড়ি ফিরিয়া আসিল। সেখানে সকলে ঝগড়া করিতে লাগিল। কেহ বলিল হাতি কুলার মতো, কেহ বলিল হাতি নলের মতো, কেহ বলিল হাতি উল্‌টা ধামি, কেহ বলিল হাতি বড়ো উঁচু, কেহ বলিল হাতি থামের মতো, কেহ বলিল হাতি চামরের মতো। সকলেই বলিতে লাগিল 'আমার মতই ঠিক'। সুতরাং ঝগড়া চলিতেই লাগিল, কোনোরূপ মীমাংসা হইল না। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস সম্বন্ধেও প্রায় সেইরূপই ঘটিয়াছে। ইউরোপীয়েরা সিংহলদ্বীপেই প্রথম বৌদ্ধধর্ম দেখেন ও সেইখানেই পালি শিখিয়া বৌদ্ধদের বই পড়িতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা বলেন বৌদ্ধধর্ম কেবল ধর্মনীতির সমষ্টিমাত্র, উহাতে কেবল বলে 'হিংসা করিও না', 'মিথ্যা কথা কহিও না', 'চুরি করিও না', 'পরস্ত্রীগমন করিও না', 'মদ খাইও না'। হজ্‌সন [Brian Houghton Hodgson] সাহেব নেপালে বৌদ্ধধর্ম পাইলেন। তিনি দেখিলেন, বৌদ্ধদের অনেক দর্শন গ্রন্থ আছে এবং তাহাদের দর্শন অতি গভীর। কেহ বা শুদ্ধ বিজ্ঞানবাদীমাত্র, কেহ বা তাহাও বলেন না। যে-সকল দর্শনের মত আঠারো ও উনিশ শতে ইউরোপে প্রথম প্রকাশ হইয়াছিল, তিনি সেই-সকল মত নেপালের পুথির মধ্যে পাইলেন এবং বুঝিতে পারিলেন যে, এসকল মত বৌদ্ধদের মধ্যে দুই-তিন শতে চলিতেছিল। বিশপ বিগাণ্ডেট[১০] ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধধর্ম দেখিতে পান। তিনি দেখেন, উহার আকার অন্যরূপ। উহাতে পূজাপাঠ ইত্যাদির বেশ ব্যবস্থা আছে। তিনি দেখেন, বৌদ্ধমঠ মাত্রেই এক-একটি পাঠশালা। ছোটো ছোটো ছেলেরা পড়ে। যিনি তিব্বত দেশের বৌদ্ধধর্ম দেখিলেন, তিনি দেখিলেন, সেখানে কালীপূজা হয়, সেখানে মন্ত্রতন্ত্র আছে, হোমজপ হয়, মানুষপূজা হয়। চীন দেশের বৌদ্ধধর্ম আবার আর-এক রূপ। তাহারা সব মাংস খায়, সব জন্তু মারে; অথচ বৌদ্ধ। জাপানিরা বলে 'আমরা মহাযান অপেক্ষাও দার্শনিকমতে উপরে উঠিয়াছি।' অথচ আবার তাহাদের মধ্যে এক দল বৌদ্ধ আছে, তাহারা নানারূপ দেবদেবীর উপাসনা করে।

এইরূপে বৌদ্ধধর্ম নানা দেশে নানা মূর্তি ধারণ করিয়া রহিয়াছে; কোথাও বা উহা পূর্বপুরুষের উপাসনার সহিত মিশিয়া গিয়াছে, কোথাও বা ভূত প্রেত উপাসনার সহিত মিশিয়া গিয়াছে, কোথাও বা দেহতত্ত্ব উপাসনার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। কোথাও কোথাও আবার খাঁটি বুদ্ধের মত চলিতেছে, কোথাও খাঁটি নাগার্জুনের মত চলিতেছে। সুতরাং সমস্ত বৌদ্ধধর্মের একখানি পুরা ইতিহাস লেখা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। তাহার উপর আবার ভাষার গোল। বুদ্ধের বচনগুলি তিনি কী ভাষায় বলিয়াছিলেন জানা যায় না। তাঁহার বাড়ি ছিল কোশলের উত্তরাংশে। তিনি ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন কোশলে ও মগধে। এই দুই দেশের লোক বুঝিতে পারে এমন কোনো ভাষাতে তিনি ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন। এই দুই দেশেও আবার ভিন্ন অঞ্চলের লোকের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ছিল। তিনি সংস্কৃত ভাষায় বলেন নাই। যে-সকল অতি প্রাচীন বৌদ্ধ পুস্তক পাওয়া গিয়াছে, তাহা না-সংস্কৃত না-মাগধী, না-কোশলী; একরূপ মাঝামাঝি গোছের ভাষা। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা বোধ হয় ইহারই নাম দিয়াছেন 'মিশ্র ভাষা'। একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত ইহারই নাম দিয়াছেন Mixed Sanskrit।[১১] 'বিমলপ্রভা'[১২] নামে নয় শতের এক পুথিতে আমরা দেখিলাম যে, তৎকালে নানা ভাষায় বুদ্ধের বচন লেখা হইয়াছিল; মগধ দেশে মগধ ভাষায়, সিন্ধু দেশে সিন্ধু ভাষায়, বোট দেশে বোট ভাষায়, চীন দেশে চীন ভাষায়, মহাচীনে মহাচীন ভাষায়, পারস্য দেশে পারস্য ভাষায়, রুক্ষ দেশে রুক্ষ ভাষায়। আমরা জানি পারস্য দেশে মগের ধর্ম চলিত ছিল, অর্থাৎ সেখানকার লোক অগ্নি-উপাসক ও জরথ্রসার[১৩] শিষ্য ছিল। সে দেশে যে বৌদ্ধধর্ম প্রচার ছিল, একথাই শুনি নাই। তাহাদের ভাষায় যে আবার বৌদ্ধবচনগুলি লিখিত হইয়াছিল সে খবরও এই নূতন। রুক্ষ দেশ কাহাকে বলে, জানি না, রোম হইবারই সম্ভাবনা। কারণ, 'বিমলপ্রভা'য় বলে, উহা নীলা নদীর উত্তর। 'বিমলপ্রভা'য় আরো একটি নূতন খবর পাওয়া গিয়াছে। প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষায়ও বুদ্ধদিগের অনেক সংগীত লেখা হইয়াছিল, এ খবর এ পর্যন্ত অতি অল্প লোকেই জানেন।

বৌদ্ধ কাহাকে বলে?

বৌদ্ধ কাহাকে বলে, একথা লইয়া নানা মুনির নানা মত আছে। যাঁহারা সিংহলের বৌদ্ধধর্ম দেখিয়া এবং পালি পুস্তক পড়িয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, যাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়া বিহারে বাস করেন, তাঁহারাই যথার্থ বৌদ্ধ। গৃহস্থ বৌদ্ধদের তাঁহারা বৌদ্ধ বলিতে রাজি নহেন। তাঁহারা বলেন, 'ত্রিপিটকে' যাহা-কিছু ব্যবস্থা আছে, সবই বিহারবাসী ভিক্ষুদের জন্য। 'বিনয়পিটকে' যত বিধিব্যবস্থা আছে, সবই ভিক্ষুসংঘের জন্য। গৃহস্থ বৌদ্ধ উপাসক উপাসিকাদের তাহাতে স্থান নাই। আবার কেহ কেহ বলেন, যাহারা "পঞ্চশীল" গ্রহণ করে অর্থাৎ "প্রাণাতিপাত করিব না", "মিথ্যাকথা কহিব না", "চুরি করিব না", "মদ খাইব না", "ব্যভিচার করিব না"—এই পাঁচটি নিয়ম পালন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করে, তাহারাও বৌদ্ধ। কিন্তু তাহা হইলে এক জায়গায় ঠেকিয়া যায়। যে-সকল জাতি দিন-রাত প্রাণীহিংসা করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, যথা জেলে, মালা, কৈবর্ত, শিকারি, ব্যাধ, খেট, খটিক্ প্রভৃতি জাতির বৌদ্ধধর্মে প্রবেশের অধিকার একেবারেই থাকে না।

এদিকে আবার যাঁহারা নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধধর্ম দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন পৃথিবীসুদ্ধই বৌদ্ধ; কারণ, যিনি বোধিসত্ত্ব[১৪] হইবেন, তাঁহাকে জগৎ

উদ্ধারের প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। লঙ্কাবাসীর মতো আপনাকে উদ্ধার করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। এইজন্য নেপাল ও তিব্বতবাসীরা লঙ্কাবাসীদিগকে হীনযান বৌদ্ধ বলেন এবং আপনাদিগকে মহাযান বৌদ্ধ বলেন। এখানে 'যান' শব্দের অর্থ লইয়া অনেক বিবাদবিসংবাদ আছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা কেহ কেহ উহার ইংরাজি করেন Vehicle অর্থাৎ গাড়ি ঘোড়া ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবিক বৌদ্ধদিগের মধ্যে 'যান' শব্দের অর্থ পন্থ বা মত। আমরা যেমন এখন বলি নানকপন্থী দাদুপন্থী কবীরপন্থী, সেকালে বৌদ্ধেরা সেইরূপ বলিত শ্রাবকযান, প্রত্যেকযান, বোধিসত্ত্বযান, মন্ত্রযান ইত্যাদি। Vehicle-এর সহিত উহার কোনো সম্পর্ক নাই। মহাযান বৌদ্ধেরা আপনাদের বড়ো দেখাইবার জন্য আগেকার বৌদ্ধদিগকে হীনযানী বলিত, আর আপনাদিগকে বোধিসত্ত্বযান বলিত।

মহাযানী বৌদ্ধেরা যদি জগৎই উদ্ধার করিতে বসিলেন, তবে জগৎ-সুদ্ধই তো বৌদ্ধ হইয়া উঠিল। তাঁহারা বলেন 'আমরা বৈষ্ণব, শাক্ত, সৌর, গাণপত, পৌত্তলিক, রাজপূজক, ব্রাহ্মণপূজক প্রভৃতি সকলকেই উদ্ধার করিব।' কিন্তু সে উদ্ধারের পথ কী, সেকথা তাঁহারা স্পষ্ট করিয়া বলেন না; এইমাত্র বলেন 'যাহার যাহাতে ভক্তি, আমরা সেইরূপ ধারণা করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিব'। এ বিষয়ে কারণ্ডব্যূহে'[১৫] একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ আছে। বুদ্ধদেব, বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরকে[১৬] জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুমি কী করিয়া জগৎ উদ্ধার করিবে? জগতে তো নানা মুনির নানা মত, লোকে তোমার কথা শুনিবে কেন?" তখন করুণামূর্তি অবলোকিতেশ্বর বলিতেছেন, "আমি বিষ্ণুবিনেয়দিগকে বিষ্ণুরূপে উদ্ধার করিব, শিববিনেয়দিগকে শিবরূপে উদ্ধার করিব, বিনায়কবিনেয়দিগকে বিনায়করূপে উদ্ধার করিব, রাজবিনেয়দিগকে রাজরূপে উদ্ধার করিব, রাজভটবিনেয়দিগকে রাজভটরূপে উদ্ধার করিব।" এরূপে তিনি যে কত দেবতার বিনেয়দিগকে কতরূপে উদ্ধার করিবেন বলিয়াছেন, তাহা লিখিতে গেলে পুথি বাড়িয়া যায়, সেইজন্য উপরে তাহার কয়েকটিমাত্র দেওয়া হইল। এ মতে তাহা হইলে সকলেই বৌদ্ধ। এখন যেমন থিওজফিস্ট মহাশয়েরা বলেন, "তোমরা যে ধর্মেই থাকো,. যে দেবতার উপাসনাই করো, ধর্মে এবং চরিত্রে বড়ো হইবার চেষ্টা করিলেই, তোমরা থিওজফিস্ট এবং যে কেহ থিওজফিস্ট হইতে পারে।" এও কতকটা সেইরূপ, তবে ইঁহাদের অপেক্ষা মহাযানী বৌদ্ধদের জগতের প্রতি করুণা কিছু বেশি ছিল। তাঁহারা নিজেই চেষ্টা করিয়া জগৎ উদ্ধার করিতে যাইতেন। তোমার চেষ্টা থাকুক, আর নাই থাকুক, তাঁহারা বলিতেন, "আমরা নিজগুণে তোমায় উদ্ধার করিব"। সেইজন্য মহাযান ধর্মের সারের সার কথা "করুণা"। উঁহাদের প্রধান গ্রন্থের নাম 'প্রজ্ঞাপারমিতা'[১৭]। উহার নানারূপ সংস্করণ আছে; এক সংস্করণ শত সহস্র শ্লোকে, এক সংস্করণ পঁচিশ হাজার শ্লোকে, আর-এক সংস্করণ দশ হাজার শ্লোকে, এক সংস্করণ আট হাজার শ্লোকে, এক সংস্করণ সাত শত শ্লোকে, আর-এক সংস্করণ, সকলের চেয়ে ছোটো, স্বল্পাক্ষরা—'স্বল্পাক্ষরা প্রজ্ঞাপারমিতা'—উহার তিনটি পাতা মাত্র। 'প্রজ্ঞাপারমিতা' আরম্ভ করিতে হইলে কতকটা গৌরচন্দ্রিকা চাই— শেষ করিতে গেলেও কতকটা আড়ম্বর চাই। এইসব বাহ্য আড়ম্বর ছাড়িয়া দিলে উহাতে একটিমাত্র কথা সার—"সকল জীবে করুণা করো"।

মহাযানের মর্ম গীতায় একটি শ্লোকে প্রকাশ করিয়াছেন। সে শ্লোকটি অনেকেরই অভ্যাস আছে।

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তাস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহং ॥

গীতায় এ কথাটি ভগবানের মুখে দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু মহাযানে এই ভাবের কথা প্রত্যেক বোধিসত্ত্বের মুখে। বোধিসত্ত্বেরা নির্বাণের অভিলাষী, তাঁহারা মানুষ। ভগবানের মুখে যেকথা শোভা পায়, মানুষের মুখে সেকথা আরো অধিক শোভা পায়। ইহাতে বুঝা যায়, তাঁহাদের করুণা কত গভীর।

মহাযান মতে তাহা হইলে জীবমাত্রেই বৌদ্ধ, কিন্তু একথায় তো কাজ চলে না। ভারতবর্ষে তখন নানারূপ ধর্ম ছিল, মত ছিল, দর্শন ছিল, পন্থ ছিল, যান ছিল। মহাযান যেন বলিলেন, সকলেই বৌদ্ধ; কিন্তু তাঁহাদের বিরুদ্ধবাদীরা সেকথা মানিবে কেন? সুতরাং বৌদ্ধ কাহাকে বলে, এ বিচারের প্রয়োজন চিরদিন ছিল, এখনো আছে। ইহার মীমাংসা কী? বৌদ্ধেরা জাতি মানে না যে, ব্রাহ্মণাদির মতো জন্মিবামাত্রই ব্রাহ্মণ হইবে বা ক্ষত্রিয় হইবে বা শূদ্র হইবে, বৈষ্ণব হইবে বা শৈব হইবে। একে তো বৌদ্ধ গৃহস্থেরা বৌদ্ধ কিনা তাহাতেই সন্দেহ, তারপর তাহাদের ছেলে হইলে, সে ছেলে বৌদ্ধ হইবে কিনা তাহাতে আরো সন্দেহ। এখনো এ বিষয়ে কোনো ইউরোপীয় বা এদেশীয় পণ্ডিতেরা কোনো মীমাংসা করেন নাই, কিন্তু শুভাকরগুপ্তের[১৮] 'আদিকর্ম্ম রচনা' নামক বৌদ্ধদের স্মৃতিতে ইহার এক চূড়ান্ত নিষ্পত্তি দেওয়া আছে। তিনি বলেন, যে কেহ ত্রিশরণ গমন করিয়াছে সেই বৌদ্ধ!

ত্রিশরণ শব্দের অর্থ—

"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি"
"ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি"
"সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি"
"দ্বিতীয়মপি বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি"
"দ্বিতীয়মপি ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি"
"দ্বিতীয়মপি সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি"
"তৃতীয়মপি বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি"
"তৃতীয়মপি ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি"
"তৃতীয়মপি সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি"

বোধ হয় অতি প্রাচীন কালে ত্রিশরণ গমনের জন্য কোনো পুরোহিতের প্রয়োজন হইত না, লোকে আপনারাই ত্রিশরণ গ্রহণ করিত। কিন্তু পরে পুরোহিতের নিকট ত্রিশরণ লইবার ব্যবস্থা হয়। 'হস্তসার' গ্রন্থে ভিক্ষুর নিকট ত্রিশরণ লইবার ব্যবস্থা আছে। যেমন খৃস্টানের পুত্র হইলেই সে খৃস্টান হয় না, তাহাকে বাপ্টাইজ করিলে তবে সে খৃস্টান হয়, সেইরূপ বৌদ্ধ পিতামাতার পুত্র হইলেও, যতক্ষণ সে ত্রিশরণ গমন না করে, ততক্ষণ তাহাকে বৌদ্ধ বলা যায় না। বৌদ্ধদের যতগুলি ধর্মকর্ম আছে, তাহার মধ্যে যে গুলিকে তাহারা অত্যন্ত সহজ বলিয়া মনে করিত এবং সকলের আগে সম্পন্ন করিত, সেই গুলিকে আদিকর্ম বলিত। সেইসকল আদিকর্মের মধ্যেও আবার ত্রিশরণ গমন সকলের আদি। 'বিমলপ্রভা'য়ও লেখা আছে, আগে ত্রিশরণ গমন, পরে এই জন্মেই বুদ্ধ হইবার জন্য

কালচক্র মতে লৌকিক ও লোকোত্তর সিদ্ধির চেষ্টা করিতে হইবে। রত্নত্রয়ের শরণ লইলেই যদি বৌদ্ধ হয় এবং সেরূপ শরণ লইবার জন্য যদি পুরোহিতের প্রয়োজন না থাকে, তাহা হইলে জেলে, মালা, কৈবর্তদের বৌদ্ধধর্মে প্রবেশের আর বাধা রহিল না। 'বিনয়পিটকে' লেখা আছে যে, যে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবে, তাহাকে ভিক্ষু করিতে পারিবে না ও তাহাকে সংঘে লইতে পারিবে না; কিন্তু তাই বলিয়া কি সে বেচারি বৌদ্ধ হইতে পারিবে না? শুভাকরগুপ্তের ব্যবস্থায় সে অনায়াসে বৌদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে।

বৌদ্ধধর্মের গুরু কে?

প্রথম অবস্থায় বৌদ্ধধর্ম সন্ন্যাসীর ধর্ম ছিল। যে সন্ন্যাস লইবে তাহাকে একজন সন্ন্যাসীকে মুরুব্বি করিয়া সন্ন্যাসীর আখড়ায় যাইতে হইত। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের নাম ভিক্ষু। সন্ন্যাসীর দলের নাম সংঘ। যেখানে সন্ন্যাসীরা বাস করিত তাহার নাম সংঘারাম। সংঘারামের মধ্যে প্রায়ই একটি মন্দির থাকিত, তাহার নাম বিহার। সেই মন্দিরের নাম হইতেই বৌদ্ধভিক্ষুদের আখড়াগুলিকে বিহারই বলিয়া থাকে।

শ্রাবকযানের গুরু

শিক্ষানবিশ একজন ভিক্ষুকে মুরুব্বি করিয়া সংঘে উপস্থিত হন। সেখানে গেলে সর্বাপেক্ষা বুড়া ভিক্ষু, যাঁহাকে স্থবির বা থেরা বলে, তিনি নবিশকে কতকগুলি কথা জিজ্ঞাসা করেন। জিজ্ঞাসার সময় সঙ্গে আর পাঁচ জন ভিক্ষুও থাকা চাই। স্থবির নবিশের নামধাম জিজ্ঞাসা করিয়া লইতেন। তাহার কোনো উৎকট রোগ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিতেন, সে রাজদণ্ডে দণ্ডিত কিনা, তাহা জিজ্ঞাসা করিতেন, সে রাজার কোনো চাকরি করে কিনা তাহাও জিজ্ঞাসা করিতেন। তিনি আরো জিজ্ঞাসা করিতেন, তাহার ভিক্ষাপাত্র আছে কিনা, তাহার চীবর আছে কিনা, অর্থাৎ, ভিক্ষু হইতে গেলে যে-সকল জিনিস দরকার, তাহা তাহার আছে কিনা। সে এসব জিনিস আছে বলিলে তিনি সংঘকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "আপনারা বলুন, এই লোককে সংঘে লওয়া যাইতে পারে কিনা। যদি আপনাদের ইহাতে কোনো আপত্তি থাকে, স্পষ্ট করিয়া বলুন, যদি না থাকে তবে চুপ করিয়া থাকুন।" তিনি এইরূপ তিন বার বলিলে, যদি কোনো আপত্তি না উঠিত, তবে তিনি নবিশকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "তোমার উপাধ্যায় কে?" সে উপাধ্যায়ের নাম বলিলে, তাঁহার হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিয়া দেওয়া হইত। সে উপাধ্যায়ের নিকট সন্ন্যাসীর কী কী কাজ, সব শিখিত। এখনকার ছেলেরা যেমন মাস্টার মহাশয়দের মান্য করিয়া চলে, শিক্ষানবিশ, শ্রমণেরা, সেইরূপে আপনার উপাধ্যায়কে মান্য করিয়া চলিত। ক্রমে সে সব শিখিয়া লইলে, তাহাতে ও উপাধ্যায়ে কোনো প্রভেদ থাকিত না। সংঘে বসিলে, দু জনের সমান ভোট হইত।

উদাহরণ

বুদ্ধদেব যখন নন্দকে "প্রব্রজ্যা" দিয়াছিলেন, তখন তিনি উহাকে বৈদেহ মুনির হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। বৈদেহ মুনি নন্দকে আপনার বন্ধুর মতো দেখিতেন, বন্ধুর মতো তাহাকে পরামর্শ দিতেন ও শিক্ষা দিতেন। বুদ্ধদেব মধ্যে মধ্যে বৈদেহ মুনিকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "কেমন, নন্দ বেশ শিখিতেছে তো?" বৈদেহ মুনি যেমন জানিতেন, সমস্ত খুলিয়া বলিতেন। যেখানে বৈদেহ মুনি নন্দকে কোনো বিষয় বুঝাইতে অক্ষম হইতেন, বুদ্ধদেব নিজে গিয়া তাঁহাকে উহা বুঝাইয়া দিতেন। মহাকবি অশ্বঘোষের[১৯] 'সৌন্দরনন্দ' কাব্যে বৈদেহ মুনি ও নন্দের অনেক কথা লেখা

আছে। তাহাতে বেশ দেখা যায়, বৈদেহ মুনি নন্দের উপাধ্যায় হইলেও দু জনে পরস্পর বন্ধুভাবেই বাস করিতেন, তাঁহারা পরস্পর আপনাদিগকে সমান বলিয়া মনে করিতেন।

মহাযানের গুরু

মহাযান বৌদ্ধেরা উপাধ্যায়কে "কল্যাণমিত্র" বলিত। কল্যাণমিত্র শব্দ হইতেই বেশ বুঝা যাইতেছে যে, উভয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল, সে গুরুশিষ্যের সম্পর্ক নয়, পরলোকের কল্যাণকামনায় গুরুশিষ্যের মিত্র মাত্র। মহাযান-মতাবলম্বীরা দর্শনশাস্ত্রের খুব চর্চা করিতেন। এখানে গুরুশিষ্যে অত্যন্ত প্রভেদ হইবারই কথা, কিন্তু তাহা হইত না। সংঘে অধিকার দু জনেরই সমান থাকিত এবং উভয়ে পরস্পরের মিত্র হইতেন।

মন্ত্রযানের গুরু

ক্রমে যখন এত দর্শনশাস্ত্র পড়া, এত যোগ ধ্যান করা অত্যন্ত কঠিন বলিয়া মনে হইতে লাগিল, যখন ভিক্ষুরা বিবাহ করিতে লাগিলেন, প্রকাণ্ড একদল গৃহস্থ্য-ভিক্ষু হইয়া দাঁড়াইল, তখন মন্ত্রযানের উৎপত্তি হইল। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "মন্ত্র জপ করিলেই, পাঠ, স্বাধ্যায়, তপ প্রভৃতি সকল ধর্মকর্মেরই ফল পাওয়া যাইবে। 'প্রজ্ঞাপারমিতা' পড়িতে অনেক বৎসর লাগে, বুঝিতে আরো বেশি দিন লাগে এবং 'প্রজ্ঞাপারমিতা'র ক্রিয়াকর্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে আরো বেশি দিন লাগে। এত তো তুমি পারিবে না বাপু, তুমি এই মন্ত্রটি জপ করো, তাহা হইলে সব ফল পাইবে।" যখন বৌদ্ধধর্মের এই মত দাঁড়াইল, তখন গুরুশিষ্যের সম্পর্কটা খুব আঁটাআঁটি হইয়া গেল। তখন তিনটি কথা উঠিল— 'গুরুপ্রসাদ', 'শিষ্যপ্রসাদ', 'মন্ত্রপ্রসাদ', অর্থাৎ গুরুকে ভক্তি করিতে হইবে, শিষ্যকে স্নেহ করিতে হইবে, এবং মন্ত্রের প্রতি আস্থা থাকিবে। যে সময় বৌদ্ধধর্মের মধ্যে মন্ত্রযান প্রবেশ করে, সে সময় ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে গুরুশিষ্যের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল জানা যায় না। ব্রাহ্মণদের মধ্যে আচার্য ও শিষ্যের সম্পর্ক পিতাপুত্রের সম্পর্কের মতো। বাস্তবিকও যিনি শিক্ষা দিবেন, তিনি পিতার কার্যই করিবেন। সন্তানের শিক্ষার ভার তো পিতারই, তবে তিনি যদি না পারেন, তবে একজন প্রতিনিধির হস্তে সন্তানকে সমর্পণ করিয়া দিবেন। শিক্ষক বা আচার্য পিতার প্রতিনিধিমাত্র। আচার্যের মৃত্যুতে শিষ্যের ত্রিরাত্র অশৌচ গ্রহণ করিতে হইত। এখনো যিনি গায়ত্রী উপদেশ দেন, সেই আচার্য-গুরু মরিলে, ব্রাহ্মণকে ত্রিরাত্র অশৌচ গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু শিষ্য গুরুর দাস, তাঁহার যথাসর্বস্ব গুরুর, এই যে একটা উৎকট মত ভারতীয় ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে চলিতেছে, এ মতের মূলই মন্ত্রযান। মন্ত্রযানের গুরু ও শিষ্যের মধ্যে আর সেরূপ সমান ভাবটি রহিল না, একজন বড়ো ও একজন ছোটো হইয়া গেল।

বজ্রযানের গুরু

বজ্রযানে গুরু আরো বড়ো হইয়া উঠিলেন। তিনি স্বয়ং বজ্রধারী। এই যানের প্রধান কথা এই যে, দেবতাদিগের এবং বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বদিগের বজ্রধর নামে একজন পুরোহিত হইলেন। পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের উপর বজ্রসত্ত্ব নামে আর-একজন বুদ্ধ হইলেন। তাঁহাকে উহারা বুদ্ধগণের পুরোহিত বলিয়া মানিয়া থাকে। বজ্রসত্ত্ব কতকটা আদিবুদ্ধ বা ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিয়া বসিলেন। এই মতের গুরুদিগকে বজ্রাচার্য বলিত। বজ্রাচার্যের পাঁচটি অভিষেক হইত, মুকুটাভিষেক, ঘণ্টাভিষেক, মন্ত্রাভিষেক, সুরাভিষেক ও পট্টাভিষেক। তাঁহার দেশীয় নাম গুভাজু, অর্থাৎ, তিনি গুরু, তাঁহাকে সকলে ভজনা করিবে। সুতরাং শিষ্য হইতে তিনি উপরে উঠিয়া গেলেন। মন্ত্রযানে গুরুকে শিষ্যের "প্রসাদ" খুঁজিতে হইত, বজ্রযানে তাহার কোনোই দরকার নাই।

সহজযানের গুরুর উপদেশই সব। গুরুর উপদেশ লইয়া মহাপাপ কার্য করিলেও তাহাতে মহাপুণ্য হইবে। সহজযানের একজন গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, যে পঞ্চকাম উপভোগের দ্বারা মূর্খলোক বদ্ধ হয়, গুরুর উপদেশ লইয়া সেই পঞ্চকাম উপভোগ করিয়াই সে মুক্ত হইয়া যায়।

সহজযানের গুরু

গুরু উবএসো অমিঅরসু হবহিঁণি পীঅউ জেহি।
বহু সত্থথ মরুস্থলিহিং তিসিএ মরিথউ তেহি ॥

[বৌ-গা-দো, পৃ. ১০২]

"গুরুর উপদেশই অমৃতরস। যে-সকল হাবারা উহা পান না করে তাহারা বহু শাস্ত্রার্থরূপ মরুস্থলীতে তৃষ্ণায় মরিয়া যায়।" গুরুর উপদেশ ভিন্ন সহজপন্থীদের কোনো জ্ঞানই হয় না; আগম, বেদ, পুরাণ, তপ, জপ সমস্তই বৃথা; গুরুর উপদেশমাত্রই সত্য।

আগমবেঅপুরাণে পংড়িত্ত মাণ বহংতি।
পক্ক সিরিফল অলিঅ জিম বাহেরিত ভুময়ন্তি ॥

[বৌ-গা-দো, পৃ. ১২৩]

"যাহারা আগম, বেদ ও পুরাণ পড়িয়া আপনাদের পণ্ডিত মনে করিয়া গর্ব করে তাহারা পক্ক শ্রীফলে অলির ন্যায় বাহিরে বাহিরেই ঘুরিয়া বেড়ায়।"

এইরূপে যতই বৌদ্ধধর্মের পরিবর্তন হইতে লাগিল, গুরুর সম্মানও বাড়িয়া যাইতে লাগিল।

কালচক্রযানে যে গুরুর মান্য কত অধিক তাহা একটি কথাতেই প্রমাণ হইয়া যাইবে। 'লঘুকালচক্রতন্ত্রে'র টীকা 'বিমলপ্রভা' যিনি লিখিয়াছেন, সেই পুণ্ডরীক, আপনাকে অবলোকিতেশ্বরের নির্মাণকায় বা অবতার বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং তিনি স্বয়ং অবলোকিতেশ্বর, আর-কেহ নহেন। কালচক্রযানের পর লামাযানের উৎপত্তি। সকল লামাই কোনো-না-কোনো বড়ো বোধিসত্ত্বের অবতার। সুতরাং তিনি সাক্ষাৎ বোধিসত্ত্ব, সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী। লামাযান ক্রমে উঠিয়া দলাইলামাযানে পরিণত হইয়াছে। দলাইলামা অবলোকিতেশ্বরের অবতার। তিনি মরেন না, তাঁহার কায় মধ্যে মধ্যে নূতন করিয়া নির্মাণ হয়। তিনি একাকায় ত্যাগ করিয়া কায়ান্তর ধারণ করেন।

কালচক্রযান

বৌদ্ধধর্মে প্রথমে যে উপাধ্যায় মিত্রমাত্র ছিলেন, এক্ষণে তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের অবতার।

বৌদ্ধধর্মের এই দৃষ্টান্ত হিন্দুর সংসারেও প্রবেশ করিয়াছে। তন্ত্রমতে গুরুই পরমেশ্বর, গুরুর পাদপূজা করিতে হয়, যাহা ব্রাহ্মণের একেবারে নিষেধ, সেই গুরুর উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতে হয়, গুরু শিষ্যের সর্বস্বের অধিকারী, যে শিষ্য ধনজন, আপন স্ত্রীপুত্র ও দেহ পর্যন্ত গুরুসেবায় নিয়োগ করিতে পারে সেই পরম ভক্ত। বৈষ্ণবের মতেও তাই। তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া অনেকে এখন কর্তাভজা হইতেছেন।[২০] তাঁহারা বলেন, "গুরু সত্য, জগন্মিথ্যা, যা করাও তাই করি, যা খাওয়াও তাই খাই, যা বলাও তাই বলি।"

'নারায়ণ'
অগ্রহায়ণ, ১৩২১ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. রামপুরবুসায়র, পূর্বতন বুশহর-রিয়াসত দেশীয় রাজ্য ছিল, রাজধানী রামপুর। বর্তমানে হিমাচল প্রদেশের অন্তর্গত।

২. থাইল্যান্ডের নামান্তর সায়াম।

৩. ভিয়েৎনামের নামান্তর আনাম।

৪. ওড়িশার কেওনঝর অঞ্চলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে মহিমা গোঁসাই প্রচারিত ধর্ম মহিমাপন্থ বা অলেখ্‌পন্থ। বলা হয়, এক পাহাড়ের চূড়ায় দীর্ঘ তপস্যা করে ইনি সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁর মতে ঈশ্বর নিরাকার, কোনো পটে বা মূর্তিতে তাঁর মহিমা প্রকাশ করা যায় না। মহিমাপন্থীরা জাতিভেদ মানেন না। ধর্মের জন্য কৃচ্ছ্রসাধন অপ্রয়োজনীয় মনে করেন। কয়েকটি সরল সদাচারবিধি মেনে সংসারধর্ম পালন এই ধর্মের মূল উপদেশ। ব্যক্তিগত ঈশ্বরে বিশ্বাস ভিন্ন অন্য বহু বিষয়ে মহিমাপন্থের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের মিলের জন্য অনেকে একে বৌদ্ধধর্মেরই প্রকারভেদ বিবেচনা করেন। দ্র. *H-O-L*, p. 151; Nagendra Nath Vasu, *The Modern Buddhism and its Followers in Orissa*, Calcutta 1911.

৫. এই বইয়ে "রমাই পণ্ডিতের ধর্মমঙ্গল" প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক তথ্য দ্র.।

৬. উত্তর-পশ্চিম এশিয়ার তাইগা ও তুন্দ্রা অঞ্চলের আদিতম অধিবাসীদের অন্যতম সামোয়েদ্‌রা মঙ্গোল প্রবংশ থেকে উদ্ভূত। এদের জীবিকার উপায় ছিল শিকার, পশুপালন এবং কিছু চাষ-আবাদ।

৭. ভারতের খৃস্টধর্ম বিরোধী শক্তিমান রাজা আবেন্‌নের। ছেলে নেই বলে রাজার খুব দুঃখ। অনেক দিন পরে একটি ছেলে হল, নাম রাখা হল যোসাফাট। জ্যোতিষিরা বললেন, বড়ো হয়ে যোসাফাট পার্থিব ঐশ্বর্যের মোহ কাটিয়ে অলৌকিক শক্তির অধিকারী হবে। শুনে রাজার খুব ভাবনা হল। তিনি একটা আলাদা শহর তৈরি করিয়ে ছেলেকে সেখানে রাখলেন। মানুষের দুঃখকষ্টের কথা সে শহরে পৌঁছয় না। যোসাফাট এইভাবে বড়ো হলেন। বাবার অনুমতি নিয়ে এই নিঃসঙ্গ জীবন থেকে একবার বাইরে এলেন। তাঁর নজরে পড়ল একজন খঞ্জ এবং একজন অন্ধ। আর-একবার তিনি একজন মুমূর্ষু মানুষ দেখলেন। উপলব্ধি করলেন, সব মানুষই জরা এবং মৃত্যুর কবলে পড়ে। যোসাফাটের মনে শান্তি নেই। এমন সময়ে অরণ্যবাসী তাপস বারলায়াম বণিকের ছদ্মবেশে রাজধানীতে এলেন। দামি রত্ন দেখাবেন বলে যোসাফাটের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পেলেন। বারলায়াম যোসাফাটকে জগতের অনিত্যতা, মানবদেহের অপবিত্রতা, মানব জীবনের দুঃখময় স্বরূপ, পার্থিব মহিমা সুখ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার অর্থহীনতা বিষয়ে উপদেশ দিয়ে তাঁকে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করলেন। খবর পেয়ে রাজা আবেন্‌নের বারলায়ামকে বন্দি করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। অনেক চেষ্টা করেও রাজা যোসাফাটের মত পরিবর্তন করতে পারলেন না। রাজ্য দু ভাগ করে এক ভাগ ছেলেকে দিলেন। খৃস্টান যোসাফাটের রাজ্য ক্রমেই সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে, আবেন্‌নের-এর রাজ্য শ্রীহীন হয়ে যায়। এতে আবেন্‌নের খৃস্টধর্মের মহিমা উপলব্ধি করতে পারলেন। সভাসদদের সঙ্গে তখন রাজা নিজেও খৃস্টধর্মে দীক্ষা নিলেন। আবেন্‌নের-এর মৃত্যুর পরে যোসাফাট গোটা রাজ্যের ভার বারাখিয়াস নামে একজন খৃস্টানের হাতে তুলে দিয়ে অরণ্যে প্রবেশ করলেন। গুরু বারলায়ামের সঙ্গে তাঁর মিলন হল।

রোমান ক্যাথলিক খৃস্টানদের মান্য এই দুই মহাপুরুষের চরিত্র নিয়ে গড়ে ওঠা লোককাহিনীর ভিত্তি বুদ্ধদেবের জীবনকথা। এশিয়া এবং ইউরোপে কাহিনীটি ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছিল। আরবি সাহিত্যে অষ্টম শতাব্দী থেকে বিলাওয়াহার-যূদাসাফ নামে কাহিনীটির বিভিন্ন রূপ পাওয়া যায়। চীনের অন্তর্গত তুর্কিস্তান অঞ্চলে এর একটি খণ্ডিত ছন্দোবদ্ধ রূপ আবিষ্কৃত হয়েছে, দশম শতাব্দীর গোড়ায় লেখা। খৃস্টান জগতে কাহিনীটি সম্ভবত প্রথম গৃহীত হয়েছিল ককেসাস অঞ্চলে, ৯০০ খৃস্টাব্দে। আইসল্যাণ্ড থেকে ফিলিপাইনস্ পর্যন্ত সব খৃস্টান দেশেই এই কাহিনী নিয়ে কাব্য, নাটক লেখা হয়ে এসেছে।

৮. মৌলানা মিন্‌হাজুদ্দিন আবু উমর-ই-উস্‌মান্ রচিত ইতিহাস গ্রন্থ 'তবকাৎ-ই-নাসিরি'-তে ওদন্তপুরী মহাবিহার ধ্বংসের বিবরণ পাওয়া যায়। মিন্‌হাজুদ্দিন দিল্লির সুলতানদের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। ১২৪২-৪৩ খৃস্টাব্দে তিনি লক্ষণাবতী বা গৌড়ে ছিলেন। ১২৬০-৬১ খৃস্টাব্দে তাঁর গ্রন্থ রচনা করেন। বর্তমান বিহার রাজ্যের বিহার-শরিফে ওদন্তপুরী মহাবিহার ছিল। ওদন্তপুর বা ওদন্তপুরী মহাবিহার ধর্মপাল (আ. ৭৭০/৭৭৫-৮১০ খৃ.) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মনে করা হয়। দীপংকর শ্রীজ্ঞান এখানে ছাত্র ছিলেন, পরে প্রধান আচার্য হন। আনুমানিক ১১৯৩ খৃস্টাব্দে বা এর কাছাকাছি সময়ে বখ্‌তিয়ার খলজি এই বিহারের সমস্ত ভিক্ষুদের হত্যা করেন। বিহারটি তাঁর সৈন্য শিবিরে পরিণত হয়।

৯. সম্রাট আকবরের সচিব ও প্রধানমন্ত্রী আবুল ফজল রচিত পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত 'আইন-ই-আকবরি' সমকালীন মুঘল শাসনব্যবস্থা, ভূগোল, অর্থনীতি ও সামাজিক রীতিনীতির বিস্তৃত বিবরণ সংবলিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

১০. *Rev.* P. Bigandet, *The Life or Legend of Gautama, the Buddha of the Burmese,* 3rd. ed. 2 vols, London 1880.

১১. বৌদ্ধ সংস্কৃত বা বৌদ্ধ লেখকদের সংস্কৃত ভাষার তিন শ্রেণী। ১. অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত', 'সৌন্দরনন্দ' প্রভৃতি রচনার ভাষা। ২. 'ললিতবিস্তর', 'দিব্যাবদান', 'অবদানশতক', 'সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক' প্রভৃতি রচনার গদ্য অংশের ভাষা। ৩. 'মহাবস্তু', এবং 'ললিতবিস্তর' ও 'সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক'-এর কাব্যাংশের ভাষা। প্রথম শ্রেণীর রচনার ভাষার সঙ্গে পাণিনীয় সংস্কৃতের অমিল সামান্য। বেশি অমিল দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনার ভাষায়। অল্পসল্প ব্যাকরণ-দুষ্ট ও উপভাষাগত প্রয়োগ এবং মধ্যভারতীয় আর্যভাষার রীতি অনুযায়ী পদ প্রয়োগ আছে। তৃতীয় শ্রেণীর রচনার ভাষাকেই যথার্থ বৌদ্ধ-সংস্কৃত বলা যায়। সাধারণভাবে একে একদা বলা হত 'গাথা-ভাষা', এখন বলা হয় 'মিশ্র-সংস্কৃত'। ভাষা-তত্ত্বের দিক থেকে এ ভাষার গুরুত্ব আছে, কারণ, সংস্কৃতে অপ্রচলিত হয়ে যাওয়া আদি-ভারতীয় আর্যভাষার বাক্‌রীতির অনেক ছাঁটছোঁট ও নব্য-ভারতীয় আর্যভাষার বাগ্‌ধারার অনেক নবাঙ্কুর এতে স্বীকৃত হয়েছে। দ্র. Sukumar Sen, "An outline Syntax of Buddhistic Sanskrit", *Journal of the Department of Letters,* Vol. xvii, Calcutta University 1928; এবং এই বইয়ে সংকলিত "হিন্দু ও বৌদ্ধে তফাৎ" ও "বুদ্ধদেব কোন্ ভাষায় বক্তৃতা করিতেন" প্রবন্ধ। শ্রী সুকুমার সেন।

১২. 'লঘুকালচক্রতন্ত্ররাজটীকা'র অন্য নাম 'বিমলপ্রভা'। এই পুথি নেপালে পাওয়া গেছে। লেখক পুণ্ডরীক, নামান্তর জ্ঞানবজ্র।

১৩. ইরান দেশের প্রাচীন আর্যদের ধর্মগুরু অশো (ঋষি) জরথুশ্‌ত্র। বাবা রাজবংশীয় পণ্ডিত পোউরুশস্প, মা দোগ্‌দো (দুগ্ধোবা)। জন্মকালে নবজাতকের নাম রাখা হয় স্পিতম্।

স্পিতম্ পনেরো বছর বয়সে বনবাসী হন, প্রায় পনেরো বছর মহাতপস্যায় নিবিষ্ট থাকেন। তপস্যার অন্তে তিনি জরথুশ্ত্র নামে পরিচিত হন। জরথ = সোনালি, উশ্ত্র = প্রকাশ। জরথুশ্ত্র অর্থ সুবর্ণকান্তি। ঐশী কান্তিতে শরীর পূর্ণ হওয়ায় তাঁর এই নাম হয়েছিল। তিরিশ বছর বয়সের সত্যদ্রষ্টা এই ঋষি ইরান দেশে ধর্মপ্রচার শুরু করেন। প্রথম শিষ্য হন তাঁর কাকা মইধ্যেমাহ্। ইরানের পূর্ব-প্রদেশ বল্খ বা ব্যাক্ট্রিয়ার বাদশাহ্ বীশতাস্প গুশ্সস্প তাঁর ধর্ম গ্রহণ করায় জরথোশতি ধর্মের প্রচার বাধাহীন হয়। জরথুশ্ত্র খৃস্ট জন্মের প্রায় চার হাজার বছর আগে তাঁর ধর্মমত প্রচার করেছিলেন মনে করা হয়। ভিন্ন মতে জরথুশ্ত্র ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়। প্রাচীন ইরানে প্রত্যেক যুগের শ্রেষ্ঠ ধর্মগুরু বা দস্তুরান্ দস্তুর জরথুশ্ত্র-তেম রূপে পরিচিত হতেন।

আধুনিক গবেষকেরা মনে করেন শিরদরিয়া ও আমুদরিয়া নদী বিধৌত বিস্তীর্ণ সমতল ভূমিতে বসবাসকারী আর্যরা দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে ১৫০০ খৃস্টপূর্বাব্দের মধ্যে উত্তরভারত ও ইরানে প্রবেশ করেছিল (দ্র. E. Herzfeld, *Iran in Ancient East,* Oxford 1941)। ইরানের প্রাচীন ভাষা আবেস্তা এবং বৈদিক ভাষার মধ্যে প্রচুর সাদৃশ্য আছে। কোনো কোনো শব্দ আবেস্তা ও বৈদিকভাষায় বিপরীত অর্থে প্রযুক্ত। যেমন আবেস্তায় রাক্ষস বা দুষ্ট শক্তি বোঝাতে 'দেব' শব্দ ব্যবহৃত হয়। এর পলে কোনো কোনো দেবতার স্বরূপও বদলে যায়। যেমন ইন্দ্র, নাসত্য, বিধাতা প্রভৃতি দেবতা দানবরূপে পরিগণিত। অবশ্য সোম বা হওম, সূর্য বা হ্বরে, মিত্র বা মিথ্র প্রভৃতির উভয় ঐতিহ্যে একই স্বরূপ রয়ে গেছে। আবেস্তায় ধৃত সাহিত্যের অন্যতম প্রধান রচনা জরথুশ্ত্রের 'গাথা' বা স্বর্গীয় সংগীত। জরথুশ্ত্র তাঁর পাঁচটি গাথায় সূর্য, চন্দ্র, জল, আগুন, বাতাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তিকে দেবতা-রূপে উপাসনার রীতির পরিবর্তে একেশ্বরবাদ প্রচার করেন। তাঁর মতে একমাত্র অহুর-মজদ্ (অসুর+মেধস্) বা জ্ঞানময় পরমেশ্বরই সত্য। অহুর-মজদ্ নিরাকার। তাঁর ছয়টি প্রধান গুণ : ১. বোহুমোনো (বহুমনস্ বা শ্রেষ্ঠ মনন), ২. অষ (ঋত বা সৎ, সততা), ৩. খ্ষত্র (ক্ষত্র বা দৈবশক্তি), ৪. আর্মইতি (ভক্তি, ঈশ্বরে অনুরাগ), ৫. হউর্বতাৎ (সর্বতাৎ বা পরিপূর্ণতা), ৬. অমেরেতাৎ (অমৃতাৎ বা অমৃতত্ত্ব)। এই মহৎ গুণগুলি মনন-চিন্তনই অহুর-মজদের আরাধনার উপায়।

ঋষি জরথুশ্ত্রর প্রয়াণের পরে তাঁর ছেলে প্রধান আথ্রবান্ (অর্থবান্) বা ধর্মনেতা হন। যে পুরোহিতেরা এই ধর্ম জনসমাজে প্রচার করতেন তাঁদের বলা হত মগ। এঁদের সামাজিক প্রতিপত্তি ছিল ভারতের ব্রাহ্মণদের মতো। এঁরা জরথুশ্ত্রের মতবাদ ঈষৎ পরিবর্তিত করে প্রাচীন দেবদেবীদের ফজত বা দেবদূত রূপে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করেন। অবশ্য কোনো মূর্তি পূজা বা বলি দেওয়ার রীতি ফিরিয়ে আনা হয় নি। গ্রীস ও ইতালিতে এই পুরোহিতেরা তাঁদের জ্ঞানের জন্য মাগোই (Magoi) বা মাগি (Magi) নামে সমাদৃত হন।

১৪. বোধিসত্ত্ব, পালি বোধিসত্ত। বোধি বা জ্ঞানলাভে উন্মুখ সাধক, যিনি বুদ্ধত্ব অর্জনের আগের পর্যায়ে রয়েছেন। বুদ্ধদেবের চরিত্র আশ্রয় করে বোধিসত্ত্ব তত্ত্বের বিকাশ ঘটেছে। লোকশিক্ষক, সাধারণের হিতাকাঙ্ক্ষী, ধর্মপ্রচারক বুদ্ধদেবের ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বে কালক্রমে নানা অলৌকিক মহিমা আরোপ করা হয়। কল্পনা করা হয় সিদ্ধার্থ রূপে জন্মের আগে তিনি মানুষ ও পশু রূপে ৫৫০ বার জন্মগ্রহণ করেন ('পঞ্ঞঞ্ঞসত পঞ্ঞাস জাতক')। সমস্ত জন্মেই ইনি সৎকর্ম করেন। বিভিন্ন জন্মে তাঁর দ্বারা অনুষ্ঠিত দান, শীল, নৈষ্ক্রম্য, প্রজ্ঞা, বীর্য, ক্ষান্তি, সত্য, অধিষ্ঠান, মৈত্রী ও উপেক্ষা—এই দশটি সৎকর্মকে দশ

পারমিতা বলা হয়। দশ পারমিতায় নৈপুণ্যের জন্য তাঁর নামান্তর দশভূমিশ্বর। এই সুকৃতির অধিকারী দেবকল্প পুরুষকে বৌদ্ধশাস্ত্রে বোধিসত্ত্ব বলে উল্লেখ করা রীতি দাঁড়িয়েছিল। হীনযান মতে বুদ্ধত্বলাভের জন্য সিদ্ধার্থরূপে জন্মগ্রহণের পূর্ব পূর্ব জন্মে তিনি ছিলেন বোধিসত্ত্ব। বোধিসত্ত্বরূপে তিনি সাধারণ মানুষের মতোই জীবন যাপন করেন এবং পারমিতা লাভের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেন, জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেন। মহাযানীরা বললেন, সিদ্ধার্থ যদি পূর্ব পূর্ব জন্মে সাধারণ মানুষ হয়েও বোধিসত্ত্বত্ব অর্জন করে থাকেন তাহলে অন্য সাধারণ মানুষও বোধিসত্ত্ব হতে পারেন এবং কালক্রমে বুদ্ধত্ব অর্জন করতে পারেন। মহাযান মতে সিদ্ধার্থ ছাড়াও আরো বহু বোধিসত্ত্বের অস্তিত্ব স্বীকৃত। এই বোধিসত্ত্বরা ব্যক্তিগত নির্বাণ-মুক্তি আকাঙ্ক্ষা করেন না। বোধিসত্ত্ব স্তরে রয়ে গিয়ে সাধারণের মুক্তির উপায় নির্দেশ করেন। 'সদ্ধর্মপুণ্ডরীক', 'কারণ্ডব্যূহ', এবং 'নিষ্পন্নযোগাবলী' প্রভৃতি মহাযানশাস্ত্রে অগণিত বোধিসত্ত্বের মধ্যে সমন্তভদ্র, অক্ষয়মতি, ক্ষিতিগর্ভ, আকাশগর্ভ, গগনগঞ্জ, রত্নপানি, সাগরমতি, বজ্রগর্ভ, অবলোকিতেশ্বর, মহাস্থামপ্রাপ্ত, চন্দ্রপ্রভ, জালিনীপ্রভ, অমিতপ্রভ, প্রতিভানকূট, সর্বশোকতমোনির্ঘাতমতি, সর্বনিবরণ-বিষ্কম্ভী, মৈত্রেয়, মঞ্জুশ্রী, গন্ধহস্তি, জ্ঞানকেতু, ভদ্রপাল, সর্বাপায়জ্ঞহ, অমোঘদর্শী, সুরঙ্গম, বজ্রপাণি—এই ২৫ জনকে নিয়ে বোধিসত্ত্বমণ্ডলের বিবরণ পাওয়া যায়। বোধিসত্ত্বদের বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা এবং মূর্তিরূপ কল্পনা করা হয়েছিল। এঁরা শুভফলদায়ী দেবতা রূপে পূজিত হন।

১৫. মহাযান সূত্র গ্রন্থাবলীর অন্যতম 'কারণ্ডব্যূহ' গদ্যে লেখা। একই বিষয়ে শ্লোকবদ্ধ আর-একটি বই পাওয়া গেছে 'অবলোকিতেশ্বর-গুণকারণ্ডব্যূহ' নামে। বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘ এই ত্রিরত্নের তাৎপর্য ব্যাখ্যা এবং বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের জীবন ও শিক্ষা 'কারণ্ডব্যূহে'র বিষয়।

১৬. অবলোকিত এবং ঈশ্বর পদ দুটি সন্ধি করে অবলোকিতেশ্বর শব্দ গঠিত। অবলোকিত অর্থ দৃষ্ট, নিরীক্ষিত। কিন্তু ঈশ্বর পদযোগে গঠিত অবলোকিতেশ্বর-এর শব্দার্থ স্পষ্ট নয়। বৌদ্ধবিদ্যার প্রখ্যাত পণ্ডিতেরা যেসব অর্থ করেছেন তাতে অসঙ্গতি আছে। ব্যাকরণ সম্মত অর্থ ধরে সমস্ত ধারণা বা তত্ত্বের মূল তাৎপর্য সব সময়ে উন্মোচন করাও যায় না। বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর মহাযান অধিবিদ্যার একটি বিশিষ্ট তত্ত্ব। নির্বাণ অর্জন করেও জগতের দুঃখে অভিভূত অবলোকিতেশ্বর জগতের সমস্ত প্রাণীর দুঃখ মোচন না হওয়া পর্যন্ত নির্বাণ পরিত্যাগ করেন। তাঁর প্রতিজ্ঞা, যে জীব যেভাবে যাঁকে পূজা করে তিনি সেই রূপ ধারণ করে উপদেশ দেবেন। যারা তথাগতকে মানে তাদের তথাগত রূপে, মহেশ্বর বা বিষ্ণু বা বায়ু ইত্যাদির উপাসকদের মহেশ্বর বিষ্ণু বা বায়ু ইত্যাদি রূপ ধারণ করে ধর্মদেশনা করবেন। মহাযান মতের একটি মূল তত্ত্ব মহাকরুণা। অবলোকিতেশ্বর মহাকরুণা-বিগ্রহ। বহু বোধিসত্ত্বের মধ্যে প্রজ্ঞা-বিগ্রহ মঞ্জুশ্রী এবং করুণা-বিগ্রহ অবলোকিতেশ্বর প্রধান। মহাযান ধর্মে ক্রমে 'করুণা' তত্ত্বের গুরুত্ব বাড়ায় অবলোকিতেশ্বর প্রধানতম বোধিসত্ত্বের মর্যাদা পান। অন্য সব বোধিসত্ত্বের গুণ অব-লোকিতেশ্বরে আরোপ করা হয়। এমন-কি হিন্দু দেবতা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের চারিত্র বৈশিষ্ট্যও মিশে যায় অবলোকিতেশ্বরে। কোথাও কোথাও অবলোকিতেশ্বরকে বুদ্ধের উপর স্থান দেওয়া হয়েছে। অবলোকিতেশ্বর ধ্যানীবুদ্ধ অমিতাভ ও পাণ্ডরা থেকে উৎপন্ন। অমিতাভ কুলের নাম পদ্মকুল। প্রতীক চিহ্ন পদ্ম। শাক্যসিংহের নির্বাণের পর থেকে ভবিষ্যতে মৈত্রের বুদ্ধ আবির্ভূত না হওয়া পর্যন্ত অবলোকিতেশ্বরই সৃষ্টিরক্ষা এবং

ধর্মপ্রচারের অধিকারী। অবলোকিতেশ্বরের শক্তি তারা। তন্ত্রের প্রভাবে অবলোকিতেশ্বর কল্পনায় বিচিত্র বিবর্তন ঘটেছিল। অবলোকিতেশ্বর মূর্তিতে মাথা ও হাতের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। মূর্তির রঙ, প্রতীক চিহ্ন, অস্ত্র ও যান কল্পনায় বৈচিত্র্য দেখা দেয়। শক্তির সংখ্যাও বাড়ে। নেপালের মছন্দর বাহালের দেওয়ালে অবলোকিতেশ্বরের একশো আট রূপ আঁকা আছে। অবলোকিতেশ্বরের ধ্যানমন্ত্রগুলিতে কল্পিত রূপের মধ্যে প্রধান ষড়ক্ষরী লোকেশ্বর, সিংহনাদ, খসর্পণ লোকনাথ, হালাহল, পদ্মনর্তেশ্বর, হরিহরিহরিবাহনোদ্ভব, ত্রৈলোক্যবশংকর, রক্তলোকেশ্বর, মায়াজালক্রম, নীলকণ্ঠ, সুগতিসন্দর্শন, প্রেত-সন্তর্পিত, সুখাবতী, বজ্রধর্ম। 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ" এই ছয় অক্ষরের মন্ত্রটি অবলোকিতেশ্বরের সবচেয়ে শক্তিশালী সিদ্ধ-মন্ত্র। ভারত ও নেপাল ভিন্ন তিব্বত সহ, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে অবলোকিতেশ্বরের বহু মূর্তি পাওয়া গেছে। জাপানের কিয়োতো-য় রেন্‌গেও-ইন্ মন্দিরে ১২৫৪ খৃস্টাব্দে তৈরি সোনার তবকে মোড়া কাঠখোদাই সেন্‌জু-কান্‌নো বা অবলোকিতেশ্বরের মূর্তির হাতের সংখ্যা এক হাজার। দ্র. *I-B-I.*

১৭. মহাযান বৌদ্ধদর্শনের ঐতিহ্যে 'প্রজ্ঞাপারমিতা-সূত্র' আদি গ্রন্থ। এই নামে প্রচলিত বহু গ্রন্থের মধ্যে 'অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা-সূত্র'কে মূল সূত্রগ্রন্থ মনে করা হয়। ১৭৯ খৃস্টাব্দে একখানি প্রজ্ঞাপারমিতা-সূত্র চীনা ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। মহাযান মতে দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর্য, ধ্যান ও প্রজ্ঞা—এই ছয়টি বোধিসত্ত্বের সাধনীয়। এর মধ্যে প্রজ্ঞা শ্রেষ্ঠতম। প্রজ্ঞা অর্থ শূন্যতার জ্ঞান। শত সাহস্রিকা, পঞ্চবিংশতি সাহস্রিকা, দশ সাহস্রিকা, অষ্ট সাহস্রিকা প্রভৃতি নানা আয়তনের প্রজ্ঞাপারমিতা-সূত্র পাওয়া গেছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র এশিয়াটিক সোসাইটির বিব্‌লিওথেকা ইণ্ডিকা সিরিজে 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' প্রকাশ করেন (১৮৮৭-৮৮ খৃ.)।

১৮. শুভাকরগুপ্ত বিক্রমশীল মহাবিহারে মহাচার্য অভয়াকরগুপ্তের ছাত্র ছিলেন। রামপালের রাজত্বকালে (আ. ১০৭২/৭৭-১১২০/২৭ খৃ.) ইনি পাণ্ডিত্যে খ্যাতি অর্জন করেন। রামপালের রানীর তৈরি এটপুরী বিহারে শুভাকর কিছুদিন বাস করেন। জৈন নৈয়ায়িক হরিভদ্র সূরি শুভাকরের মতামত উদ্ধৃত করে সমালোচনা করেছেন।

১৯. সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি অশ্বঘোষ কুষাণ রাজা কনিষ্কের সভাকবি এবং তাঁর গুরু ছিলেন। আনুমানিক খৃস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে কনিষ্ক রাজত্ব করেন। অশ্বঘোষের জন্মস্থান সাকেত (অযোধ্যা)। তাঁর মায়ের নাম সুবর্ণাক্ষী। তারনাথ বলেন, তিনি সংঘগুহ্য নামে এক ধনী ব্রাহ্মণের চেয়ে, পরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। স্থবির পার্শ্ব, মতান্তরে পার্শ্বের শিষ্য পুণ্যযশা অশ্বঘোষের গুরু। অশ্বঘোষ চীন দেশে পুণ্যাদিত্য, পুণ্যশ্রীক এবং তিব্বতে কাল, দুর্দর্শ, মাতৃচেট, পিতৃচেট প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত। অশ্বঘোষের রচনাবলীর মধ্যে প্রসিদ্ধ 'বুদ্ধচরিত' এবং 'সৌন্দরনন্দ'। দুইটি সর্গবদ্ধ মহাকাব্য, 'রঘুবংশ'-'কুমারসম্ভব'-এর সঙ্গে তুলনীয়। 'বুদ্ধচরিতে'র বিষয় বুদ্ধের জীবন-কথা। মূল রচনা তেরো সর্গ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। চীনা ও তিব্বতি অনুবাদে আছে আটাশ সর্গ। 'সৌন্দরনন্দ' কাব্যে বুদ্ধের বৈমাত্র ভাই নন্দন বিলাসী গৃহজীবন থেকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ পর্যন্ত আঠারো সর্গে বর্ণিত। 'সৌন্দরনন্দ' আবিষ্কার করেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। চীনের অন্তর্গত তুরফানে প্রাচীন বৌদ্ধবিহারের ধ্বংসস্তূপ থেকে হাইনরিখ ল্যুডার্স Heinrich Luders অশ্বঘোষের লেখা নাটক 'শারদ্বতীপুত্রপ্রকরণ', সংক্ষিপ্ত নাম 'শারিপুত্রপ্রকরণ'-এর খণ্ডিত তালপাতার পুথি আবিষ্কার করে প্রকাশ করেন। নাটকের বিষয় শারিপুত্র ও মৌদ্‌গলায়নের প্রব্রজ্যা গ্রহণ। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নাটকের দশ প্রকারভেদের অন্যতম প্রকরণ-এর আঙ্গিক এই নাটকে

অনুসৃত। অশ্বঘোষের রচনাই সংস্কৃত কাব্য-নাটকের প্রাচীনতম নিদর্শন। পণ্ডিত-কবি অশ্বঘোষ দার্শনিক প্রজ্ঞা ও কবিত্বের সমন্বয়ে এক উচ্চাঙ্গ সাহিত্যের আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। সে ঐতিহ্য অনুসরণ করেন পরবর্তীকালের কবি কালিদাস। কালিদাসের রচনায় অশ্বঘোষের প্রভাব আছে। অশ্বঘোষের নামে প্রচলিত অন্যান্য রচনা 'বজ্রসূচী', 'সূত্রালংকার', 'মহাযানশ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্র', 'মহাযান-ভূমিগুহ্যবাচামূলাশাস্ত্র', 'দশদুষ্টকর্মমার্গসূত্র', 'গণ্ডীস্তোত্র'। তিব্বতে 'অষ্টবিঘ্নকথা', 'দশকুশলকর্মপথনির্দেশ' প্রভৃতি আরো কয়েকটি বই অশ্বঘোষের রচনা মনে করা হয়।

অশ্বঘোষকে মহাযানপন্থী মনে করা হলেও নিশ্চিতভাবে তাঁর রচনা বলে জানা যায় যেসব বই, তাতে মহাযান দর্শনের অস্তিত্ব সম্পর্কে মতবিরোধ আছে। শাস্ত্রীমশায় অশ্বঘোষ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—

"...He was born at Saketa in Oudh, his mother's name was Suvarnaksi, He was a *bhadanta,* he was a philosopher, a poet, a musician and a great preacher. His voice was so loud that he was called Asvaghosa (or neighing like a horse). Suzuki calls him a Mahayanist and has translated his philosophical work, *Mahayana-Sraddhotpada-Sutra,* or awakening of faith in Mahayana [Daisetz Teitaro Suzuki, *Asvaghosa's Discourse on the Awakening of Faith in the Mahayana,* Chicago, 1900]. But Mahayana was not yet. It came two generationts after Asvaghosa. The *Awakening* is a wonderful work. Its original has not been yet found. Suzuki translated the Chinese translation, which treats of the the great problems of Mahayana. But there is nothing of Mahayana in Asvaghosa's great epics. The *Buddhacarita* has been edited from very inferior materials by the late E. B. Cowell who was for some years the Principal of the Calcutta Sanskrit college. Better materials are now available as I have shown in one of my papers in the J-A-S-B ["A new manuscript of Buddha-Carita", NS : V, 1909, pp. 47-49]. But Cowell had done another thing, The Sanskrit *Buddhacarita* is only half the work, the other half is yet unavailable. But Cowell has translated the Chinese translation of *Buddhacarita* also which is complete in 28 cantos. His other epic the *Saundarananda* was discovered by me and has been edited by me from old and good materials. *[Saundarananda Kavya of Arya Bhadanta Asvaghosa,* ed. by Haraprasad Sastri, Rev. and ed. by Chintaharana Chakravarti, The *Bibliotheca Indica Series,* Asiatic Society, Calcutta 1939]. Both are epics of great merit written in Classical Sanskrit in which the majority of Buddhist works are written. The *Buddhacarita* deals with the epic life of Buddha and the *Saundarananda* with that of his step-brother Nanda. The doctrines are those of N. Buddhism and not yet of Mahayana. Buddha speaks

to Nanda, 'You have done your duty, you are emancipated, now go and preach and save others', exactly what the *Mahavastu* speaks of. It is not S. Buddhism for no emphasis is laid on discipline and the regulation of conduct. The poetry of both these works is of a very high order. The characters are distinct and very well-drawn. The images, the descriptions and the similes are all that can be desired. Subsequent Sanskrit poets, even Kalidasa is indebted to Asvaghose for many of his most admired similes. But I need not expatiate on them here as I have done so is the preface to my edition of the *Saundarananda.*

"It is said that emperor Kaniska invested Pataliputra. The King was not prepard to defend his capital and sued for peace but Kaniska demanded nine crores of rupees which the king had not. It was afterwards settled that the king should send Asvaghosa to Kaniska and the Emperor would value him at three crores of rupees. Buddha's alms-bowl was valued at three crores of rupees and some other relic at the same price. From this it will be seen how greatly Asvaghosa was appreciated by his contemporaries. Asvaghosa seems to have been originally a brahmana. His knowledge of the *Vedas* and the brahmanic law was deep and profound, he distinctly lays down that Buddha's religion was an outcome of the Samkhya doctrines of Kapila. Samkhya's aim was to become Kevala or absolute but Buddha saw that no entity can be absolute and unconditioned, and he so modified Kapila's doctrine as to destroy the entity of the soul." ("The Nor-thern Buddhism". *I-H-Q,* June 1925, pp. 209-11).

২০. আউলে চাঁদ (১৬৯৪/৯৫-১৭৬৯.৭০ খৃ.) প্রতিষ্ঠিত ধর্ম সম্প্রদায়। উলা গ্রামের মহাদেব বারুই এঁকে কুড়িয়ে পেয়ে মানুষ করেন। সংসারে উদাসীন আউলে চাঁদ ২৭ বছর বয়সে ধর্মগুরু রূপে স্বীকৃতি পান। তাঁর অনুরাগীদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই ছিলেন। বৈষ্ণব অধ্যাত্মসাধনার সঙ্গে সম্পর্কিত অথচ স্বতন্ত্র কর্তাভজা সম্প্রদায়ের ঈশ্বর বা মূল গুরুকে বলা হয় কর্তা। অধ্যাত্ম-সংগীত এঁদের সাধনার অঙ্গ। পীঠস্থান নদীয়া জেলার ঘোষপাড়া (কল্যাণী)। দোলপূর্ণিমায় ঘোষপাড়ায় আজও মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

২

নির্বাণ

বৌদ্ধধর্মের নির্বাণ বুঝিতে গেলে অনেকগুলি কথা বুঝিতে হয়; এবং সেই-সকল কথা বুঝিয়া উঠাও অতি কঠিন। মোটামুটি ধরিতে গেলে নির্বাণ শব্দে নিবিয়া যাওয়া বুঝায়। প্রদীপ যেমন নিবিয়া যায়, তেমনই মানুষ নিবিয়া গেল। প্রদীপ নিবিয়া গেলে কিছু থাকে না; মানুষ নিবিয়া গেলেও কিছুই থাকে না। এ কথাটা, শুনিতে যত সোজা, ভালো করিয়া বুঝিতে গেলে তত সোজা নয়। প্রদীপ নিবিয়া গেল, আর-কিছু নাই, একেবারে শেষ হইয়া গেল; কিন্তু মানুষ নিবিয়া গেলে কি সেইরূপ একেবারে শেষ হইয়া যায়? একেবারে 'নিহিল' হইয়া যায়? একেবারে 'এনিহিলেশন' হইয়া যায়? একেবারে 'নাস্তি' হইয়া যায়? এইখানেই গোল বাধিল। আমি একেবারে থাকিব না, এবং সেইটিই আমার জীবনের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হইবে? আমি তপ জপ, ধ্যান ধারণা করিব, শুদ্ধ আমার অস্তিত্বটি বিলোপ করিবার জন্য? এ তো বড়ো শক্ত কথা।

অনেকে মনে করেন, বুদ্ধ এইরূপ আত্মার বিনাশই নির্বাণ শব্দের অর্থ করিয়াছিলেন। এইজন্য অনেক পাদরি সাহেবেরা বলেন বৌদ্ধেরা নিহিলবাদী বা বিনাশবাদী। বুদ্ধ নিজে কী বলিয়াছিলেন, তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই। তাঁহার নির্বাণের পাঁচ শত বৎসর পরে লোকে তাঁহার বক্তৃতার যেরূপ রিপোর্ট দিয়াছে, তাহাই আমরা দেখিতে পাই। তাহাও আবার তিনি ঠিক যে ভাষায় বলিয়াছিলেন, সে ভাষার তো কিছুই পাওয়া যায় না। পালি ভাষায় তাহার যে রিপোর্ট তৈয়ারি হইয়াছিল, সেই রিপোর্টমাত্র পাওয়া যায়। তাহাতেও ঐরূপ প্রদীপ নিবিয়া যাওয়ার সহিতই নির্বাণের তুলনা করে। কিন্তু লোকে বুদ্ধদেবকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, নির্বাণের পর কী থাকে। সুতরাং নির্বাণে যে একেবারে সব শেষ হইয়া যায়, তাঁহার শিষ্যেরা সেটা ভাবিতেও যেন ভয় পাইত। বুদ্ধদেব সে কথার কী জবাব দিলেন, আমরা পরে তাহা বিবেচনা করিব।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর অন্তত পাঁচ-ছয় শত বৎসরের পর, কনিষ্ক রাজার গুরু অশ্বঘোষ[১] সাধারণ লোকের মধ্যে ধর্ম প্রচার করিবার জন্য একখানি কাব্য রচনা করেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, যেমন তিক্ত ঔষধ খাওয়াইবার জন্য কবিরাজেরা মধু দিয়া মাড়িয়া খাওয়ায়, সেইরূপ আমি এই কঠিন বৌদ্ধধর্মের মতগুলি কাব্যের আকারে লিখিয়া লোকের মধ্যে প্রচার করিতেছি। তিনি নির্বাণ সম্বন্ধে যাহা বলেন, সেটা বুদ্ধের কথার রিপোর্ট নহে, তাঁহার নিজেরই কথা। তিনি বৌদ্ধধর্মের একজন প্রধান প্রচারক, প্রধান গুরু এবং প্রধান কর্তা ছিলেন। তাঁহার কথা আমাদের মন দিয়া শুনা উচিত। তিনি বলিয়াছেন—

দীপো যথা নির্বৃতিমভ্যুপেতো
নৈবাবনিং গচ্ছতি নান্তরিক্ষম্।
দিশং ন কাঞ্চিৎ বিদিশং ন কাঞ্চিং
স্নেহক্ষয়াৎ কেবলমেতি শান্তিম্ ॥
এবং কৃতী নির্বৃতিমভ্যুপেতো
নৈবাবনিং গচ্ছতি নান্তরিক্ষম্।
দিশং ন কাঞ্চিদ্বিদিশং ন কাঞ্চিৎ
ক্লেশক্ষয়াৎ কেবলমেতি শান্তিম্ ॥

"প্রদীপ যেমন নির্বাণ হওয়ার পর পৃথিবীতে যায় না, আকাশেও যায় না, কোনো দিক্‌বিদিকেও যায় না; তৈলেরও শেষ, প্রদীপটিরও শেষ; সাধকও তেমনই ভাবে, নির্বাণ হওয়ার পর, পৃথিবীতেও যান না, আকাশেও যান না, কোনো দিক্‌বিদিকেও যান না। তাঁহার সকল ক্লেশ ফুরাইয়া গেল। তাঁহারো সব ফুরাইয়া গেল, সব শান্ত হইল।"

এখানে কথা হইতেছে "উপৈতি শান্তিম্"—"সব শেষ হইয়া গেল"—ইহার অর্থ কি নিহিল? ইহার অর্থ কি আত্মার বিনাশ? অস্তিত্বের লোপ? অশ্বঘোষও নির্বাণের পর আর-কিছু থাকিল কিনা, কিছুই বলিলেন না। এই দুইটি কবিতার পরই তিনি অন্য কথা পাড়িলেন। কিন্তু এই কবিতা দুইটির পূর্বে যে তিনটি কবিতা আছে, তাহা পড়িলে, নির্বাণ যে অস্তিত্বের লোপ, এরূপ বোধ হয় না। সে তিনটি কবিতা এই—

তজ্জন্মনো নৈকবিধস্য সৌম্য
তৃষ্ণাদয়ো হেতব ইত্যবেত্য।
তাংশ্ছিন্ধি দুঃখাদ্‌যদি নির্মুমুক্ষা
কার্য্যক্ষয়ঃ কারণসংক্ষয়াদ্ধি ॥
দুঃখক্ষয়ো হেতু-পরিক্ষয়াচ্চ
শান্তং শিবং সাক্ষিকুরুষ্ব ধর্ম্মম্।
তৃষ্ণাবিরাগং লয়নং নিরোধং
সনাতনং ত্রাণমহার্য্যমার্য্যম্ ॥
যস্মিন্নজাতির্নজরা ন মৃত্যুঃ
ন ব্যাধয়ো নাপ্রিয়সম্প্রযোগঃ।
নেচ্ছাবিপন্ন প্রিয়বিপ্রযোগঃ
ক্ষমং পদং নৈষ্ঠিকমচ্যুতং তৎ ॥

"অতএব তৃষ্ণা প্রভৃতিই নানাবিধ জন্মের হেতু এইটি মনে মনে বুঝিয়া, তোমার যদি মুক্ত হইবার ইচ্ছা থাকে, তবে সেই তৃষ্ণাকে ছেদ করো। যেহেতু, কারণের ক্ষয় হইলে, কার্যেরও ক্ষয় হইবে।

"এখানে তৃষ্ণাদি হেতুর ক্ষয় হইলে, তোমার দুঃখেরও ক্ষয় হইবে। অতএব তুমি 'ধর্ম'কে প্রত্যক্ষ করো। এ 'ধর্ম' শান্তিময়, মঙ্গলময়; ইহাতে তৃষ্ণার উপর বিরাগ হয়, ইহা তাঁহার মত, ইহাতে সর্বধর্মের নিরোধ হয়, ইহাই সনাতন ধর্ম, ইহাতেই পরিত্রাণ, ইহা কেহ হরণ করিতে পারে না, ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ।

"ইহাই চরম ও অচ্যুত পদ। ইহাতে জন্ম নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই, ব্যাধি নাই, শত্রুসমাগম নাই, নৈরাশ্য নাই, প্রিয়-বিরহ নাই, ইহাই পাইবার মতন জিনিস।"

যখন অশ্বঘোষ এই তিনটি কবিতার পর নির্বাণের ঐ দুইটি কবিতা লিখিয়াছেন, তখন তিনি নির্বাণ শব্দে অস্তিত্বের লোপ বুঝেন নাই। তিনি বুঝিয়াছেন যে, নির্বাণের পর আর কোনোরূপ পরিবর্তন হইবে না, অথচ অস্তিত্বেরও লোপ হইবে না।

পালি ভাষার পুস্তকে বুদ্ধদেবকে নির্বাণের পর কী থাকিবে এই কথা জিজ্ঞাসা করায়, তিনি কী উত্তর দিয়াছেন দেখা যাক। "নির্বাণের পর কিছু থাকিবে কি?" বুদ্ধদেব বলিলেন, "না"। "থাকিবে না কি?" উত্তর হইল, "না"। "থাকা-না-থাকার মাঝামাঝি কোনো অবস্থা হইবে কি?" বুদ্ধদেব বলিলেন, "না"। "কিছুই থাকা-না-থাকা এদুয়েরই বাহিরে কোনো বিশেষ অবস্থা হইবে কি?" আবার উত্তর হইল, "না"।

তবে দাঁড়াইল কী? এমন একটা অবস্থা দাঁড়াইল, যে অবস্থায় "অস্তি"ও বলিতে পারি না, "নাস্তি"ও বলিতে পারি না। এ দুয়ে জড়াইয়া কোনো অবস্থা নয়, এ দুয়ের অতিরিক্ত কোনো অবস্থাও নয়। ইহাতে পাওয়া গেল কোনো অনির্বচনীয় অবস্থা, যাহা কথায় প্রকাশ করা যায় না, মানুষের জ্ঞানের বাহিরে।

এই অবস্থাকেই মহাযানে "শূন্য" বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকে। "শূন্য" বলিতে কিছুই নয় বুঝায়, অর্থাৎ অস্তিত্ব নাই এই কথাই বুঝায়। কিন্তু বৌদ্ধ-পণ্ডিতেরা বলেন, "আমরা করি কী? আমরা যে ভাষায় শব্দ পাই না। নির্বাণের পর যে অবস্থা হয়, তাহা যে বাক্যের অতীত। ঠিক কথাটি পাই না বলিয়াই আমরা উহাকে "শূন্য" বলি। কিন্তু শূন্য শব্দে আমরা ফাঁকা বুঝাই না, আমরা এমন অবস্থা বুঝাইতে চাই যাহা অস্তিনাস্তি প্রভৃতি চারি প্রকার অবস্থার অতীত। "অস্তিনাস্তি-তদুভয়ানুভয়চতুষ্কোটিবিনির্মুক্তং শূন্যম্"।

শংকরাচার্য তাঁহার তর্কপাদে শূন্যবাদীদের নানারকমে ঠাট্টা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "যাহাদের মতে সবই শূন্য, তাহাদের সঙ্গে আর বিচার কী করিব?" তিনি বৌদ্ধদের "বিনাশবাদী" বলেন। তাঁহার মতে নৈয়ায়িকেরা "অর্দ্ধবিনশন" অর্থাৎ আধখানা বিনাশবাদী। কেন-না, নৈয়ায়িকেরাও বলেন, "অত্যন্ত সুখদুঃখ-নিবৃত্তির"র নামই "অপবর্গ"। সুখদুঃখ যদি একেবারেই না রহিল, তবে আত্মা তো পাথর হইয়া গেল। তাই শংকরের পর মহাকবি শ্রীহর্ষ[২] গৌতম ঋষিকে ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছেন—

মুক্তয়ে যঃ শিলাত্বায় শাস্ত্রমূচে সচেতসাম্।
গোতমং তমবৈত্যেব যথা বিত্থ তথৈব সঃ ॥

অর্থাৎ যে গোতম জীবন্ত প্রাণীকে পাথর করিয়া দিবার জন্য শাস্ত্র লিখিয়াছেন, তাঁহার নামটি সার্থক হইয়াছে, তিনি গোতমই বটেন—তাঁহার মতো গরু আর দ্বিতীয় নাই।

সাধারণ লোকে বলিবে পাথর হওয়াও বরং ভালো। কেন-না, কিছু আছে দেখিতে পাইব। শূন্য হইলে তো কিছুই থাকিবে না।

যাহা হোক অশ্বঘোষ যে নির্বাণের অর্থ করিয়াছেন, বুদ্ধদেব পালি ভাষার পুস্তকে উহার যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাতে নির্বাণ একটি অনির্বচনীয় অবস্থা। শুধু বাক্যের

অতীত নয়, মানুষের ধারণারও অতীত। এইরূপ অবস্থাকেই কি কাণ্ট (Immanuel Kant] ট্রান্সেণ্ডেন্টাল বলিয়া গিয়াছেন? কেন-না, ইহা মানুষের বুদ্ধি ছাড়াইয়া যায়, মানুষে ইহা ধারণা করিতে পারে না।

এরূপ অনির্বচনীয় না বলিয়া, অশ্বঘোষের মতে যে চরম ও অচ্যুতপদ আছে, তাহাকে অস্তি বলিয়া স্বীকার করো-না কেন? কিন্তু অস্তি বলিলে, এটা বিষম দোষ হয়। যতক্ষণ আত্মা থাকিবে, ততক্ষণ "অহং" এই বুদ্ধিটি থাকিবে। অহংজ্ঞান থাকিলেই অহংকার হইল। অহংকার থাকিলেই সকল অনর্থের যা মূল, তাই রহিয়া গেল। সুতরাং সে যে আবার জন্মিবে, তাহার সম্ভাবনা রহিয়া গেল। আরো কথা, আত্মা যখন রহিলই, তখন তাহার তো গুণগুলাও রহিল। অগ্নি কিছু রূপ ও উষ্ণতা ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। আত্মা থাকিলে তাহার একত্ব-সংখ্যা থাকিবে। একত্ব-সংখ্যাও তো একটি গুণ। সে আত্মার জ্ঞান থাকিবে? না, থাকিবে না? যদি জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে জ্ঞেয় পদার্থও থাকিবে, জ্ঞেয় পদার্থ থাকিলেও আত্মার মুক্তি হইল না। আর, আত্মার যদি জ্ঞান না থাকে, তবে সে আত্মা আত্মাই নয়। সেইজন্যই অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিতে' বুদ্ধদেব বলিতেছেন, "আত্মার যতক্ষণ অস্তিত্ব স্বীকার করিবে, ততক্ষণ উহার কিছুতেই মুক্তি হইবে না।" তাঁহার প্রথম গুরু অরাড় কালামের[৩] সাহিত বিচার করিয়া যখন তিনি দেখিলেন যে ইহারা বলে আত্মা দেহনির্মুক্ত অর্থাৎ লিঙ্গ-দেহ-নির্মুক্ত হইলেই, মুক্ত হয়, তখন সে মুক্তি তাঁহার পছন্দ হইল না। তিনি আত্মার অস্তিত্ব নষ্ট করিয়া আত্মাকে "চতুষ্কোটিবিনির্মুক্ত" করিয়া, তবে তৃপ্ত হইলেন।

তাঁহার শিষ্যেরা, আত্মাকে শূন্যরূপ, অনির্বচনীয়রূপ, চতুষ্কোটিবিনির্মুক্তরূপ, মনে করিলেও ক্রমে তাঁহাদের শিষ্যেরা আবার নির্বাণকে অভাব বলিয়া মনে করিত। তাহাদের মতে সংসার হইল ভাব পদার্থ এবং নির্বাণ অভাব। ভাবাভাব বলিতে তাহারা ভব ও নির্বাণ বুঝিত। তাহারো পরে আবার যখন তাহারা দেখিল যে, প্রকৃতপক্ষে ভব বা সংসার সেও বাস্তবিক নাই, আমরা ব্যবহারত তাহাদিগকে "অস্তি" বলিয়া মনে করিলেও বাস্তবিক সেটি অভাব পদার্থ, তখন তাহাদের ধর্ম অতি সহজ হইয়া আসিল। তখন তাহারা বলিল—

অপণে রচি রচি ভব নির্বাণা।
মিছেঁ লোঅ বন্ধাবএ অপনা ॥ [সরহপাদ]

অর্থাৎ ভবও শূন্যরূপ, নির্বাণও শূন্যরূপ। ভব ও নির্বাণে কিছুই ভেদ নাই। মানুষে আপন মনে ভব রচনা করে, নির্বাণও রচনা করে। এইরূপে তাহারা আপনাদের বদ্ধ করে। কিন্তু পরমার্থত দেখিতে গেলে কিছুই কিছু নয়। সবই শূন্যময়।

তাহা হইলে তো বেশ হইল। ভবও শূন্য, ভাবও শূন্য, আত্মাও শূন্য, সুতরাং আত্মা সর্বদাই মুক্ত, স্বভাবতই মুক্ত, "শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ"। তবে আর ধর্মেই কাজ কী? যোগেই কাজ কী? কঠোরেই বা কাজ কী? ধ্যানেই বা কাজ কী? সমাধিতেই বা কাজ কী? ধর্ম অধর্মেই বা কাজ কী? যার যা খুশি করো। তোমরা স্বভাবতই মুক্ত, কিছুতেই তোমাদিগকে বদ্ধ করিতে পারিবে না। পরম যোগীও যেমন মুক্ত, অতি পাপিষ্ঠও তেমনই মুক্ত।

এই জায়গায় সহজিয়া বৌদ্ধ বলিল যে, মূঢ় লোক ও পণ্ডিত লোকের মধ্যে একটি ভেদ আছে। সকলেই স্বভাবত মুক্ত বটে, কিন্তু মূঢ় লোকে পঞ্চকামোপভোগাদি দ্বারা আপনাদের বদ্ধ করিয়া ফেলে, পণ্ডিতেরা গুরুর উপদেশ পাইয়া, তাহার পর পঞ্চকামোপভোগ করিলে, কিছুতেই বদ্ধ হয় না।

"যেনৈব বধ্যতে বালো বুধস্তেনৈব মুচ্যতে।" যে পঞ্চকামোপ-ভোগাদি দ্বারা বালজাতীয় অর্থাৎ মূর্খ লোকে বদ্ধ হয়, পণ্ডিতেরা গুরুর উপদেশ পাইয়া তাহাতেই মুক্ত হয়।

আর-এক উপায়ে নির্বাণ ব্যাখ্যা করা যায়। মানুষের চিত্ত যখন বোধিলাভের জন্য অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তখন তাহাকে বোধিচিত্ত বলে। বোধিচিত্ত ক্রমে সৎপথে বা ধর্মপথে বা সদ্ধর্মপথে অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে যেমন তাহার পুনঃ পুনঃ জন্ম হইতে লাগিল, তেমনই সে উচ্চ হইতে অধিক উচ্চ উচ্চ লোকে উঠিতে লাগিল। যদি তাহার উদ্যম অত্যন্ত উৎকট হইয়া উঠে, তবে সে এই জন্মেই অনেক দূর অগ্রসর হইতে পারে। কাহারো কাহারো মতে সে এই জন্মেই বোধি লাভ করিতে পারে। বৌদ্ধদের বিহারে যে-সকল স্তূপ দেখা যায়, সেই স্তূপগুলিতে এই উন্নতির পথ মানুষের চোখের উপর ধরিয়া দিয়াছে। স্তূপগুলি প্রথমে একটি গোল নলের উপর খানিক দূর উঠিয়াছে। তাহার উপর একটি গোলের অর্ধেক। তাহার উপর একটি নিরেট চার কোণা জিনিস। তাহার উপর একটি ছাতা। তাহার উপর আর-একটি ছাতা, এটি প্রথম ছাতা হইতে একটু বড়ো। তাহার উপর আর-একটি ছাতা, দ্বিতীয় ছাতার চেয়ে আর-একটু বড়ো। চতুর্থটি তৃতীয় ছাতার অপেক্ষা একটু ছোটো, পঞ্চমটি আরো ছোটো। এইখানে এক সেট ছাতা শেষ হইয়া গেল। তাহারো উপর ছাতার খানিকটা বাঁট মাত্র। এই বাঁটের পর আবার আর-এক সেট ছাতা, কোনো মতে ১৩টি, কোনো মতে ১৬টি, কোনো মতে ২১টি, কোনো মতে ২৩টিও দেখা যায়। ছাতাগুলি ক্রমে ছোটো হইয়া উঠিয়াছে। ইহার উপর আবার খানিকটা ছাতার বাঁট। ইহার উপর আবার মোচার আগার মতো আর-একটা জিনিস। মোচার আগাটি বেড়িয়া উপরি উপরি চার পাঁচটি বৃত্ত আছে। মোচার আগাটি একেবারে ছুঁচের মতো।

বোধিচিত্ত প্রণিধিবলে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই তিনি এই স্তূপে উঠিতে লাগিলেন। স্তূপের নিচের দিকটা ভূত-প্রেত-পিশাচলোক ও নরক। তাহার উপর যে গোলের আধখানা আছে, সেটি মনুষ্যলোক। বোধিচিত্ত মানুষেরই হয়। সুতরাং সে চিত্ত এইখান হইতেই উঠিতে থাকে। প্রথমে দান, শীল, সমাধি ইত্যাদি দ্বারা সে ঐ নিরেট চারি কোণায় উঠিল। এটি চারি জন মহারাজার স্থান, তাঁহারা চারি দিকের অধিপতি। তাঁহাদের নাম ধৃতরাষ্ট্র, বিরূঢ়ক, বৈশ্রবণ ও বিরূপাক্ষ। তাহার উপর ত্রয়স্ত্রিংশ ভুবন। এখানকার রাজা ইন্দ্র এবং ৩৩ জন দেবতা এখানে বসবাস করেন। ইহার উপর তুষিত ভুবন। বোধিসত্ত্বেরা এইখান হইতে একবারমাত্র পৃথিবীতে গমন করেন এবং সেখানে গিয়া সম্যক্ সংবোধি লাভ করিয়া বুদ্ধ হন। ইহার পর যামলোক। ইহার পর নির্মাণরতিলোক, অর্থাৎ, ইঁহারা ইচ্ছামতো নানারূপে নানা ভোগ্যবস্তু নির্মাণ করিয়া উপভোগ করিতে পারেন। ইঁহাদের পরে যে লোক, তাহার নাম পরনির্মিতবশবর্তী,

অর্থাৎ, তাঁহারা নিজে কিছুই নির্মাণ করেন না, পরে নির্মাণ করিয়া দিলে, তাঁহারা উপভোগ করিতে পারেন। এই পর্যন্ত আসিয়া কামধাতু শেষ হইয়া গেল, অর্থাৎ, এইখানে আসিয়া বোধিচিত্তের আর-কোনো ভোগের আকাঙ্ক্ষা রহিল না।

এইখানে হইতে রূপলোকের আরম্ভ। কাম নাই, রূপ আছে, আর আছে উৎসাহ। সে উৎসাহে ধ্যান, প্রণিধি ও সমাধিবলে বোধিচিত্ত ক্রমশই উঠিতে লাগিলেন। রূপধাতুতে, প্রধানত, চারিটি লোক; অবশিষ্ট লোকগুলি এই চারিটিরই অধীন। এই চারিটি লোক লাভ করিতে হইলে, বৌদ্ধদের চারিটি ধ্যান অভ্যাস করিতে হয়। প্রথম ধ্যানে বিতর্ক ও বিবেক থাকে। দ্বিতীয় ধ্যানে বিতর্কের লোপ হইয়া যায়, প্রীতি ও সুখে মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। তৃতীয় ধ্যানে প্রীতি লোপ হইয়া যায়, কেবল মাত্র সুখ থাকে। চতুর্থ ধ্যানে সুখও লোপ হইয়া যায়, তখন বোধিচিত্ত রূপ অর্থাৎ শরীরের সম্পর্ক ত্যাগ করিতে চান।

রূপ ও শরীরের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া বোধিচিত্ত আরো অগ্রসর হইতে থাকেন। এবার তিনি রূপলোক ছাড়াইয়া উঠিয়াছেন। রূপলোক ছাড়াইয়া অরূপলোকে উঠিয়াছেন। তখন তিনি আপনাকে, সমস্ত বস্তু, এমন-কি নিরেট জিনিসটি পর্যন্ত তিনি আকাশ মাত্র দেখেন, অর্থাৎ সকলই তাঁহার নিকট অনন্ত ও উন্মুক্ত বলিয়া বোধ হয়। তাহার পর আত্মচিন্তা করিতে করিতে তাঁহার সম্পূর্ণ ধারণা হয় যে, কিছুই কিছু নয়। এই যে অনন্ত দেখিতেছি, ইহা কিছুই নয়। ইহারো উপর বোধিসত্ত্ব অগ্রসর হইলে তখন তাঁহার চিন্তা হইল এই যে কিছুই নয়, ইহার কোনো সংজ্ঞা আছে কিনা। যদি সংজ্ঞা থাকে তবে সংজ্ঞীও আছে। কিন্তু সংজ্ঞী তো নাই, সে তো অকিঞ্চন। সুতরাং সংজ্ঞাও নাই, সংজ্ঞীও নাই। ইহার পর বোধিচিত্ত সেই মোচার আগায় উঠিলেন। এই যে স্তূপ ইহাই "ত্রৈধাতুক লোক", তিনি এখন ইহার মাথার উপর। তাঁহার চারি দিকে অনন্তশূন্য, আর তাঁহার উঠিবার জায়গা নাই। তিনি সেইখানে হইতে অনন্তশূন্যে ঝাঁপ দিলেন। যেমন নুনের কণা জলে মিশিয়া যায়, তাহার কিছুই থাকে না। সেইরূপ বোধিচিত্তও আপনাকে হারাইয়া অনন্তশূন্যে মিশিয়া গেলেন। যেমন সমুদ্রের জলে একটু লোনা আস্বাদ রহিয়া গেল, তেমনি অনন্তশূন্যে বুদ্ধের একটু প্রভাব রহিয়া গেল। তাঁহার প্রণীত ধর্ম ও বিনয় অনন্তকালের জন্য ত্রৈধাতুকলোকের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল।

নির্বাণ বলিতে 'নাই' 'নাই-ই' বুঝায়। প্রথম প্রথম বৌদ্ধেরা এই 'নাই' 'নাই' লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিত। নির্বাণ হইয়া গেল, একটা অনির্বচনীয় অবস্থা উদয় হইল। ইহাতেই প্রথম প্রথম বৌদ্ধেরা সন্তুষ্ট থাকিত। কিন্তু পরে অনেকে ইহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা কেবল শূন্য হওয়াই চরম উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না। তাঁহারা উহার সঙ্গে আর-একটা জিনিস আনিয়া ফেলিলেন; উহার নাম 'করুণা'। ইহা যেমন তেমন করুণা নয়, সর্বজীবে করুণা, সর্বভূতে করুণা। রূপ ধাতু ত্যাগ করিয়া অরূপধাতুতে আসিয়া যেমন সকল পদার্থকেই আকাশের ন্যায় অনন্ত দেখিয়াছিলেন, এখন সেইরূপ করুণাকেও অনন্ত দেখিতে লাগিলেন। শুদ্ধ 'শূন্যতা' লইয়া যে নির্বাণ, প্রাণশূন্য, নিশ্চল, নিস্পন্দ, কতকটা পাথরের মতো, কতকটা শুকনা কাঠের মতো হইয়াছিল; করুণার স্পর্শে, তাহাতে যেন জীবন সঞ্চার হইল; নির্জীবে জীবন আসিল, উদ্দেশ্যশূন্যে উদ্দেশ্য আসিল, সত্য সত্যই শুষ্কতরু যেন মুঞ্জরিয়া উটিল। যাঁহারা অর্হৎ[৪] হওয়াই, অর্থাৎ

কোনোরূপে আপনাদের মুক্ত করাই, জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়াছিলেন, সমস্ত জগৎ যাঁহাদের চক্ষে থাকিলেও হইত, না থাকিলেও হইত, জগতের পক্ষে যাঁহারা সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, সেই বৌদ্ধরা এখন হইতে আপনার উদ্ধারটা আর তত বড়ো বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না, জগৎ উদ্ধার তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য হইল। আমার আমিত্বটুকু লোপ করিব, আমি মুক্ত হইব, আর আমার চারি দিকে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত-কোটি জীব বদ্ধ থাকিবে, একি আমার সহ্য হয়। বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর সংসারের সকল গণ্ডি পার হইয়া ধ্যান-ধারণাদি বোধিসত্ত্বের যা-কিছু কাজ, সব সাঙ্গ করিয়া, এমন-কি ধর্মস্তূপের আগায় উঠিয়া শূন্যতা ও করুণাসাগরে ঝাঁপ দিতে যান, এমন সময় তিনি চারি দিকে কোলাহল শুনিতে পাইলেন। তখন তাঁহার আমিত্ব চলিয়া গিয়াছে, তাঁহার আয়তন আকাশের মতো অনন্ত হইয়াছে, তাঁহার করুণাও আকাশের মতো অনন্ত হইয়াছে। তিনি দেখিলেন ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীব দুঃখে আর্তনাদ করিতেছে; জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসের কোলাহল"। তাহারা উত্তর করিল, "আপনি করুণার অবতার আপনি যদি নির্বাণ লাভ করেন, তবে আমাদের কে উদ্ধার করিবে?" তখন অবলোকিতেশ্বর প্রতিজ্ঞা করিলেন, "যতক্ষণ জগতের একটিমাত্র প্রাণী বদ্ধ থাকিবে, ততক্ষণ আমি নির্বাণ লইব না।"

খৃস্টের দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম মতে বৌদ্ধেরা ভারতবর্ষে এই মত লইয়াই চলিত। ইহাকেই তখনকার লোকে মহাযান বলিত। তাহারা মনে করিত এত বড়ো মত আর হইতে পারে না। যখন বোধিসত্ত্বেরা করুণায় অভিভূত হইয়া পড়িতেন, তখন তাঁহারা জীবের উদ্ধারের জন্য পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। বুদ্ধদেব যে পঞ্চশীল দিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাঙিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। আর্যদেব[৫] 'চিত্তবিশুদ্ধিপ্রকরণে' বলিয়া গিয়াছেন, "যে জগৎ উদ্ধারের জন্য কোমর বাঁধিয়াছে, তাহার যদি কোনো দোষ হয়, সে দোষ একেবারে ধর্তব্যই নয়।"

এই বৌদ্ধধর্মের চরম উন্নতি। মহাযানের দর্শন যেমন গভীর, ধর্মমত যেমন বিশুদ্ধ, করুণা যেমন প্রবল, এমন আর-কোনো ধর্মে দেখা যায় না। বুদ্ধদেবের সময় হইতে প্রায় হাজার বৎসর অনেক লোকে অনেক তপস্যা ও সাধনা করিয়া এই মতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে তখন বড়ো বড়ো রাজ্য ছিল, নানারূপ ধনাগমের পথ ছিল, কৃষি-বাণিজ্য ও শিল্পের যথেষ্ট বিস্তার হইতেছিল, বিদ্যার যথেষ্ট আদর ছিল, ধর্মেরও যথেষ্ট আদর ছিল। তাই এত লোকে এত শত বৎসর ধরিয়া একই বিষয়ে চিন্তা করিয়া এতদূর উন্নতি করিতে পারিয়াছিলেন।

চাণক্য শ্লোকে বলে, "ধন উপায় করা বড়ো সহজ, কিন্তু ধন রাখা বড়ো কঠিন।" জ্ঞানেরও তাই, জ্ঞান উপার্জন সহজ, কিন্তু জ্ঞানটি রক্ষা করা বড়ো কঠিন। মহাযানেরও এই জ্ঞান বেশি দিন রক্ষা হয় নাই। দেশ ক্রমে ছোটো ছোটো রাজ্যে ভাগ হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য লোপ হইয়া আসিল, লোকেও দেখিল যে বহুকাল চিন্তা করিয়া বহুকাল যোগসাধন করিয়া মহাযান হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব, সুতরাং একটা সহজ-মত বাহির করিতে হইবে। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা রাজার দত্ত বৃত্তিতে বঞ্চিত হইয়া যজমানদিগের উপর নির্ভর করিতে লাগিলেন; তাঁহাদের আর চিন্তা করিবার সময়ও রহিল না, সে স্বাধীনতাও রহিল না।

কিন্তু নির্বাণের কথা বলিতে গিয়া আমরা অনেক বাহিরের কথা বলিয়া ফেলিলাম। বোধ হয় এগুলি না বলিলে হইত না। মহাযানের নির্বাণ 'শূন্যতা' ও 'করুণা'য় মিশামিশি। এ নির্বাণের একদিকে 'করুণা' আর-একদিকে 'শূন্যতা', করুণা সকলেই বুঝিতে পারে। কিন্তু যে-সকল যজমানের উপর বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বেশি নির্ভর করিতে লাগিলেন, তাঁহাদিগকে শূন্যতা বুঝানো বড়োই কঠিন। তাঁহারা শূন্যতার বদলে আর-একটি শব্দ ব্যবহার করিতেন—সেটি "নিরাত্মা"। নিরাত্মা শব্দটি সংস্কৃত ব্যাকরণে ঠিক সাধা যায় না, কিন্তু এসময় বৌদ্ধেরা সংস্কৃত ব্যাকরণের গণ্ডির মধ্যে থাকিতে চাহিতেন না। তাঁহারা যজমানদিগকে বুঝাইলেন যে, বোধিসত্ত্ব যখন স্তূপের মাথায় দাঁড়াইয়া আছেন, তখন তাঁহারা চারি দিকে অনন্ত শূন্য দেখিতেছেন। এই শূন্যকে তাঁহারা বলিলেন 'নিরাত্মা', শুধু নিরাত্মা বলিয়া তৃপ্ত হইলেন না, বলিলেন "নিরাত্মাদেবী", অর্থাৎ নিরাত্মা শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ। বোধিসত্ত্ব নিরাত্মাদেবীর কোলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। পুরুষ মেয়ের কোলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলে যাহা হয়, যজমানেরা সেকথা অনায়াসেই বুঝিতে পারিল; কেন-না সেটা বুঝিতে তো কাহাকেও বিশেষ প্রয়াস করিতে হয় না। এখন নির্বাণের অর্থ কী দাঁড়াইল, তাহা আর প্রকাশ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। আর ঠিক ঐ সময়েই, যজমানেরা বেশ বুঝিল, মানুষের মন কত নরম হয়, কত করুণায় অভিভূত হয়। সে কথাও তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইল না। সুতরাং নির্বাণ যে শূন্যতা ও করুণার মিশামিশি, তাহাই রহিয়া গেল, অথচ বুঝিতে কত সহজ হইল। এ নির্বাণেও সেই অনির্বচনীয় ভাব ও সেই অনন্ত ভাব, দিকেও অনন্ত, দেশেও অনন্ত, কালেও অনন্ত।

'নারায়ণ'
পৌষ, ১৩২১ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. এই বইয়ের পৃ. ১৯ (প্রাসঙ্গিক তথ্য), সূত্র ১৯ দ্র.

২. 'নৈষধচরিত' মহাকাব্যের কবি শ্রীহর্ষ শ্রীহীর পণ্ডিত ও মামল্লদেবীর ছেলে। 'নৈষধচরিতে' তাঁর আরো কয়েকটি রচনার উল্লেখ আছে : 'স্থৈর্য্যবিচারপ্রকরণ', 'শ্রীবিজয়প্রশস্তি', 'গৌড়োর্বীশকুলপ্রশস্তি', 'অর্ণব-বিবরণ', 'ছিন্দপ্রশস্তি', 'শিবশক্তিসিদ্ধি' এবং 'নবসাহসাংকচরিতচম্পূ'। এসব বই পাওয়া যায় নি। শংকর-বেদান্তের প্রামাণ্য প্রতিপন্ন করে লেখা তাঁর 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য' একটি প্রসিদ্ধ রচনা। শ্রীহর্ষের সময় নিয়ে মতভেদ আছে। কোনো মতে নবম-দশম শতাব্দী, কোনো মতে দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধ।

৩. সংসার ছেড়ে যাবার পরে সিদ্ধার্থ বৈশালী নগরে অড়ার কালাম বা অণ্ড কালামের কাছে প্রথম দীক্ষা নেন। বুদ্ধঘোষ বলেন, অড়ার ব্যক্তি নাম, কালাম তাঁর পদবি। অড়ার কালাম পরম যোগী ছিলেন, যোগ নিবিষ্ট অবস্থায় তিনি বাহ্য জগৎকে অতিক্রম করতে পারতেন। এই অবস্থায় বস্তুর অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না বলে এর নাম আকিঞ্চন্য-আয়তন। সিদ্ধার্থ অল্পদিনেই আকিঞ্চন্য-আয়তন আয়ত্ত করেন এবং গুরুর সমকক্ষ হয়ে ওঠেন। কিন্তু

অনুভব করেন এই অবস্থা শূন্যময়ত্বের উপলব্ধি এনে দিলেও এ পথে নির্বেদ-বৈরাগ্য-নিরোধ-উপশম-অভিজ্ঞা এবং নির্বাণ লাভ করা যায় না। তাই তিনি অড়ার কালামকে ত্যাগ করে যান। সিদ্ধার্থ অড়ার কালামের কাছেই দীক্ষা নিয়েছিলেন কিনা এ বিষয়ে ভিন্ন মতও আছে। 'মিলিন্দ পঞ্হ্' অনুসারে ইনি সিদ্ধার্থের চতুর্থ গুরু। 'থেরীগাথা-অট্ঠকথা' অনুসারে অড়ার কালামের কাছে যাবার আগে তিনি ভগ্গবের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন।

৪. অর্হৎ, অর্হন্ত। অর্হ অর্থ উপযুক্ত বা যোগ্য। বৌদ্ধশাস্ত্রে রূপকভাবে ব্যবহৃত এই শব্দটির প্রাচীনতর ব্যবহার পাওয়া যায় 'ঋগ্বেদ' ও 'শতপথ ব্রাহ্মণ'-এ। বৌদ্ধমতে নির্বাণমুখী সাধনার চারটি স্তর। আধ্যাত্মিক প্রবাহের অন্তর্বর্তী যিনি হয়েছেন তিনি স্রোতাপন্ন, নির্বাণ লাভের আগে যাঁকে আর-একবার মাত্র জন্মাতে হয় তিনি সকৃদাগামী, যাঁকে আর-একবারও জন্মাতে হয় না তিনি অনাগামী, যিনি নির্বাণ লাভ করেছেন তিনি অর্হৎ। প্রথম অর্হৎ গৌতম বুদ্ধ। কৌণ্ডিন্য, ভদ্রজিৎ, বাষ্প, মহানাম ও অশ্বজিৎ—ভদ্রবর্গীয় পঞ্চক নামে পরিচিত এই পাঁচ জন ব্রাহ্মণকে বুদ্ধদেব প্রথম ধর্মান্তরিত করেন। এঁদেরও অর্হৎ মনে করা হত। ক্রমে বুদ্ধদেবের জন্ম-জন্মান্তর বাহিত প্রবাহ মূর্তি কল্পনা করে তাঁর উপরে অতিলৌকিক মহিমা আরোপ করা হয়। মনে করা হয়, তিনি এমন বহু বিদ্যা এবং বলের অধিকারী যা আর-কারো পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়। যেমন 'তিস্সো বিজ্জা' অর্থাৎ পূর্বনিবাসানু-স্মৃতি-জ্ঞান বা নিজের পূর্ব পূর্ব জন্ম সম্পর্কে জ্ঞান, চ্যুত্যুপপাদ-জ্ঞান বা অপরের জন্মান্তর সম্পর্কিত জ্ঞান, আশ্রবক্ষ্য-জ্ঞান, বা পূর্ণ বাসনা নিবৃত্তির জ্ঞান— এই তিন বিদ্যা তাঁর আয়ত্তগত। তিনি অসীম দৈহিক শক্তি, দিব্য-শ্রুতি ও পরচিত্ত-বিদিত হবার ক্ষমতার অধিকারী। তিনি স্থানাস্থান-জ্ঞান, কর্ম-বিপাক-জ্ঞান প্রভৃতি দশ বলের অধিকারী। চতু-বেসারজ্জ বা চার বৈশারদ্য তাঁর বিশেষ গুণ। অর্থাৎ সম্যক্ বোধি, পূর্ণ বাসনা-ক্ষয়, অকুশলের সংজ্ঞার্থ নির্ণয় এবং প্রদর্শিত মার্গের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে তাঁর আত্মপ্রত্যয় প্রশ্নাতীত। অর্হৎদের আর-সব গুণ থাকতে পারে কিন্তু চার-বৈশারদ্য একমাত্র বুদ্ধেরই গুণ। চতু-বেসারজ্জ-বিসারদো বুদ্ধ তাই অর্হৎ থেকে শ্রেষ্ঠ। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান— এই পঞ্চস্কন্ধ বা পাঁচটি উপাদান যোগে ব্যক্তি বা জীব গঠিত হয়। কাম, অস্তিত্বের বাসনা ও অজ্ঞান এই আসবের দ্বারা পঞ্চস্কন্ধ একত্র হয়। আসব সমূহের বিনাশ-সাধন করে যাঁরা ধর্মপথে আসেন, স্রোতাপন্ন হন, তাঁদের সাধনার সর্বোচ্চ পর্যায় অর্হতত্ব। অর্হৎ জীবন্মুক্ত দশায় জগতে অবস্থান করেন। অর্হৎরা নির্লিপ্তভাবে সমাজে বাস করতেন। ধর্মদেশনা দ্বারা মানুষের হিতসাধন করতেন। বুদ্ধদেব সাধনায় নারী-পুরুষের অধিকারভেদ মানতেন না। কোনো নারীও অর্হৎ হতে পারতেন। পরবর্তী বৌদ্ধ সাহিত্যে অর্হৎ-এর পরিবর্তে শ্রাবক শব্দের ব্যবহার দেখা যায়।

মহাযান মতে অর্হৎ বা শ্রাবকের চেয়ে বোধিসত্ত্ব শ্রেষ্ঠ। অর্হৎরা কেবল নিজের মুক্তির উপায় খোঁজেন, সকল সত্তার মুক্তি তাঁদের কাম্য নয়। 'শতসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা'য় বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি শ্রাবকত্ব অর্জনের পরামর্শ দেয় সে পাপমিত্র। বোধিসত্ত্বরা অর্হৎদের মতো ব্যক্তিগত মুক্তি আকাঙ্ক্ষা করেন না, সর্বসাধারণের মুক্তির পথ নির্দেশ করেন। অর্হৎ-এর আদর্শ নির্বাণ, বোধিসত্ত্বের আদর্শ অনুত্তর-সম্যক্-সম্বোধি। দ্র. এই বইয়ের পৃ. ১৭ (প্রাসঙ্গিক তথ্য), সূত্র ১৪ (বোধিসত্ত্ব)।

৫. 'চিত্তবিশুদ্ধিপ্রকরণ'-এর লেখক আর্যদেব খৃষ্টীয় সপ্তম অথবা অষ্টম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। সরহপাদের এক শিষ্য নাগার্জুন, নাগার্জুনের শিষ্য আর্যদেব। মাধ্যমিক দর্শনের

প্রবক্তা নাগার্জুন এবং তাঁর শিষ্য আর্যদেব ভিন্ন ব্যক্তি, তাঁদের আবির্ভাব কাল খৃষ্টীয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতাব্দী। নামে সাদৃশ্যে দুই আর্যদেবের রচনা অনেক সময়ে এক তালিকাভুক্ত করা হয়ে এসেছে। 'চিত্তবিশুদ্ধিপ্রকরণ' শাস্ত্রীমশায় আবিষ্কার ও প্রকাশ করেন। (দ্র. "The discovery of a work by Aryadeva in Sanskrit", *J-A-S-B,* Lxvi (I) 1898). শাস্ত্রীমশায়ের ধারণা 'চিত্তবিশুদ্ধিপ্রকরণ' প্রথম আর্যদেবেরই রচনা, দ্বিতীয় আর্যদেব পরিমার্জনা করেছিলেন।

"...His *Cittavisuddhi-prakarana* advocates Mahayana and says that when a man girds up his loins to save the world his petty faults should be overlooked by his contemporaries. He is very bitter against brahmanas. He says if salvation can be gaind by a dip into the Ganges then the fishermen are all saved, not to speak of the fish which are day and night immersed in it. The book has been revised by another Aryadeva in later times, for at the end are mentioned images not known in the great Aryadeva's time and there was one Aryadeva in Bengal who wrote also in Bengali." ("The Northern Buddhism", *I-H-Q,* Sept. 1925, p. 464).

বিনয়তোষ ভট্টাচার্য দ্বিতীয় আর্যদেবকেই 'চিত্তবিশুদ্ধিপ্রকরণ'-এর লেখক মনে করেন। এই আর্যদেব একজন বৌদ্ধ তান্ত্রিক। "It was written by the Tantric Buddhist writer Ayadeva or Aryadeva, but was wrongly attributed to the earlier Aryadeva, the pupil of Nagarjuna." *(S-M-II,* p. cxxxiv, FN), পি. বি. প্যাটেলের মতে বাংলা দেশে বজ্রযানের প্রতিপত্তির সময়ে খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের কিছু আগে আর্যদেব নামে একজন লেখক ছিলেন। ইনি সরহপাদের শিষ্য নাগার্জুন, ওড়িশার রাজা ইন্দ্রভূতি প্রভৃতির সমকালীন। 'চিত্তবিশুদ্ধিপ্রকরণ' এঁরই রচনা। দ্র. P. B. Patel ed. *Cittavisuddhiprakarana,* Visva Bharati 1949, Introduction.

৩

নির্বাণ কয় রকম ?

থেরাবাদী[১] বুদ্ধেরা ও প্রত্যেক-বুদ্ধেরা[২] মনে করিতেন, মানুষ যদি সদুপদেশ পাইয়া, অথবা, নিজে মনে মনে গড়িয়া লইয়া চারিটি আর্যসত্যে[৩] বিশ্বাস করে, আট রকম নিয়ম[৪] মানিয়া চলে, তাহা হইলে বহুকাল অভ্যাসের পর তাহারা স্রোতে পড়িয়া যায়। এইরূপ যাহারা স্রোতে পড়িয়া যায়, তাহাদের সোতাপন্ন বলে। স্রোতে পড়িলে যেমন সে আর উজান যাইতে পারে না, ভাটিয়াই যায়, সেইরূপ সোতাপন্ন নির্বাণের দিকেই যাইতে থাকেন, সংসারের দিকে তিনি আর-কখনো ফিরিয়া আসেন না। তাঁহার পুনঃ পুনঃ জন্ম হইলেও তিনি আর উজান বহেন না।

সোতাপন্ন আরো কিছুদিন নিয়ম পালন করিলে, তিনি "সকৃদাগামী" হয়েন, অর্থাৎ, তিনি আর-একবার মাত্র জন্ম গ্রহণ করেন। বুদ্ধদেব এই "সকৃদাগামী" অবস্থাতে তুষ্ণিভবনে [তুষিত ভবনে] বাস করিতেছিলেন। তিনি আর-একবার মাত্র পৃথিবীতে আসিলেন ও নির্বাণ পাইয়া গেলেন।

সকৃদাগামী আরো কিছুদিন নিয়ম পালন করিলে, তিনি যে অবস্থায় আসিয়া দাঁড়ান, তাহাকে "অনাগামী" অবস্থা বলে। এ অবস্থায় আসিলে আর ফিরিতে হয় না। ইহার পরের অবস্থার নাম অর্হৎ। অর্হৎ যদিও কিছুদিন বাঁচিয়া থাকেন, তবুও তিনি মুক্ত পুরুষ। তিনি যে নির্বাণ পাইয়া থাকেন, তাহার নাম "স্বউপাদী সেস নিব্বাণ" বা স্ব-উপাধি শেষ নিব্বাণ। ইহা নির্বাণ তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাতে পুনর্জন্মের কিছু কিছু "উপাদান" এখনো শেষ আছে; অথবা সকল কর্ম এখনো ক্ষয় হয় নাই। আরো সূক্ষ্ম করিয়া বলিতে গেলে—কর্ম হইতে যে সংস্কার জন্মে, তাহার কিছু কিছু এখনো রহিয়া গিয়াছে।

এইরূপ জীবন্মুক্ত অবস্থায় অর্হৎ কিছুদিন থাকিলে, তাঁহার কর্মের ক্ষয়ই হয়, সঞ্চয় আর হয় না। ক্রমে সব কর্ম ক্ষয় হইয়া গেলে তাঁহার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়। মৃত্যু হইলেই তিনি "নিরুপাদি সেস নিব্বাণ ধাতু"তে প্রবেশ করেন— অর্থাৎ তখন তাঁহার কর্মও থাকে না, কর্ম হইতে উৎপন্ন সংস্কারও থাকে না। তিনি নির্বাণে প্রবেশ করেন, সব ফুরাইয়া যায়।

মহাযানীরা বলেন, এই যে হীনযানীদের নির্বাণ, ইহা নীরস, নিষ্ঠুর, স্বার্থপর, এবং ইহাতে অতি সংকীর্ণ মনের পরিচয় দেয়। হীনযানীরা ও প্রত্যেকযানীরা জগতের জন্য একেবারে 'কেয়ার' করেন না। তাঁহাদের কাছে জগৎ থাকা না-থাকা দুই-ই সমান। নির্বাণ পাইয়াও তাঁহারা কাঠের বা পাথরের মতো হইয়া যান। ও নির্বাণ, যাঁহারা বুদ্ধিমান, যাঁহাদের শরীরে দয়ামায়া আছে, যাঁহাদের হৃদয় আছে, যাঁহারা শুধু আপনার

সুখের জন্য বাস করে না, যাঁহারা পরের জন্য ভাবিতে শিখিয়াছে, তাঁহাদের কিছুতেই ভালো লাগিবে না। তাঁহারা নির্বাণের অন্যরূপ অর্থ করিয়া লইবে।

মহাযানীরা মনে করেন যে, নির্বাণকে নিষেধমুখে অর্থাৎ 'না' 'না' করিয়া দেখিলে চলিবে না। উহাকে বিধিমুখে অর্থাৎ 'হাঁ'র দিক হইতেই দেখিতে হইবে। আত্মার নাশের নাম নির্বাণ, জ্ঞানের নাশের নাম নির্বাণ, বুদ্ধির নাশের নাম নির্বাণ— এই যে হীনযানীরা 'না'র দিক হইতে উহাকে দেখিয়া থাকেন, উহা বুদ্ধের মনের কথা হইতে পারে না। তিনি 'চতুরার্য্যসত্য' ও আর্য অষ্টাঙ্গ মার্গ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে আর্য অষ্টাঙ্গ মার্গ বা আটটি সুপথ ধরিয়া চলার নামই নির্বাণ। তাঁহার মতে মনুষ্য হৃদয়ের যত আশা-আকাঙ্ক্ষা, সব শান্তি করিয়া দেওয়ার নাম নির্বাণ নহে; সেই-সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইতে দেওয়ার নামই নির্বাণ। কিন্তু সে আশা বা আকাঙ্ক্ষায় লিপ্ত থাকিলে চলিবে না, তাহার ঊর্ধ্বে অবস্থিতি করিতে হইবে।

দেখান গেল যে, মহাযান নির্বাণ 'না'র দিক হইতে নয়, 'হাঁ'র দিক হইতে বুঝিতে হইবে। নিরালম্ব নির্বাণে বোধিচিত্ত যে কেবল ক্লেশ-পরম্পরা হইতে মুক্ত হন, এরূপ নয়, কুদৃষ্টি হইতেও মুক্ত হন। তখন বোধিচিত্ত ধর্মকায়ের পবিত্র মূর্তি দেখিতে পাইবেন। দুটি জিনিস তখন তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে—১. সর্বভূতে করুণা ও ২. সর্বব্যাপী জ্ঞান। যিনি এইরূপে "সম্যক্ সব্বোধি" লাভ করিয়াছেন, তিনি সংসারের উপরে উঠিয়াছেন, নির্বাণেও তখন তাঁহার একান্ত আস্থা নাই। তখন তাঁহার উদ্দেশ্য হইয়াছে সর্বজীবের পরিত্রাণ ও তাহার জন্য তিনি আপনাকে বারংবার বদ্ধ করিতেও কাতর হন না। তাঁহার সর্বব্যাপী-প্রজ্ঞাবলে তিনি পদার্থের সত্যাসত্য দেখিতে পান। তাঁহার জীবন তখন উৎসাহে পরিপূর্ণ, উহা সম্পূর্ণরূপে কর্মময় হইয়া গিয়াছে। কারণ, তাঁহার হৃদয় তাঁহাকে বলিতেছে, "সমস্ত প্রাণীকে মুক্ত করো ও চরমানন্দে ভাসাইয়া দাও।" তিনি নির্বাণেও তৃপ্তি লাভ করেন না, নির্বাণেও তিনি বসতি করিতে পারেন না, তাঁহার কী ভব, কী নির্বাণ কোনোই আলম্বন নাই, এইজন্য তাঁহার নির্বাণের নাম নিরালম্ব নির্বাণ।

মহাযানীদের আর-একরকম মুক্তি আছে। এ মুক্তি ভব ও নির্বাণের অতীত। ইহা সম্পূর্ণরূপে ধর্মকায়ের সহিত এক। আমরা যাহাকে তত্ত্ব বলি, সাধারণ লোকে যাহাকে তথ্য বলে, মহাযানীরা তাহাকে তথতা বলে। ধর্মের যে তথতা তাহার নাম ধর্মকায়। যিনি মুক্তি লাভ করিয়াছেন, যিনি তথাগত হইয়াছেন, অর্থাৎ পরমসত্যে আগত হইয়াছেন।

সে পরম সত্যটি কী? জগতে আমরা যাহা-কিছু দেখিতে পাই, তাহার তলায় যে নিগূঢ় সত্যটুকু রহিয়াছে, তাহারই নাম ধর্মকায়। ধর্মকায় হইতেই নানাবিধ বিচিত্র সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে। ইহা হইতেই সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝা যায়। ধর্মকায় মহাযানীদের নিজস্ব, কারণ হীনযানীরা জগতের আদিকারণ নির্ণয় করিতেই যান নাই। তাঁহাদের মতে ধর্মকায় বলিতে বুদ্ধের ধর্ম ও তাঁহার শরীর বুঝাইত। অনেকে মনে করেন, ধর্মকায় বলিতে বেদান্তের পরমাত্মা বুঝায়, কিন্তু সেকথা সত্য নয়। নির্গুণ পরমাত্মা অস্তিত্ব মাত্র। ধর্মকায়ের ইচ্ছা আছে, বিবেকশক্তি আছে, অর্থাৎ, ইঁহার করুণা আছে ও বোধি আছে। সকল সজীব পদার্থই এই ধর্মকায়ের প্রকাশমাত্র।

নির্বাণ বলিতে চৈতন্যের নাশ বুঝায় না, চিন্তার নিরোধও বুঝায় না। নির্বাণে নিরোধ করে কী? কেবল অহংভাবেরই ইহাতে নিরোধ করে। ইহাতে বলিয়া দেয় যে, অহং বলিয়া যে একটা পদার্থ কল্পনা করা হয়, তাহা অলীক ও এই অলীক কল্পনা হইতে আরো যত ভাব উঠে, সে সবও অলীক। এতটুকু তো গেল কেবল 'নিষেধমুখে' অর্থাৎ 'না'র দিক হইতে। বিধিমুখে অর্থাৎ 'হাঁ'র দিক হইতেও ইহার একটা অর্থ আছে। সেটি করুণা—সর্বভূতে দয়া। এই দুইটা জিনিস লইয়াই নির্বাণ সম্পূর্ণ হয়। হৃদয় যখন অহংভাব হইতে মুক্ত হইল, অমনি, যে হৃদয় এতক্ষণ সংকীর্ণ ও অলস ছিল, তাহা আনন্দে উৎফুল্ল হইল, নূতন জীবনের ভাব দেখাইতে লাগিল, যেন কারাগার ছাড়িয়া বন্দি বাহির হইয়া পড়িল। এখন সমস্ত জগৎই তাহার, এবং সেও সমস্ত জগতেরই। সুতরাং একটি প্রাণীও যতক্ষণ নির্বাণ পাইতে বাকি থাকিবে, ততক্ষণ তাঁহার নির্বাণ পাইয়া লাভ কী? নিজের জন্যই হউক বা পরের জন্যই হউক, সমস্ত জগৎ তাঁহাকে উদ্ধার করিতেই হইবে।

একজন বোধিসত্ত্ব বলিতেছেন, "অবিদ্যা হইতে বাসনার উৎপত্তি এবং সেই বাসনা হইতে আমার পীড়ার উৎপত্তি। সমস্ত সজীব পদার্থ পীড়িত সুতরাং আমিও পীড়িত। যখন সমস্ত সজীব পদার্থ আরোগ্য লাভ করিবে, তখন আমিও আরোগ্য লাভ করিব। কিসের জন্য বোধিসত্ত্ব জন্ম ও মৃত্যু যন্ত্রণা স্বীকার করেন? কেবল জীবের জন্য। জন্ম ও মৃত্যু থাকিলেই পীড়া থাকে। যখন জীবের পীড়ার উপশম হয়, বোধিসত্ত্ব রোগযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হন। যখন পিতামাতার একমাত্র সন্তান পীড়িত হয়, তখন পিতামাতারও পীড়া উপস্থিত হয়। সে সন্তান নীরোগ হইলে পিতামাতাও নীরোগ হন। বোধিসত্ত্বেরও ঠিক সেইরূপ। তিনি সমস্ত জীবগণকে সন্তানের মতো ভালোবাসেন। তাহারা পীড়িত হইলেই তিনি পীড়িত হন, তাহারা নীরোগ হইলেই তিনি নীরোগ হন। তুমি কি শুনিতে চাও কেন বোধিসত্ত্ব এরূপ পীড়িত হন? তিনি মহাকরুণায় আচ্ছন্ন, তাই তিনি পীড়িত হন।"

'নারায়ণ'
মাঘ, ১৩২১ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. থেরাবাদ, থেরবাদ, স্থবিরবাদ। বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণের প্রায় একশো বছর পরে বৈশালীতে দ্বিতীয় বৌদ্ধ-সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। বজ্‌জি বা বৃজি-বংশীয় ভিক্ষুদের আচরণে শিথিলতা দেখা দেওয়ায় বিনয়বিধি বিচারের জন্য স্থবির যশ কাকন্দপুত্রের উদ্যোগে এই সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছিল। 'বিনয়পিটকে'র 'চুল্লবগ্‌গ'-এর বিবরণ অনুসারে সর্বকামী, সাঢ়, কুজশোভিত, বাসবগামী, রেবত, সম্ভূত, যশ ও সুমন—এই আট জন স্থবির বৃজি-বংশীয় ভিক্ষুদের 'দসবত্থুনী' বা দশ অনাচার সম্পর্কে বিচার করেন। বিচারে পরিবর্তন বিরোধী নিষ্ঠাবান্ ভিক্ষুদেরই জয় হয়। বিরুদ্ধবাদীরা এ সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করে

আর-একটি সংগীতি আহ্বান করেন। এই বিরাট সম্মেলনে দশ হাজার ভিক্ষু উপস্থিত হয়েছিলেন—তাই একে মহাসংগীতি বলা হয় এবং এঁরা মহাসাংঘিক নামে নিজেদের পরিচয় দেন। বৌদ্ধ সংঘ দুই ভাগ হয়ে গেল। রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের নাম হয় স্থবিরবাদী বা থেরবাদী।

২. পালি বৌদ্ধ শাস্ত্রে শ্রাবকযান এবং প্রত্যেক-বুদ্ধযানের উল্লেখ আছে। শ্রাবকযানের সাধক বা শ্রাবকের অন্বিষ্ট অর্হত্ব। এঁরা নির্বাণ আকাঙ্ক্ষা করেন না। অন্যপক্ষে প্রত্যেক-বুদ্ধযানের সাধক বা প্রত্যেক-বুদ্ধের লক্ষ্য ব্যক্তিগত নির্বাণ। এঁরা প্রত্যেকে নিজে বোধি লাভ করেন কিন্তু শাস্তা বা লোকসাধারণের মুক্তির পথপ্রদর্শক হন না। 'মহাবস্তু অবদান'-এর মালিনী উপাখ্যানে বলা হয়েছে— প্রত্যেক-বুদ্ধরা মৌন অবলম্বনেই শোভন হন, তাঁরা মহান্ প্রভাববিশিষ্ট, তাঁরা গণ্ডারের মতো একাকী বিচরণ করেন, তাঁরা কেবল নিজেকেই দমিত করেন এবং পরিনির্বাণ লাভ করেন। মহাযান মতে বুদ্ধদেবকে প্রত্যেক-বুদ্ধদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়, কারণ, তিনি বুদ্ধত্ব অর্জনের পরে লোকসাধারণের শাস্তা হয়েছিলেন।

শাস্ত্রীমশায় অন্যত্র লিখেছেন, "Two Yanas are well-known, the Maha- and the Hina-yana. Of course, the Maha-yanists arrogate upon themselves the title of 'great' and relegate all others as Hina-, or, 'low'. The latter however, do not take this opprobrious epithet lying, they call themselves as belonging to either Sravaka-yana or Pratyeka-yana and return the abuse on the Maha-yanists by calling them Kapalikas. The Sravakas hear from Buddha his *upadesa,* act according to his directions and strictly follow his instructions. They cannot get Nirvana (even the lowest form of Nirvana, which they aspire to) without a Buddha. The Pratyeka Buddhas are those who by their own exertions at times, when there were no Buddhas in the world, attain to Nirvana. They call the Maha-yanists not Maha- but Bodhi-sattva-yana. That aslo, I believe, in derision, because according to them there can be but one or two Bodhi-sattvas in the world at a time; but every votary of Mahayana is a Bodhisattva." *(Advayavajrasamgraha,* G-O-S No. XL, Introduction, p. xxvi).

৩. জীবন দুঃখময়, দুঃখের উপযুক্ত কারণ আছে, কারণ দূর হলে দুঃখ নিরোধ হতে পারে এবং দুঃখ নিবারণের উপায় উদ্ভাবন—এই চারটি আর্যসত্য বৌদ্ধ মতবাদের ভিত্তি।

৪. দুঃখ নিবারণের উপায় বা মার্গ আটটি, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। ১. সম্যক্ দৃষ্টি বা দুঃখের স্বরূপ, দুঃখ উৎপত্তির কারণ, দুঃখ নিরোধের অর্থ ও দুঃখ নিরোধের উপায় সম্পর্কে জ্ঞান। ২. সম্যক্ সংকল্প বা নৈষ্কাম্য, অবিদ্বেষ ও অহিংসা সংকল্প। ৩. সম্যক্ বাক্ বা অসত্য বলা, কুৎসা করা, পরুষ বাক্য বলা ও গুজব (সম্ফপ্পলাপ) রটানো থেকে নিবৃত্ত হওয়া। ৪. সম্যক্ কর্মান্ত বা প্রাণ বিনাশ, চুরি (অদিন্নাদান) ও কামভোগ থেকে নিবৃত্ত হওয়া। ৫. সম্যক্ আজীব বা অন্যায় জীবিকা বর্জন। ৬. সম্যক্ ব্যায়াম বা চেষ্টা। প্রাণে অকুশল ভাবের উদয় যাতে না হয়, প্রাণে উদিত অকুশল ভাব যাতে দূর হয়, কুশল ধর্ম যাতে

প্রাণে উদিত হয় এবং উদিত কুশল ধর্ম যাতে স্থায়ী হয়, বিপুলতা ও পূর্ণতা লাভ করে—তার চেষ্টাই সম্যক্ ব্যায়াম। ৭. সম্যক্ স্মৃতি। শারীরিক ক্রিয়া, সুখদুঃখ মূলক অবস্থা, চিত্ত-বিষয়ক অবস্থা এবং দেহমনের জড়তা, ঔদ্ধত্য; রূপ-বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার-বিজ্ঞান এই পঞ্চ স্কন্ধ; চোখ-কান-ঘ্রাণ-জিব-কায়-মন এই ছয় আয়তন; স্মৃতি-ধর্মানুসন্ধান-বীর্য-প্রীতি-প্রশান্তি-সমাধি উপেক্ষা এই সাত বোধ্যঙ্গ; চার আর্যসত্য সম্পর্কে স্মৃতিমান্ থাকাই সম্যক্ স্মৃতি। ৮। সম্যক্ সমাধি। কাম ও অকুশল-ধর্ম ত্যাগ করে বিচার-বিতর্কময় বিবেকজাত প্রীতিসুখপূর্ণ প্রথম ধ্যান; অধ্যাত্ম স্তরে একাগ্র চিত্তে বিচার-বিতর্ক অতিক্রান্ত সমাধিজাত দ্বিতীয় ধ্যান; প্রীতির অতীত, উপেক্ষা-ভাবময় স্মৃতিমান্ ও সম্প্রজ্ঞ তৃতীয় ধ্যান; সৌমনস্য-দৌর্মনস্য বা সুখদুঃখ অতিক্রান্ত উপেক্ষা ও স্মৃতি-পরিশুদ্ধ চতুর্থ ধ্যান—এই চার রকম ধ্যানকে সম্যক্ সমাধি বলা হয়।

৪

কোথা হইতে আসিল ?

১ বৌদ্ধধর্মের আদি কী? একথা লইয়া বহুকাল হইতে বাদবিসংবাদ চলিয়া আসিতেছে। এ বিষয়েও নানা মুনির নানা মত; এখনো কিছুই ঠিক হয় নাই। যাঁহার যেমন পড়াশুনা, যাঁহার যে শাস্ত্রে কৃতিত্ব, যিনি যে শাস্ত্র লইয়া আলোচনা করেন, তিনিই আপনার মনের মতো একটা আদি ঠিক করিয়া লন এবং সেই মতই প্রচার করেন। অনেকে আবার দুই-চারি জনের মত লইয়া একটা সামঞ্জস্য করিতে গিয়াছেন। এইরূপে মত বহু-সংখ্যক হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের মতো লোকে কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারে না, যতই আলোচনা করে ততই ধাঁধাঁর মধ্যে পড়িয়া ঘুরিতে থাকে। তাই সেই মতগুলির একবার চর্চা করা আবশ্যক হইয়াছে।

প্রথম মত এই যে, বুদ্ধদেব যজ্ঞে হাজার হাজার পশুবধ হয় দেখিয়া দয়ায় গলিয়া যান, ও যাহাতে পশুবধ নিবারণ হয়, তাহারই জন্য অহিংসা পরমধর্ম—এই মত প্রচার করেন। বাস্তবিক তখন যজ্ঞে যে বিস্তর পশু বধ হইত সে বিষয়ে তো সন্দেহ নাই। 'ঋগ্বেদে' অশ্বমেধ যজ্ঞের যে বর্ণনা আছে, তাহাতে একটি ঘোড়া ও একটি ভেড়া মারার কথা আছে। কিন্তু 'যজুর্বেদে'র ব্রাহ্মণে ঐ একটি ভেড়ার জায়গায় একটি হাজার ভেড়া বধের কথা আছে। তাহার পর সোমযাগ তো পশুবধ ভিন্ন হইতেই পারিত না। সোমযাগ যে কত রকম ছিল তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। সুতরাং কত পশু যে মারা হইত তাহারো ইয়ত্তা নাই। তাই দেখিয়া পশুবধ নিবারণের জন্য বুদ্ধদেব এই ধর্ম প্রচার করেন। এ মত বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, এবং এখনো আছে। রামচন্দ্র কবিভারতী[১]— যিনি বঙ্গ দেশ হইতে লঙ্কাদ্বীপে গিয়া তথাকার রাজার অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন হন এবং বৌদ্ধাগম চক্রবর্তী এই উপাধি পান— তিনি নিজে প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন। বুদ্ধদেব যে বেদনিন্দা করিতেন একথা তিনি সহ্য করিতে না পারিয়া বলিয়াছেন— বুদ্ধদেব শুদ্ধ সেই-সকল শ্রুতির নিন্দা করিয়াছেন যাহাতে পশুবধের কথা আছে। সমস্ত বেদের নিন্দা তিনি একেবারেই করেন নাই।

যজ্ঞে পশুবধ নিবারণ।

জয়দেবও বুদ্ধ অবতারের স্তব করিতে গিয়া বলিলেন—

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্।
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতম্ ॥"

[শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্ ১।১৩]

অর্থাৎ তিনি মাত্র যজ্ঞবিধির শ্রুতিগুলির নিন্দা করিয়াছেন, অন্য শ্রুতির নিন্দা করেন নাই।

দ্বিতীয় মত এই যে, বুদ্ধদেবের পূর্বে উপনিষদের অদ্বৈত মত চলিয়া আসিতেছিল, বুদ্ধদেব সেই মতই আশ্রয় করিয়া ধর্ম প্রচার করেন। তাঁহার একটি নামই অদ্বয়বাদী। তাঁহার নির্বাণ ও উপনিষদের অদ্বয়বাদে বিশেষ কিছু তফাত নাই। তবে 'বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী'র গ্রন্থকার চিরঞ্জীব শর্মা[২] যেমন বলিয়াছেন, "তুমি বল, আছে আছে আমি বলি নাই।" তোমার আমার এই কথার ভেদমাত্র, বাস্তবিক ভেদ কিছুই নাই। এই জন্যই শংকরাচার্যের[৩] অদ্বৈতবাদকে রামানুজের[৪] দল—

উপনিষদ্-ধর্মের পরিণাম।

"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং
প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেবতৎ।"

বলিয়া গালি দিয়াছেন। তবে এ গালিতেও ঐ মতে একটু তফাত আছে। রামানুজীরা বলেন, শংকর বৌদ্ধমত গ্রহণ করিয়া অদ্বৈতবাদী হইয়াছেন, আর ও মতে বলে, উপনিষদের প্রাচীন অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করিয়া বুদ্ধদেব অদ্বয়বাদী হইয়াছেন।

তৃতীয় মত এই যে, বৌদ্ধধর্ম সাংখ্যমতের পরিণাম। সাংখ্যমত বুদ্ধদেবের অনেক পূর্ব হইতে চলিয়া আসিতেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সাংখ্যমতে যেমন দর্শন সম্বন্ধীয় তত্ত্বগুলি গণিয়া সংখ্যা করিয়া রাখে, বুদ্ধমতেও তাই। সাংখ্যের অষ্ট বিকৃতি, তিন প্রমাণ, পঞ্চ ভূত, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র, অষ্ট সিদ্ধি ইত্যাদি, বুদ্ধেরও সেইরূপ পঞ্চ স্কন্ধ, চতুরার্য সত্য, আর্য অষ্টাঙ্গমার্গ প্রভৃতি। সাংখ্যদর্শন যেমন ত্রিতাপনাশের জন্যই রচিত হইয়াছিল, বুদ্ধদর্শনও তেমনি ত্রিতাপনাশের জন্যই রচিত হইয়াছিল। সেই ত্রিতাপ নাশ করিতে গিয়া সাংখ্যগণ বলিয়াছিল, আত্মাকে কেবল, অর্থাৎ অন্য বস্তুর সহিত সম্পর্কশূন্য করিয়া দিতে পারিলেই ত্রিতাপ নাশ হয়। বুদ্ধ বলিলেন, না, সে হইতেই পারে না, কারণ আত্মা থাকিলেই তাহা 'কেবল' হইয়া থাকিতে পারে না, অতএব আত্মাই নাই বলিতে হইবে।

সাংখ্যমতের পরিণাম।

অনেকে মনে করেন, ব্রাহ্মণেরা সে সময়ে বড়ো অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা আপনাদিগকে ভূদেব বলিয়া মনে করিতেন। অন্য যে কেহই হউক না, তাঁহাকে ব্রাহ্মণের পদানত হইয়াই থাকিতে হইবে। বুদ্ধদেব এত অত্যাচার সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি আপামর সকলকেই মুক্তির উপদেশ দিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণের উপর তাঁহার দ্বেষই ধর্মপ্রচারের কারণ। অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত এ-কথা একেবারেই স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন, বৌদ্ধধর্ম ও ব্রাহ্মণ্য-ধর্মে কিছুমাত্র দ্বেষভাব ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি চন্দ্রকীর্তির টীকার সহিত আর্যদেবের[৫] 'চতুঃশতিকা'র কিয়দংশ ছাপা হইয়াছে, তাহাতে আচার্য সংঘসেন একজন বালকের সেবায় অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া তাহাকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা লইবার জন্য জিদ করিতে লাগিলেন। তখন সে বলিল, "আর কিছুদিন যাউক, আমি দীক্ষা লইব।" মাস খানেক পরে সে আসিয়া বলিল, "আচার্য, আমি এখন 'দীক্ষিত'।" আচার্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসে তোমার দীক্ষা হইল?" সে বলিল, "এখন ব্রাহ্মণ দেখিলেই আমার ইচ্ছা হয় যে আমি তাহাকে মারিয়া ফেলি, সুতরাং আমি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত।"

ব্রাহ্মণদের অত্যাচার ও প্রাধান্য দমনের জন্যই বৌদ্ধ-মত।

আবার একদল আছেন তাঁহারা বলেন, বুদ্ধদেব শাক্যবংশে জন্মিয়াছিলেন। শাক্য শব্দ শক শব্দ হইতে উৎপন্ন। সুতরাং তিনিও শক ছিলেন। শকেদেরই ধর্ম তিনি প্রচার

বুদ্ধদেব শকজাতীয়, তাঁহার ধর্ম শক-জাতীয় ধর্ম

করেন। শকেরা কোনো কালে হিমালয়ের উচ্চ শিখর উত্তীর্ণ হইয়া কপিলবাস্তুতে বাস করিয়াছিল, তাহারা স্বগোত্রে বিবাহ করিত, সুতরাং তাহারা কিছুতেই আর্য হইতে পারে না। অনেক শকজাতীয় রাজারাও আপনাদিগকে শাক্যবংশের লোক বলিয়া পরিচয় দিতেন এবং বুদ্ধদেবের জ্ঞাতি বলিয়া গৌরব করিতেন।

কোনো কোনো ইউরোপীয় পণ্ডিত মনে করেন যে, বুদ্ধদেবের গল্পটি সত্য নহে। উহা ইতিহাস নহে, উহা সূর্যসম্বন্ধীয় একটি প্রাচীন কল্পিত আখ্যায়িকা মাত্র। শাল গাছে ভর করিয়া মা দাঁড়াইলেন ও মায়ের দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করিয়া বুদ্ধদেব জন্মাইলেন, ইহা পূর্বদিকে সূর্য উদয় ভিন্ন আর-কিছুই নহে। আবার দুইটি শালগাছের মাঝখানে গালে হাত দিয়া বুদ্ধদেব নির্বাণ প্রাপ্ত হইলেন, ইহাও সূর্যের অস্তগমন ভিন্ন আর-কিছুই নহে। যাঁহারা এই আখ্যায়িকা সাজাইয়াছেন, তাঁহাদের সুবিধিরচনায় বাহাদুরি খুব আছে।

সূর্যদেবের গল্প।

যাঁহারা ভারতবর্ষের যাহা-কিছু সবই গ্রীকদিগের কাছ হইতে লওয়া মনে করেন, তাঁহারাও বুদ্ধদেব গ্রীকদিগের কাছ হইতে কিছু লইয়াছেন, এ কথা বলিতে পারেন না। কেন-না যখন তাঁহার জন্ম হয়, অথবা যখন তাঁহার মৃত্যু হয়, তখন পর্যন্ত গ্রীকজাতি ভারতবর্ষের দিকে কেহ আসেনই নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের নিজস্ব কিছু থাকিতে পারে, একথা তাঁহারা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা বলেন, বুদ্ধদেব ও মার আর-কেহই নহে, জোরোয়াস্টারের[৬] মতের অহুরমজদা ও আহরিমান মাত্র জোরোয়াস্টারের মতে যেমন ভালো ও মন্দের লড়াইয়ে শেষ ভালোরই জয় হইল, মন্দ হারিয়া গেল, এমতেও তেমনি বুদ্ধ জিতিলেন ও মার হারিয়া গেলেন। জিহোবা ও শয়তান যদি ভালো ও মন্দের লড়াই হয়, তবে বুদ্ধ ও মার না হইবেন কেন?

জোরোয়াস্টরের গল্প।

যেখানে প্রায় ২৫০০ বৎসর পূর্বে বুদ্ধদেবের জন্ম হয়, এখন সেইখানে থাড়ু নামে এক জাতি বাস করে। উহারা বিশেষ সভ্য নহে। পূর্বে উহাদিগকে চেরো বলিত এখন খেড়ো হইয়া গিয়াছে। ছোটোনাগপুরের অনেক অসভ্য জাতিই বলে যে, তাহারা চেরোদের সন্তান, রোটাস্‌গড়ের দিক হইতে অথবা তাহারো উত্তর হইতে তাহারা ছোটোনাগপুরে আসিয়াছে। অতি প্রাচীনকালে বঙ্গ, বগধ ও চের নামে তিন জাতি আর্যদিগের শত্রু ছিল। উহাদের মধ্যে চেররাই এখনকার খেড়ো, উহাদের ধর্মই বুদ্ধদেব সংস্কার করিয়া উত্তর ভারতের অনেক সুসভ্য দেশে প্রচার করেন। এও একটা মত আছে।[৭]

থাড়ু জাতির ধর্ম।

এই-সকল মতের প্রতিবাদ করা আমার উদ্দেশ্য নহে। কেবল কত রকমের ভিন্ন ভিন্ন মত আছে তাহা দেখানোই আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু এ বিষয়ে বিচার করিতে গেলে প্রথম দেখিতে হইবে বুদ্ধদেব আর্য কিনা। তিনি যে আর্য নন একথা বলিবে কিরূপে? তিনি ইক্ষ্বাকুবংশে জন্মান। ইক্ষ্বাকুবংশ বেদেও প্রসিদ্ধ। তাঁহারো গোত্র আছে, গোতম গোত্রের কপিলমুনি শাক্যবংশের আদিগুরু। গোতমের নাম হইতেই শাক্যসিংহকে গৌতম বলিয়া ডাকা হয়। তখন গুরুর গোত্র লইয়া ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর্য জাতির গোত্র হইত, প্রমাণ অশ্বঘোষের উক্তি—

বুদ্ধদেব আর্য কিনা।

"একপিত্রোর্যথাভ্রাত্রোঃ পৃথক্ গুরুপরিগ্রহাৎ।
রামএবাভবৎ গার্গো বাসুভদ্রোপি গৌতমঃ ॥"

এক বাপের দুই ছেলে; রাম ও বাসুভদ্র। পৃথক্ পৃথক্ গুরু স্বীকার করায় রাম হইলেন গার্গ্য এবং বাসুভদ্র হইলেন গৌতম। সুতরাং বুদ্ধদেবের পূর্বপুরুষগণ অন্য জাতীয় লোক হইয়া গুরুর গোত্র গ্রহণ করিয়া গৌতম হওয়া বিচিত্র নহে। শাক্যগণ ইক্ষ্বাকু বলিয়া গর্ব করিতেন। কিন্তু এটা তো ঠিক তাঁহাদিগকে ইক্ষ্বাকুরাজ্য হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয় এবং বৈমাত্র ভাইয়ের উপকারের জন্যই তাড়ানো হয়। পাটরানীর ছেলেকে তো তাড়ানো শক্ত, সুতরাং তাঁহারা অন্য রানীর ছেলেই হইবেন। রাজারা তখন অনেক বিবাহ করিতেন এবং বিবাহে জাতিবিচার বড়ো একটা করিতেন না। সুতরাং ভরতবংশ যেমন পাকা আর্য, শাক্য যে তেমন পাকা এরূপ বোধ হয় না। আর্যাবর্তও সে সময়ে যে উভয় সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাহাও বোধ হয় না। আর্য ও বঙ্গ-বগধ জাতির সন্ধিস্থলে শাক্যবংশীয় রাজধানী ছিল। এইরূপ নানা কারণে শাক্যেরা যে পাকা আর্য ছিলেন, সে বিষয়ে যেন একটু সন্দেহ হয়।

তারপর যাগযজ্ঞে পশুহিংসা দেখিয়া বুদ্ধদেবের অহিংসা ধর্মের উদ্রেক হয়, এটা তো বুদ্ধের কোনো জীবন-চরিতে বলে না। 'ললিত-বিস্তরে' বলে না, 'মহাবস্তু-অবদানে' বলে না, 'বুদ্ধচরিতে' বলে না। পালি গ্রন্থেও বলে না। তবে সেটার উপর বিশেষ ভরও দেওয়া যায় না। ঐটাই যদি প্রধান কারণ হইত, তাহা হইলে তাঁহার এত জীবনী, একখানি-না-একখানিতে একথাটা থাকিত যে, বুদ্ধ পশুহত্যা দেখিলেন, তিনি করুণায় গলিয়া গেলেন ও যাহাতে পশুহত্যা নিবারণ হয়, তাহারই জন্য ধর্ম প্রচার করিতে বসিলেন। অহিংসা যে পরম ধর্ম, তাঁহার পূর্বেও লোকে জানিত। যাঁহারা সৌভাগ্যক্রমে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত পঁহুছিতেন ও ভিক্ষু-আশ্রম গ্রহণ করিতেন, তাঁহারা তো হিংসা করিতেন না। জৈনেরা বুদ্ধদেবের বহু পূর্ব হইতে অহিংসাধর্ম পালন করিয়া আসিতেছিল। অতএব ওকথাটা ঠিক বলিয়া বোধ হয় না।

উপনিষদের অদ্বৈতবাদ হইতে বুদ্ধদেবের ধর্মের উৎপত্তি, একথা স্বীকার করা কঠিন। কারণ উপনিষদ্, বিশেষ তাহার অদ্বৈতবাদ, বুদ্ধদেবের সময়ে হইয়াছিল কি? ব্রাহ্মণগুলি যজ্ঞ করিবার জন্য লেখা হয়। প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলি, যথা 'ছান্দোগ্য', 'বৃহদারণ্যক', ব্রাহ্মণের অংশ, যজ্ঞেই উহার ব্যবহার হইত। যাজ্ঞিকেরা এখনো উহা যজ্ঞের অংশ বলিয়াই ব্যবহার করেন। শংকরাচার্যের মত ব্যাখ্যা তাঁহারা করেন না। সেকালে যে-কোনো সার কথা গুরুর কাছ হইতে শিখিতে হইত, তাহারই নাম উপনিষদ্ ছিল। অর্থশাস্ত্রের উপনিষদ্ ছিল, কামশাস্ত্রের উপনিষদ্ ছিল। বৌদ্ধেরাও উপনিষদ্ শব্দ বেশ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন।

মোক্ষস্যোপনিষৎ সৌম্য বৈরাগ্যমিতিগৃহ্যতাম্।
বৈরাগ্যস্যাপি সংবেগঃ সংবিদো জ্ঞানদর্শনম্ ॥
জ্ঞানস্যোপনিষচ্চৈব সমাধিরুপধার্য্যতাম্।
সমাধেরপ্যুপনিষৎ সুখং শারীরমানসম্ ॥
প্রস্রব্ধিঃ কায়মনসোঃ সুখোস্যোপনিষৎ পরা।
প্রস্রব্ধেরপ্যুপনিষৎ প্রীতিরপ্যবগম্যতাম্ ॥
তথা প্রীতেরুপনিষৎ প্রামোদ্যং পরমং মতম্।
প্রামোদ্যস্যাপ্যহল্লেখঃ কুকৃতেস্বকৃতেষু চ ॥
অবিলেখস্য মনসঃ শীলন্তু পানিষচ্ছুচি।

মোক্ষের মূল বৈরাগ্য; বৈরাগ্যের মূল আগ্রহ; আগ্রহের মূল জ্ঞান-দর্শন; জ্ঞানের মূল সমাধি; সমাধির মূল শরীর ও মনের সুখ; সুখের মূল শরীর ও মনের শান্তি; শান্তির মূল প্রীতি; প্রীতির মূল স্ফূর্তি; স্ফূর্তির মূল কুকার্য করিয়া অথবা কর্তব্য কর্ম না করিয়া হৃদয়ে ব্যথা না থাকা। ব্যথা না থাকার মূল বিশুদ্ধ শীল।

আর উপনিষৎ বলিয়া একটি দর্শনের মত আমরা সর্ব প্রথম 'হর্ষ-চরিতে'[৮] দেখিতে পাই। 'হর্ষচরিতে' হর্ষ যখন দিবাকরের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তথায় নানা সম্প্রদায়ের ছাত্র পাঠ করিতেছে দেখিতে পাইলেন; তাহার এক সম্প্রদায় ঔপনিষদ। কালিদাসও তাঁহার 'বিক্রমোর্ব্বশী'তে বলিয়াছেন, "বেদান্তষু যমাহুরেক পুরুষম্"— এখানেও বেদান্ত শব্দের অর্থ উপনিষৎ। সুতরাং কালিদাস ও হর্ষ-রাজার সময়েই উপনিষদ্ একটা দার্শনিক মতের মধ্যে গণ্য হইয়াছিল, কিন্তু সে তো বুদ্ধের বহুকাল পরে। উপনিষদের যে এত প্রাদুর্ভাব এখন দেখা যাইতেছে, ইহা তো শংকরাচার্যের পর হইতেই হইয়াছে। তাই বলিতেছিলাম, উপনিষদের অদ্বৈতবাদ হইতে বৌদ্ধধর্ম, এটা বিশ্বাস করা কঠিন। আরো কথা, বৌদ্ধধর্মটাই কি গোড়ায় অদ্বৈতবাদ ছিল? সেটা মহাযানীরাই না ফুটাইয়া তুলিয়াছে?

শকজাতি হইতে শাক্যজাতির উদ্ভব, একথাটাও ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। কারণ শকেরা তো শুঙ্গরাজাদের সময় খৃ. পূ. দ্বিতীয় শতে ভারতবর্ষে আসে।[৯] তাহাও আবার সুদূর পশ্চিমে পঞ্জাবের কোলে। হিমালয় অতিক্রম করিয়া শকেদের আসা কোথাও দেখা যায় না। ইহাতে কেহ কেহ বলিতে পারেন, ভারতবর্ষের ইতিহাসই নাই, তবে কোনো কথা শুনা যায় নাই বলিয়া তাহা একেবারে মিথ্যা, এরূপ জোর করিয়া বলা যাইবে কিরূপে? কিন্তু আমরা শাক্য শব্দের আর-এক প্রকার ব্যুৎপত্তি পাইয়াছি। তাহাতে সকল কথার সামঞ্জস্য রক্ষা হয়। অশ্বঘোষ বলিয়াছেন, শাক নামে এক রকম গাছ আছে। সেই গাছে ঘেরা জায়গায় বাস করেন বলিয়া বুদ্ধদেবের পূর্বপুরুষদের শাক্য বলিত। এ কথাটা বেশ সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। নেপালের তরায়ে এখনো শকিয়া শালের গাছই অধিক। শাক গাছ শকিয়া শাল হইলে, শাক্য শব্দের ব্যুৎপত্তির জন্য হিমালয় ও তিব্বত পার হইয়া শকজাতির দেশে যাইবার প্রয়োজন নাই।

বৌদ্ধধর্ম সাংখ্যমত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, একথা অশ্বঘোষ এক প্রকার বলিয়াই গিয়াছেন। বুদ্ধদেবের গুরু অড়ার কালাম[১০] ও উদ্রক[১১] দু জনেই সাংখ্যমতাবলম্বী ছিলেন। দু জনেই বলিয়াছিলেন, 'কেবল' অর্থাৎ জগতের সহিত সম্পর্কশূন্য হইতে পারিলেই মুক্তি হয়। বুদ্ধ তাঁহাদের মত না মানিয়া বলিয়াছিলেন, 'কেবল' হইলেও অস্তিত্ব তো রহিল; অস্তিত্ব রহিলে নিঃসম্পর্ক হইবার জো নাই। একথা পূর্বেই বলিয়াছি।

যদি বৌদ্ধধর্ম সাংখ্য হইতেই উৎপন্ন হয়, তবে তো উহা আর্য-ধর্ম হইতেই উৎপন্ন হইল। আমার সেই কথাতেই সন্দেহ। সাংখ্যমত কি বৈদিক আর্যগণের মত? শংকরাচার্য তো উহাকে বৌদ্ধাদি মতের ন্যায় অবৈদিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তবে তিনি এত যত্ন করিয়া ও মত খণ্ডন করেন কেন? মন্বাদিভিঃ কৈশ্চিৎ শিষ্টৈঃ পরিগৃহীতত্ত্বাৎ। মনু প্রভৃতি কয়েকজন শিষ্ট উহাকে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া। সাংখ্যমত কপিলের মত চিরকাল প্রবাদ। কপিলের বাড়ি পূর্বাঞ্চলে অর্থাৎ বঙ্গ-বগধ-চেরদিগের দেশে। গঙ্গাসাগর

যাইতে কপিল-আশ্রম আছে, কবতক্ষের ধারে কপিল মুনির গ্রাম। কপিলবাস্তুও কপিল মুনির বাস্তু। কারণ অশ্বঘোষ বলিতেছেন, গোতমঃ কপিলো নাম মুনিধর্মভৃতাং বয়ঃ। তাঁহারই বাস্তুতে কপিলবাস্তু নগর। বাস্তবিকও কপিলকে কেহ ঋষি বলে না। তাঁহার নাম করিতে গেলেই বলে আদিবিদ্বান্। বাল্মীকি যেমন আদিকবি, তিনিও তেমনি আদিবিদ্বান্। 'শ্বেতাশ্বতরে' তাঁহাকে 'পরমর্ষি' বলা হইয়াছে। কিন্তু ভাব ভাষা ও মত দেখিলে এখানিকে নিতান্ত অল্পদিনের পুস্তক বলিয়া বোধ হয়।

কৌটিল্য তিনটি মাত্র দর্শনের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, সাংখ্য, যোগ ও লোকায়ত; কৌটিল্য ২৩০০ বৎসর পূর্বের লোক। তাঁহার সময় অন্য দর্শন হয়ই নাই, হইলে তাঁহার মতো সার্বভৌম পণ্ডিতের তাহা অবিদিত থাকিত না। সেই তিনটির মধ্যে লোকায়ত মত, লোকে আয়ত অর্থাৎ ছড়াইয়া পড়িয়াছে বলিয়া ঐ নাম পাইয়াছে, উহার আদি নাই, ও মত সর্বত্র সকলেরই মত। খাও দাও সুখে থাকো— এ মত আবার কে প্রচার করিতে যাইবে? সকলেই জানে, সকলেই বুঝে ও সকলেই সেই মতে কার্য করে, সুতরাং উহার কথা ছাড়িয়া দিলে আমাদের বিশেষ ক্ষতি নাই। যোগমত সাংখ্য-দর্শনেরই রূপান্তর মাত্র। দুই-ই দ্বৈতবাদী।

সাংখ্য ও যোগের যে-সকল পুস্তক আছে সকলগুলিই নূতন। ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকাই তাহাদের মধ্যে পুরানো। ঈশ্বরকৃষ্ণ খৃস্টীয় পাঁচ শতের লোক। কিন্তু তাঁহার পূর্বেও সাংখ্যমতের পুস্তক ছিল; মাঠর ভাষ্যের কথা অনেক জায়গায় শুনিতে পাওয়া যায়। পঞ্চশিখের দু-চারিটি বচন যোগভাষ্যকার ধরিয়াছেন। আসুরির একটি কবিতা একজন জৈন টীকাকার তুলিয়াছেন। মহাভারতে আসুরির নাম নাই, পঞ্চশিখের নাম আছে। তিনি জনক রাজার সভায় মিথিলায় উপস্থিত ছিলেন। কপিলের নিজের কোনো বচন এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। যে ২২টি সূত্র কপিলসূত্র বলিয়া চলিতেছে, তাহাও বিশেষ প্রাচীন নহে, ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকা দেখিয়া লেখা বোধ হয়। কিন্তু অশ্বঘোষের লেখা ও কৌটিল্যের উক্তি দেখিয়া সাংখ্য যে খুব প্রাচীন তাহা বেশ অনুভব হয়।

সংহিতায় ও ব্রাহ্মণে আদিবিদ্বান্ কপিলের নামও নাই গন্ধও নাই। আমাদের এখানকার ব্যবহারেও সাংখ্যমতের বড়ো বড়ো লোকগুলি মানুষ। ঋষিও নন মুনিও নন। আমরা যে নিত্য তর্পণ করিয়া থাকি তাহাতে—

সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ
কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢুঃ পঞ্চশিখস্তথা।[১২]

বলিয়া যাহাদের তর্পণ করি, রঘুনন্দন[১৩] বলেন তাঁহারা মনুষ্য। এই কবিতায় যাঁহাদের নাম আছে, তাঁহারা সকলেই সংখ্যমতের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য।

উপরের লেখা হইতে তিনটি কথা বুঝা যায়, যে সাংখ্যমত সকলের চেয়ে পুরানো, উহা মানুষের করা এবং পূর্ব-দেশের মানুষের করা। উহা বৈদিক আর্যদের মত নহে, বঙ্গ, বগধ বা চেরজাতির কোনো আদিবিদ্বানের মত। যাঁহারা পুত্র পশু প্রভৃতি লাভের জন্য, পুষ্টি-তুষ্টির জন্য বড়ো জোর স্বর্গকামনায়, যাগযজ্ঞ করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে ত্রিতাপনাশের জন্য "আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন নির্লেপ নির্বিকার" ইত্যাদি মত উদ্ভব হওয়া কঠিন। ইহা অনায়াসেই মনে হইতে পারে যে এই মত অন্যত্র উদ্ভত হইয়া ক্রমে

কোনো কোনো আর্য পণ্ডিত কর্তৃক পরিগৃহীত হওয়ায় আর্যগণের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। হেমাদ্রি[১৪] বেশিদিনের লোক নহেন, তাঁহার সময় খৃষ্টীয় তেরো শতে, তিনি বলিতেছেন যে, যে ব্রাহ্মণ সাংখ্য মত ভালো জানেন, তিনি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের ন্যায় পংক্তি-পাবন, কিন্তু যে ব্রাহ্মণ কাপিল সে পংক্তিবাহ্য। ইহাতেও অনুমান হয়, কপিলের কোনো কোনো সম্প্রদায়ের মত ব্রাহ্মণগণ আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর কোনো কোনো সম্প্রদায়ের মত একেবারেই গ্রহণ করেন নাই।

যদি সাংখ্য হইতেই বুদ্ধমতের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে বৈদিক আর্যমত হইতে উহার উৎপত্তি বলা যাইতে পারে না। বৌদ্ধধর্মে আরো অনেক জিনিস আছে যাহা আর্যধর্মের খুব বিরোধী। আর্যগণ তিন আশ্রম পালন না করিয়া ভিক্ষুক আশ্রম গ্রহণ করিতেন না। আপস্তম্ব[১৫] প্রভৃতি সকল সূত্রকারেরই মত এই যে, ব্রহ্মচারী হইয়া গৃহস্থ, তাহার পর বানপ্রস্থ ও তাহার পর ভিক্ষু হইবে। কিন্তু বুদ্ধ উপদেশ দিতেন যে, যখনই সংসারে বিরাগ উপস্থিত হইবে, তখনই সংসার ত্যাগ করিয়া ভিক্ষু হইতে পারিবে। এমন-কি অতি শিশুকেও ভিক্ষু করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। কয়েকটি নাবালগকে ভিক্ষু করায় কপিলবাস্তুতে বড়ো গোলমাল উপস্থিত হয়। তাহাতে বুদ্ধদেবের পিতা বুদ্ধকে বুঝাইয়া বন্দোবস্ত করিয়া দেন যে, নাবালগকে শিষ্য করিতে হইলে তাহার পিতামাতার অনুমতি লইতে হইবে। ক্রমে বৌদ্ধ কর্মবাচায় দেখিতে পাওয়া যায়, একুশ বৎসরের পূর্বে কাহাকেও দীক্ষা দেওয়া হইত না। যে-কেহ দীক্ষা লইতে আসিত, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করা হইত, তোমার বয়স একুশ বৎসর হইয়াছে তো? বহুকাল পরে শংকরাচার্য এই মত প্রকাশ করেন যে, "যদহরেব বিরজ্যেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ"[১৬]। এটি 'জাবালোপনিষদে'র বচন। সম্ভবত শংকরাচার্যের পূর্বেই এই উপনিষদ্ রচিত হইয়াছিল। উহা কোনো ব্রাহ্মণের অন্তর্ভুক্ত নহে, সুতরাং বুদ্ধদেবের পূর্ববর্তী হওয়া সম্ভব নহে।

আশ্রম পালন।

বৌদ্ধভিক্ষুর বেশ হইতেও দেখা যায় উহা আর্যবিরোধী বেশ। আর্যগণ উষ্ণীষ ও উপানহ ভিন্ন চলিতেন না। মাথায় পাগড়ি ও পায়ে জুতা সবারই থাকিত। কিন্তু বৌদ্ধগণ বাঙালির মতো খালি মাথায় থাকিতেন এবং উপানহ ব্যবহার করিতেন না।

বেশ।

এই-সকল নানা কারণে বোধ হয় যে, পূর্বাঞ্চলে বঙ্গ, বগধ ও চের নামে যে তিনটি সভ্য জাতি বাস করিতেন, তাহাদের সঙ্গে আর্যগণের মেলামেশায় বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে। যে জায়গায় আর্যগণের পশ্চিমসীমা ও ঐ জাতিসকলের পূর্বসীমা, সেইখানেই বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি। উহা পূর্বাঞ্চলে অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, পশ্চিমাঞ্চলে উহার প্রাদুর্ভাব কখনোই এত অধিক হয় নাই। পাঞ্চাল, কুরুক্ষেত্র ও মৎস্য-দেশে যে বৌদ্ধধর্ম প্রবল ছিল, ইহার প্রমাণ বড়ো একটা পাওয়া যায় না।

২

পূর্বের 'নারায়ণে' বৌদ্ধধর্ম কোথা হইতে আসিল তাহার কতকটা আভাস দিয়াছি। বঙ্গ-বগধ-চের জাতির আচার-ব্যবহার ও ধর্ম লইয়া বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি ঠিক হউক আর নাই হউক, বৌদ্ধধর্মের মতামত আচার-ব্যবহার অনেকটা পূর্ব দিক হইতে আসিয়াছে। কিন্তু অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, বঙ্গ-বগধ-চের জাতির

ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গ, বগধ ও চের জাতি।

কথা অল্প লোকেই জানে। অতি অল্পদিন হইল 'ঐতরেয় আরণ্যকে'র একটি ব্রাহ্মণে উহাদের নাম পাওয়া গিয়াছে। এখনো অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিতেছেন, ওখানটার অর্থবোধই হয় না। সায়ন বঙ্গ-বগধ-চের শব্দের অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন। তবে ওকথার উপর জোর দেওয়া যায় কি? সায়নের কথা ধরি না; সায়ন বেদ রচনার দুই-তিন হাজার বৎসর পরে উহার অর্থ করিতে বসিয়াছিলেন। দু-চারটা মানুষের নাম ও দেশের নামের তিনি যে অন্য অর্থ করিয়া দিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ এস্থলে তাঁহার অর্থ গ্রহণ করেন নাই এবং তাঁহারা নিজেও ইহার অর্থ কী স্থির নিশ্চয় করিতে পারেন নাই। কিন্তু আমরা ইহাতে বেশ দেখিতে পাইতেছি যে, বঙ্গ শব্দের মানেতে কোনো গোল নাই। সায়নের অর্থ বনংগতা, এ অর্থ আমরা লইতে পারি না। বগধ যে মগধ তাহাতেও আমাদের সন্দেহ হওয়া উচিত নহে। তামিল জাতির একটা শাখাকে যে চের বলিত তাহারো সন্দেহ নাই। এখনো দক্ষিণ দেশে তামিল বা দ্রাবিড়ীয় জাতির মধ্যে কেরল নামে একটি প্রবল জাতি আছে। কেরলদিগের প্রাচীন নাম চের। চেরো বলিয়া একটি জাতিকে ছোটনাগপুরের সমস্ত জাতিই আপনাদের পূর্বপুরুষ বলিয়া মনে করেন। কপিলবাস্তুর নিকটে এখনো যে থাড়ু জাতি আছে তাহারাও চেরো বা চের জাতির একটা ধারা।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ভরতের রাজত্ব।

এই-সকলের সঙ্গে যদি আর-একটা কথা ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে আরো একটু সুবিধা হয়। সকলেই জানেন যে, আরণ্যকগুলি ব্রাহ্মণগুলিরই শেষ অংশ। ব্রাহ্মণ যে প্রকারের বই, আরণ্যকও সেই প্রকারেরই বই। ব্রাহ্মণে যাহা বলা হয় নাই, আরণ্যকে তাহাই বলা হইয়াছে। 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে'র শেষ অংশে ইন্দ্র-দেবতার মন্ত্রে অভিষেক হওয়ায় যে-সকল রাজা বড়ো হইয়াছিলেন, বিশেষ অশ্বমেধ যাগ করিয়াছিলেন, তাহাদের একটি সুদীর্ঘ তালিকা আছে, যে ঋষি অভিষেকের পুরোহিত ছিলেন তাঁহার প্রশংসা আছে, আর যে রাজা অভিষেক লইয়াছিলেন তিনি কতবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন তাহারো উল্লেখ আছে। এই তালিকার শেষ ভাগে লেখা আছে যে, ভরতরাজা ইন্দ্র অভিষেক লইয়া ১৩৩টা অশ্বমেধ করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে ৭৮টা যমুনার পশ্চিমে মরুক্ষ দেশে, আর ৫৫টা গঙ্গার পূর্বে জলবৃষ্টির দেশে। যমুনার পশ্চিমে যতদূর যাইবে মরু দেশ আর উষ্ণ দেশ। কতদূর ভরতের অধিকার ছিল বলা যায় না। ৭৮ অশ্বমেধের জন্য কতখানি দেশ লওয়া আবশ্যক আমরা জানি না। তবে এ পর্যন্ত বলিতে পারি যে, বেলুচিস্তান উহার মধ্যে ছিল না। থাকিলে ভরতের নাম অনুসারে উহাও ভারতবর্ষ বলিয়া গণ্য হইত; তবেই যমুনার পশ্চিম হইতে সিন্ধু দেশের পশ্চিম-সীমা পর্যন্ত ভূভাগ জয় করিয়া তিনি ৭৮টা অশ্বমেধ করিয়াছিলেন। তাই যদি হইল তবে ৫৫টা অশ্বমেধের জন্য গঙ্গার পূর্বে কতটা জমি তাঁহাকে অধিকার করিতে হইয়াছিল? 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' অন্তর্বেদির নাম একেবারেই করে না, বলে যমুনার পশ্চিমে ও গঙ্গার পূর্বে। এখন ৫৫ অশ্বমেধের জন্য কতটা দেশের দরকার। আমার বোধ হয়, এলাহাবাদ হইতে ঠিক উত্তরমুখে রেখা টানিলে ঐ রেখা ও গঙ্গার পূর্ব-পারের মধ্যে যত দেশ পড়ে তাহাই ৫৫টা অশ্বমেধের পক্ষে যথেষ্ট।

'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' ভারতবর্ষ অথবা আর্যভূমির অথবা আর্যজাতির বসতি বিস্তারের এই সীমা নির্ধারণ করিয়া দিলে, তাহার পরই 'ঐতরেয় আরণ্যক' বলিলেন যে, বঙ্গবগধ-

বঙ্গ, বগধ ও চেরগণ পাখি।

চেরজাতি পক্ষীবিশেষ; উহাদের ধর্ম নাই, উহারা নরকগামী হইবে। ইহার মোটামোটি অর্থ এই হইল যে, আর্যগণ এলাহাবাদ পর্যন্ত আসিয়াছিলেন, তাহার ওদিকেই বঙ্গ-বগধ-চেরজাতি। ইহারা আর্যগণের শত্রু। আর্যগণের বসতি বিস্তারে বাধা দিতেন তাই আর্যগণ ইঁহাদিগকে দেখিতে পারিতেন না। যাহাদিগকে তাঁহারা দেখিতে পারিতেন না, তাহাদিগকে মানুষ না বলিয়া পশু পক্ষী রাক্ষস বলা তাঁহাদের রোগ ছিল। তামিলগণ তাঁহাদের কাছে বানর। কর্ণাটগণ হয়তো ভালুক, লঙ্কার লোক রাক্ষস। সেইরূপ বাংলার লোক পাখি।

বুদ্ধদেব কিন্তু সেই পাখির দেশেই জন্মান। তাঁহারো পূর্বে কনকমুনি কপিলবাস্তুরই নিকটে জন্মাইয়া বোধি লাভ করেন। এই অঞ্চলেই জৈনধর্ম প্রচারক মহাবীর[১৭] জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মস্থান বৈশালী, পাটনার উত্তর-পশ্চিম, গঙ্গার উত্তর-পারে। ইনি আবার জৈনযতি হইয়া বারো বৎসর কাল পূর্বাঞ্চলে ভ্রমণ করিয়া আসেন। বৈশালীর লোক মনে করিল, মহাবীর নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। বারো বৎসর পরে তিনি পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়া কেবলী হইয়া ফিরিলেন। তাঁহারো পূর্বে পার্শ্বনাথ[১৮] কাশীতে জন্মগ্রহণ করিয়া সংসার পরিত্যাগের পর পূর্ব অঞ্চলে নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া সমেতগিরি অর্থাৎ পরেশনাথ পাহাড়ে বাস করিয়া তথায়ই দেহরক্ষা করেন। আর আর তীর্থংকরদের অনেকেই পূর্ব অঞ্চলের লোক। ২৪ জন বুদ্ধ ও ২৪ জন তীর্থংকরের বৃত্তান্ত পড়িলে একথা আরো প্রমাণ বলিয়া বোধ হইবে।[১৯]

বুদ্ধ পূর্বাঞ্চলের লোক।

পশ্চিমাঞ্চলে যখন আর্যগণ যাগযজ্ঞ লইয়া ব্যস্ত, দেশ দখল করিতে ব্যস্ত, শ্রৌতসূত্র রচনায় ব্যস্ত, শূদ্রগণকে আয়ত্ত করিয়া তাহাদিগকে দাস করিয়া রাখার বন্দোবস্ত লইয়া ব্যস্ত, তখন পূর্বাঞ্চলে বঙ্গ-বগধ-চেরগণ পরকাল লইয়া ব্যস্ত, কিসে জন্মজরামরণের হাত এড়ানো যায় তাহাই লইয়া ব্যস্ত। পশ্চিমাঞ্চলে যেমন ঋষির পর ঋষি শ্রৌতসূত্র রচনা করিতেছিলেন; পূর্ব অঞ্চলে তেমনি তীর্থংকরের পর তীর্থংকর, বুদ্ধের পর বুদ্ধ পরকালে কিসে সুখে থাকা যায় তাহারই উপায় দেখিতেছিলেন।

পূর্ব ও পশ্চিমে ভেদ।

শাক্যমুনি শেষ বুদ্ধ, মহাবীর শেষ তীর্থংকর। দু জনেই এক সময়ের লোক। দু জনেই খৃস্টের পূর্বে ছয় শতের লোক। সুতরাং দীপংকর প্রভৃতি ২৪ জন বুদ্ধ আর ঋষভদেবাদি ২৪ জন তীর্থংকর তাঁহাদের অনেক পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অনেকে বলেন যে, শাক্যসিংহের পূর্বে যে ২৩ জন বুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহারা মানুষ নন—বৌদ্ধেরা আপনাদের ধর্মটা পুরানো, তাই দেখাইবার জন্যই ২৪টা নাম করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু শাক্যসিংহের পূর্ববর্তী কনকমুনির খাম্বা[২০] পাওয়া গিয়াছে, যেখানে তাঁহার নির্বাণ লাভ হয় তাহা স্থির হইয়াছে; তাঁহাকে মানুষ নয় বলা এখন কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখনকার নেপালি বৌদ্ধেরা বলে চারি যুগে আট জন মানুষ-বুদ্ধ। বিপশ্যী ও শিখী সত্যযুগে, কাশ্যপ ও বিশ্বভূ ত্রেতাযুগে, ক্রকুচ্ছন্দ ও কনকমুনি দ্বাপরে, এবং শাক্যসিংহ ও মৈত্রেয় কলিযুগে। অপর ১৭ জনকে তাঁহারা মানুষ বলুন আর নাই বলুন, শাক্যমুনি ও তাঁহার পূর্বেকার ছয় জনকে তাঁহারা মানুষ বলেন। তীর্থংকরদের মধ্যেও, অনেকে মনে করেন যে, শেষ দুই

২৪ জন বুদ্ধ ও ২৪ জন তীর্থংকর।

জন মাত্র সত্যসত্য মানুষ, বাকিগুলি মনগড়া মাত্র। তাহা হইলেও আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, বুদ্ধ ও মহাবীরের পূর্ব হইতেই ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে পরকাল লইয়া অনেক দিন হইতে নাড়াচাড়া হইতেছিল।

বুদ্ধদেবের সময়ে ছয়টি ধর্ম প্রচার হইয়াছিল, তাহাদের নাম যথা, আজীবক—ইহা গোশালা মংখালি পুত্রের ধর্ম, নিগ্রন্থ—ইহা মহাবীরের ধর্ম, পূর্ণ কাশ্যপ একজন ধর্মপ্রবর্তক, অজিত কেশকম্বল একজন, সঞ্জয় একজন ও পোকুদ কত্ত্যায়ন একজন।[২১]

এগুলিও ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলেই উৎপন্ন হইয়াছিল এবং সেইখানেই ইহাদের শ্রীবৃদ্ধিও হইয়াছিল। ভারতবর্ষের পূর্বাংশে লোক যে কেবল ধর্ম লইয়াই থাকিত, এরূপ নহে; এখানে অন্যান্য বিষয়েও বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। ডাক্তার হর্নলি [A. F. R. Hoernle] বলেন যে, অস্ত্রচিকিৎসা পূর্বাঞ্চলেই আরম্ভ হইয়াছিল। হস্তিশাস্ত্র এই দেশেই রচনা হয়। ন্যায়শাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, সাংখ্যশাস্ত্র, ইহাদের উৎপত্তিও পূর্ব ভারতে; সুতরাং পূর্ব-ভারত যে এককালে একটি সুসভ্য দেশ ছিল, ইহা অনায়াসেই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। আর্যগণ যখন সেই সুসভ্য দেশ আক্রমণ করিয়া তাহার রাজ্য সমাজ আচার ব্যবহার রীতিনীতি সব ভাঙিয়া তাহাদিগকে আর্য সভ্যতা দান করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, সেই সময়ে তাহাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় উঠিতে লাগিল এবং সেই-সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে তাহাদের পূর্ব-সমাজ, পূর্ব-আচার ও পূর্ব-ব্যবহার বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাই এত ধর্ম হইল, শেষ সব ধর্ম উঠিয়া গিয়া এক বৌদ্ধধর্মই পূর্ব-ভারতে থাকিয়া পূর্ব-ভারতের অতীত গৌরবের সাক্ষী দিতে লাগিল।

পূর্বাঞ্চলেই বহু ধর্মের প্রসার।

বৌদ্ধদিগের অনেক আচার-ব্যবহার আর্যগণের মধ্যে নাই। বৌদ্ধেরা সব মাথা কামায়— কোথাও এক গাছি কেশ রাখে না। কিন্তু হিন্দুর পক্ষে মাথার মাঝখানে একটা শিখা রাখা নিতান্ত দরকার। একথা যে আমরাই বলিতেছি এমন নহে, যে-সকল মুসলমানেরা প্রথম বেহার দখল করেন তাঁহাদেরও আশ্চর্য বোধ হইয়াছিল। তাঁহারা বৌদ্ধ বলিয়া একটা ধর্ম আছে জানিতেন না। একটা বৌদ্ধ-বিহার জয় করিয়া তাঁহারা দেখিলেন সেখানে বহু-সংখ্যক ব্রাহ্মণ রহিয়াছে, তাহাদের সব মাথা কামানো। সব মাথা কামানো হিন্দুর হইতেই পারে না; তবে ইদানীং কোনো কোনো সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী শিখা ত্যাগ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের শিখাচ্ছেদের ন্যায় অবমাননা আর নাই। সেইজন্য ধর্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা, ব্রাহ্মণ কোনো গুরুতর দুষ্কর্ম করিলে তাহাকে দেশ হইতে দূর করিয়া দিবে। তাহার সম্পত্তি তাহার সঙ্গে দিবে, কেবল তাহার শিখাটি ছেদন করিয়া লইবে। কিন্তু বৌদ্ধধর্মে সকলেরই শিখাচ্ছেদ করিতেই হইত।

বৌদ্ধ ও আর্য আচার-ব্যবহার ভেদ।

মাথা কামানো।

আহার বৌদ্ধেরা বারোটার আগে করিবে। বারোটার এক মিনিট পরে আহার করিতে পারিবে না। আহার তাহাদের কিছুই অখাদ্য নহে। যদি তাহাদের আহারের উদ্দেশে মারা না হয়, অন্য কারণে কোনো জন্তু মারা হয়, তাহারা সে জন্তুর মাংস অনায়াসে খাইতে পারে। রাত্রে তাহারা রস খাইতে

আহারের নিয়ম।

পারে, জল খাইতে পারে, কিন্তু শক্ত জিনিস খাইতে পারে না। তাহারা পেয় খাইতে পারে কিন্তু চর্ব চোষ্য লেহ্য খাইতে পারে না। এই তো তাহাদের নিয়ম। এটি কিন্তু আর্য নিয়মের বিরোধী। আর্যগণ এক সূর্যে দুইবার খাইতেন না। সুতরাং দিনে একবার ও রাত্রে একবার। তাঁহাদের কল্যবর্ত বা প্রাতরাশের কথা আমরা সর্বদা শুনিতে পাই। একবার খাইয়া আর্যগণ চব্বিশ ঘণ্টা থাকিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। তাঁহাদের ক্ষুধা সতেজ ছিল।

স্বর্ণ রৌপ্য ত্যাগ।

বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ সোনা রূপা ছুঁইতে পারিতেন না। পূর্ব-ভারতে উহাদের ছোঁয়ার দরকার ছিল না। কারণ সোনা রূপার টাকা এদেশে অতি কমই ব্যবহার হইত। এদেশে কড়ির ব্যবহার অধিক ছিল, সোনা রূপা ব্যবহার না করিলেও চলিত।

উচ্চাস মহাসন ত্যাগ।

বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণ উচ্চাসন মহাসন ত্যাগ করিতেন। হিন্দুস্থানে পঞ্জাবে এমন-কি ভারতবর্ষের সব দেশেই খাটিয়ার উপর শোয়। মাটিতে শুইতে তাহাদের বড়োই কষ্ট হয়, পারতপক্ষে তাহারা মাটিতে শোয় না। কিন্তু বাংলায় তাহার বিপরীত। অধিকাংশ লোকই ভূমিতে শয্যা পাতিয়া শোয়। অবস্থাপন্ন ব্যক্তি হইলে খাট চৌকি তক্তাপোষ ব্যবহার করে।

মদ্য-ত্যাগ।

বৌদ্ধমতে মদ খাওয়া একেবারে নিষেধ। গৃহস্থ যাহারা পঞ্চশীল মাত্র গ্রহণ করিবে তাহারাও মদ খাইতে পারিবে না, একথা আর্যগণের পক্ষে খাটে না। তাঁহারা সোম পান করিতেন। সৌত্রামণিযাগে তাঁহারা সুরাপান করিতেন। পুরাণে বলে, পূর্বে সকলেই সুরাপান করিতেন, কিন্তু শুক্রাচার্য শাপ দেওয়ায় মদ খাওয়া মহাপাতকের মধ্যে গণ্য হয়। কিন্তু বৈধ মদ্য সকল সময়েই চলিত, যথা পশুযাগে সোম, সৌত্রামণিতে সুরা।

এইরূপে দেখা যায় যে, বৌদ্ধধর্ম ও আর্যধর্মে অনেক কাজের কথায়ই প্রভেদ। তখন বৌদ্ধধর্ম কোথা হইতে আসিল বলিতে গেলে, আর্য-ধর্ম হইতে আসিল একথা বলা যায় না, আর-কোনো দিক হইতে আসিয়াছে। এত প্রাচীনকালে আর কোন্ দিক হইতে আসিবে, সুতরাং পূর্ব দিক হইতেই আসিয়াছে। আচ্ছা যদি তাহাই হইল, তবে বুদ্ধদেব কী নূতন কথা বাহির করিয়াছেন? তাঁহার ধর্মের স্থূল কথাগুলি, বিষয়গুলি যদি প্রাচীন ধর্ম বা প্রাচীন সমাজ হইতে লওয়া, তবে তাঁহার নূতনত্ব কী? বুদ্ধদেবের পূর্বেও লোকে সংসার ত্যাগ করিত, ভিক্ষু হইত; যেমন পার্শ্বনাথের দল, কনকমুনির দল। সংসার ত্যাগ করিয়া ভিক্ষু হইয়া থাকিতে গেলেই অহিংসা, অস্তেয় প্রভৃতি শীল গ্রহণ করিতে হয়, খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে খুব সাবধান হইতে হয়। প্রাচীন ভিক্ষুরাও তাহাই করিত। কিন্তু বুদ্ধদেব যে বিহার ও সংঘারামের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজের। ভিক্ষুদিগের শাসনের জন্য যে-সকল নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজের। এক জায়গায় অনেক ভিক্ষু থাকার ব্যবস্থা তাঁহার নিজের। এইরূপ অনেকগুলি ভিক্ষু একত্র থাকিলে তাহাদের মধ্যে কোনোরূপ গোলযোগ যাহাতে না হয়, তাহার ব্যবস্থা তাঁহার নিজের। যে-সকল সুন্দর সুন্দর গল্প করিয়া তিনি সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ

করিতেন, সেগুলি প্রাচীন ভারতে চলিত থাকিলেও, যে আকারে তাহাদিগকে এখন দেখিতে পাওয়া যায় সে আকারটি তাঁহার দেওয়া। তিনি রাজার ছেলে, রাজা হইবার সবশিক্ষা তাঁহার হইয়াছিল। তিনি সংসার ত্যাগ করিয়াও রাজার প্রধান যে গুণ, দশ জনকে লইয়া সুন্দররূপে কাজ চালানো, তাহা ছাড়েন নাই। ভিক্ষুসংঘের পরম উন্নতির জন্য, তাঁহার যেসব রাজগুণ ছিল, সব প্রয়োগ করিয়াছেন। বাস্তবিকও তাঁহার সংঘ যেমন প্রবল হইয়াছিল এমন আর-কাহারো হয় নাই। তিনি যে শুদ্ধ ভিক্ষুদের বন্দোবস্ত করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন তাহা নহে। তিনি গৃহস্থ বৌদ্ধদিগের জন্যও বেশ বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের পঞ্চশীল ও অষ্টশীল দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।[২২]

কিন্তু যাহাতে বুদ্ধের ধর্ম এত বড়ো, যাহাতে বুদ্ধের নাম এত বড়ো, যাহার জন্য বুদ্ধের সংসারে এত সম্মান, যাহার জন্য সকল ধর্ম অপেক্ষা তাঁহার ধর্ম এত উদার, সেটি তাঁহার মধ্যমা প্রতিপৎ অর্থাৎ "মাঝামাঝি চলো, বাড়াবাড়ি করিও না।"[২৩] তিনি নৈরঞ্জনার ধারে ছয় বৎসর তপস্যা করিয়া যে জ্ঞান প্রাপ্ত হন, যাহা পাইয়া তিনি আপনাকে জ্ঞানী বলিয়া প্রচার করেন, যে জ্ঞান পাওয়ায় ইন্দ্র ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন, যাহা পাওয়ায় মার একেবারে হতাশ হইয়া পড়ে, সে এই মধ্যমা প্রতিপৎ। মাঝামাঝি চলো। অহিংসা ধর্ম পালন করিতে হইবে বলিয়া, একেবারে মুখে কাপড় বাঁধিয়া চলো যেন কোনো কীট মুখে না ঢুকিতে পারে। রাত্রে প্রদীপ জালিও না, পাছে তাহাতে কীট পতঙ্গ পড়ে। মলত্যাগ করিয়া তাহা কাঠি দিয়া নাড়িয়া দিও যেন পোকামাকড় তাহার মধ্যে শুকাইয়া না যায়। রাস্তায় চলিবার সময় এক গাছ ঝাঁটা হাতে করিয়া যাইও যেন তোমার পায়ের চাপনে কোনো পোকামাড় মারা না যায়। এ-সকল বাড়াবাড়ি নয় কি? বুদ্ধদেব এতদূর বাড়াবাড়ি করিতে বলেন না। তিনি বলেন ইচ্ছা করিয়া কোনো জীবহত্যা করিও না। তাহা হইলেই অহিংসা ধর্ম পালন হইবে। তিনি বলেন অত্যন্ত ভোগাসক্তি ভালো নয়; কেবল ভালো খাব, ভালো পরব, তারি চেষ্টা করা, সেটা ভালো নয়, আবার ক্রমাগত উপবাস করিব, পঞ্চতপা করিব, চারি দিকে আগুন জ্বালিয়া সূর্যের দিকে চাহিয়া দিন কাটাইয়া দিব, ইহাও ভালো নয়। তিনি নিজে যথেষ্ট কঠোর ব্রত করিয়াছিলেন, যথেষ্ট উপবাস করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে বুঝিয়াছিলেন যে, উহাতে কোনো লাভ নাই, শরীরের কষ্টই সার; তখন তাঁহার জ্ঞান হইল যে, এগুলি করা ভালো নয়। ভোগও করিবে না, কঠোরও করিবে না, তবে করিবে কী? অশ্বঘোষ বুদ্ধের মুখে বলাইয়াছেন, "আহারঃ প্রাণযাত্রায়ৈ ন ভোগায় নদৃপ্তয়ে।" এই যে মধ্যমা প্রতিপৎ এইটিই বৌদ্ধধর্মের মজ্জা, সার, নিগূঢ় কথা, উপনিষৎ। বুদ্ধদেব যতদিন জীবিত ছিলেন, সর্ব বিষয়ে মধ্যমা প্রতিপৎ অবলম্বন করিয়াই চলিতেন, শিষ্যদিগকে শিখাইতেন। দুটা বিরোধী জিনিস উপস্থিত হইলে, সে দুটার বিরোধ মিটাইয়া দিতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

'নারায়ণ'
ফাল্গুন এবং চৈত্র, ১৩২১ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. এই বইয়ে "ভারতের ভক্তি সাধনায় বৌদ্ধ প্রভাব" প্রবন্ধ দ্র.

২. এই বইয়ে "চিরঞ্জীব শর্মা" প্রবন্ধ দ্র.

৩. এই বইয়ে "শংকরাচার্য কী ছিলেন" প্রবন্ধ দ্র.

৪. বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের শ্রেষ্ঠতম ব্যাখ্যাতা রামানুজের জন্ম মাদ্রাজের কাছে শ্রীপেরাম্বুদুর গ্রামে। একাদশ শতাব্দীর শেষ ও দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বর্তমান ছিলেন। তাঁর কনিষ্ঠ সমসাময়িক অনন্তাচার্যের উল্লেখ অনুসারে জন্ম ১০১৭ খৃষ্টাব্দে। রামানুজের শিক্ষাগুরু খ্যাতিমান্ বৈদান্তিক যাদবপ্রকাশ। প্রচলিত কাহিনীতে গুরুর সঙ্গে তাঁর তীব্র মতবিরোধের উল্লেখ পাওয়া যায়। ৩০/৩২ বছর বয়সে রামানুজ সন্ন্যাসী হয়ে যান। তাঁর বহু শিষ্যের মধ্যে কুরেশ-এর নাম উল্লেখযোগ্য। কুরেশ রামানুজের গ্রন্থাদির লিপিকর ছিলেন। রামানুজের রচনাবলীর মধ্যে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মসূত্রের টীকা 'শ্রীভাষ্য', 'বেদান্তদীপ', 'বেদান্তসার', 'বেদান্তসংগ্রহ'। আনুমানিক ১১১৭-২৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে 'শ্রীভাষ্য' রচনা সম্পূর্ণ হয়েছিল। শংকরাচার্যের জ্ঞানমার্গী বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদের প্রভাব প্রতিরোধের জন্যে জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়ে বেদান্ত দর্শনকে দ্বৈতবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। রামানুজের মতাবলম্বী বৈষ্ণব সম্প্রদায় শ্রী-সম্প্রদায় নামে পরিচিত।

আনুমানিক ১১৩৭ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। দ্র. *H-I-P* Vol. III, pp. 100-05.

৫. নাগার্জুনের কনিষ্ঠ সমসাময়িক এবং শিষ্য, 'চতুঃশতিকা' গ্রন্থের লেখক আর্যদেব খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ ও তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্তমান ছিলেন। বোধিসত্ত্বদেব, কাণদেব, নীলনেত্র, পিঙ্গলনেত্র তাঁর নামান্তর। আর্যদেবের জন্ম সিংহলে, পরে দক্ষিণ ভারতে এসে নাগার্জুনের শিষ্য হন। ভিন্ন মতে তিনি দক্ষিণ ভারতেরই মানুষ। হিউয়েন-ৎসাঙের বিবরণ অনুসারে আর্যদেব নাগার্জুনের সঙ্গে দেখা করতে এলে নাগার্জুন ভৃত্যের হাতে একটি জল ভরা পাত্র পাঠিয়ে দর্শনপ্রার্থীর সামনে ধরতে বলেন। আর্যদেব কোনো কথা না বলে একটি সূচ জলপাত্রে ফেলে দিলেন। ভৃত্য একথা নাগার্জুনকে জানালে তিনি উল্লসিত হয়ে বলে ওঠেন, এই দর্শনপ্রার্থী নিশ্চয়ই একজন প্রাজ্ঞ মানুষ। তাঁকে ভেতরে নিয়ে আসতে আদেশ করলেন। ভরা জলপাত্রটি নাগার্জুনের নিজের জ্ঞানের প্রতীক। জলপাত্রে সুচ ফেলে আর্যদেব বুঝিয়েছিলেন, তিনি নাগার্জুনের জ্ঞানের তল অবধি যেতে সক্ষম। নাগার্জুন তাঁকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করলেন। নাগার্জুনের শিক্ষায় আর্যদেব বৌদ্ধবিদ্যায় পারঙ্গম হয়ে ওঠেন। বৈশালীতে, উত্তর ভারতের শ্রুঘ্ন দেশে, চোলভূমিতে তিনি ভিন্ন মতাবলম্বীদের বিতর্কে পরাভূত করে ব্যাপক প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। প্রয়াগে একটি সংঘারামে আর্যদেব তাঁর 'শতশাস্ত্রবিপুল্য' গ্রন্থখানি রচনা করেছিলেন। 'শত(ক)শাস্ত্র', 'অক্ষরশতক', 'মহাপুরুষশাস্ত্র', 'শাস্ত্র' প্রভৃতি গ্রন্থ আর্যদেবের রচনা মনে করা হয়। গুরু নাগার্জুনের সঙ্গে যৌথভাবে তিনি রচনা করেন 'মাধ্যমিকশাস্ত্র'। আর্যদেবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'চতুঃশতিকা'। চন্দ্রকীর্তির টীকা সমেত সমগ্র 'চতুঃশতিকা' তিব্বতি অনুবাদে পাওয়া গেছে। ১৬ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ 'চতুঃশতিকা'র প্রথম ৮ অধ্যায়ে আর্যদেব মাধ্যমিক তত্ত্ব প্রতিপাদন করেছেন, পরের ৮ অধ্যায়ে আছে অন্যান্য বৌদ্ধ দর্শন এবং সাংখ্য ও বৈশেষিক দর্শনের বিচার। মাধ্যমিক দর্শনের ধারায় নাগার্জুনের 'মাধ্যমিক-কারিকা'র পরেই 'চতুঃশতিকা'র স্থান।

মূল 'চতুঃশতিকা' সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে একটি খণ্ডিত পুথি সংগ্রহ করেছিলেন। এই আবিষ্কারের গুরুত্ব সম্পর্কে রুশ ভারতবিদ্যাবিদ্ ফিদর ইপ্পোলিতোভিচ শ্চেরবাট্স্কোই-এর মন্তব্য শাস্ত্রীমশায় উল্লেখ করেছেন, "On the last day of his stay in Calcutta, I showed this MS. to Professor Schervetsky [Stcherbatskoi], and he was convinced of the genuineness of the work. He pronounced it to be a great discovery. He said that European scholars would be anxious to get it, and asked me to go to press at once. ...Dr. Ross tells me that Professor Schervetsky regarded the finding of this work as the greatest sensation during his stay in India." ("Notes on the newly found Manuscript of Chatuhsatika by Aryadeva". *J-A-S-B,* July 1911, p. 436). এই বইয়ের পৃ. ৩০-৩১ (প্রাসঙ্গিক তথ্য), সূত্র ৫ দ্র.

৬. এই বইয়ের পৃ. ১৬ (প্রাসঙ্গিক তথ্য), সূত্র ১৩ দ্র.

৭. "প্রজা হ তিস্র অত্যায়মায়ন্" ঋগ্বেদীয় এই শ্লোকাংশের ব্যাখ্যায় 'ঐতরেয় আরণ্যকে' (২-১-১-৫) বলা হয়েছে, "যা বৈ তা ইমাঃ প্রজাস্তিস্রো অত্যায়মায়ংস্তানীমানি বয়াংসি বঙ্গা বগধাশ্চেরপাদাঃ", এই যে তিনটি সৃষ্ট জীবজাতি নষ্ট হয়েছিল, তারা এইসব পাখি—বঙ্গেরা, বগধেরা, চেরপাদেরা (অথবা/এবং ইরপাদেরা)।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় "Bengal, Bengalees, Their manners, customs and literature" নামে শাস্ত্রীমশায়ের একটি অপ্রকাশিত প্রবন্ধের তথ্য ব্যবহার করেছিলেন। রাখালদাসের লেখা থেকে বোঝা যায় এই প্রবন্ধে বঙ্গ-বগধ-চের প্রসঙ্গ ছিল। দ্র. বাঙ্গা-ই-১, পৃ. ২৬।

শাস্ত্রীমশায়ের ইঙ্গিত অনুসরণ করে এ বিষয়ে ব্যাপক বিচার-বিবেচনা করেন অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর "চেরোজাতি" (পৌষ ১৩২৮ ব.), "বগধজাতি" (অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ ব.) প্রবন্ধে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, রাহুল সাংকৃত্যায়ন পিপরিয়া-রামপুরা-ঠোরী অঞ্চলে ভ্রমণের বিবরণে লিখেছেন, "এখানে এক বিচিত্র জাতিগোষ্ঠীর মানুষের সঙ্গে পরিচয় হলো। এরা থারু নামে পরিচিত। বিভিন্ন সময়ে পণ্ডিতেরা এদের নিয়ে গবেষণা করেছেন। এদের বৈশিষ্ট্য—এরা আকৃতিতে মঙ্গোলীয় কিন্তু এদের ভাষার সঙ্গে বিহারের গয়া অঞ্চলের মগহী ভাষার অদ্ভুত মিল দেখা যায়। দক্ষিণ দেশের অ-থারু জাতিগোষ্ঠীকে এরা বাজি (বৃজি-লিচ্ছবী) এবং নিজেদের দেশকে বাজিয়ান বলে থাকে। এরা মুরগী এবং শুয়োর দুই-ই আহার্য হিসেবে গ্রহণ করে; যদিও স্থানীয় হিন্দুদের কাছে মুরগী খাওয়াটা একটা গর্হিত কাজ। এদের মধ্যে আবার একটা সম্প্রদায় আছে যাদের নাম চিতবনিয়া থারু। এরা বলে, এদের পূর্বপুরুষেরা রাজস্থানের চিতোর থেকে এসেছিলেন। আর লুম্বিনীর কাছাকাছি বাস করা থারুরা নিজেদের অযোধ্যার বনবাসী রাজার বংশধর বলে পরিচয় দেয়।" (রাহুল সাংকৃত্যায়ন, 'তিব্বতে সওয়া বছর', অনুবাদ : মলয় চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা ১৯৮২, পৃ. ৩৯)।

৮. রাজা হর্ষবর্ধনের (রাজত্বকাল ৬০৬-৪৭ খৃ.) সভাকবি বাণভট্ট রচিত আখ্যায়িকা কাব্য 'হর্ষচরিত'। বাণের অপর প্রসিদ্ধ রচনা 'কাদম্বরীকথা'।

৯. গান্ধার অঞ্চলে প্রথম শক আধিপত্য বিস্তার করেন মোয়েস আনুমানিক ৮০ খৃষ্টপূর্বাব্দে। আ. ৫৮ খৃষ্টপূর্বাব্দে দ্বিতীয় শক রাজা আজেস উত্তর ভারতে প্রভাব বিস্তৃত করেন।

১০. এই বইয়ের পৃ. ২৯-৩০ (প্রাসঙ্গিকতথ্য), সূত্র ৩ দ্র.

১১. রামপুত্র উদ্রক, উদ্দক, রুদ্রক বুদ্ধদেবের দ্বিতীয় গুরু। অড়ার কালামের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বুদ্ধদেব রাজগৃহে যান। রুদ্রক রাজগৃহে অধ্যাপনা করতেন। বুদ্ধদেব তাঁর কাছে কিছুদিন শিক্ষা নিয়েছিলেন। রুদ্রক বলতেন— শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা অবলম্বন করে মোক্ষপথের পথিক হওয়া উচিত। এই পথেই জ্ঞান ও অজ্ঞান দুই-ই অতিক্রম করা যায়। এ শিক্ষায় বুদ্ধদেবের তৃপ্তি হল না, কারণ, সংজ্ঞা ও অসংজ্ঞার অতীত অবস্থায় উপনীত হওয়া সম্ভব হলেও এই পথে নির্বেদ, বৈরাগ্য, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা ও নির্বাণ লাভ করা যায় না। তাই তিনি রামপুত্র উদ্রকের আশ্রয় ছেড়ে গেলেন।

"Chronology of the Samkhya Literature" প্রবন্ধে শাস্ত্রীমশায় সাংখ্য মতের সঙ্গে বৌদ্ধ মতের সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করেছেন। অনুষঙ্গ দ্র.

১২. অনুবাদ : সনক ও সনন্দ এবং সনাতন (এই) তিন জন, কপিল ও আসুরি এবং পঞ্চশিখ যিনি মাতুলালয়ে পরিবর্ধিত।

১৩. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ প্রকাশিত *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ* ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭৬ সূত্র ২০ দ্র.।

১৪. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ প্রকাশিত *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ* ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৯ সূত্র ১৩ দ্র.

১৫. 'আপস্তম্বীয় কল্পসূত্র' প্রণেতা প্রসিদ্ধ ধর্মসূত্রকার আপস্তম্ব। তিরিশটি প্রশ্নে বিভক্ত কল্পসূত্রের বিভিন্ন অংশের নাম শ্রৌতসূত্র, পরিভাষা, গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র ও শুল্বসূত্র। পঞ্চম বা চতুর্থ খৃষ্টপূর্বাব্দের আগে এই গ্রন্থ সংকলিত হয়েছিল। কল্পসূত্র সংকলন সম্পর্কে শাস্ত্রীমশায় মন্তব্য করেছেন—

"The Smriti had its origin in the Vaidika Schools, Sakhas or Parsads, each Sakha, to preserve the integrity of the Vedic traditions prevailing among its followers, wrote works on the six Vedangas, namely (1) Phonetics; (2) Sacrificial and other Laws; (3) Grammar; (4) Philology; (5) Prosody, and (6) Astronomy. Of the six Vedangas the second called *Kalpa* is broadly divided into two Sections, Srauta and Smarta. Srauta deals with sacrificial rules and serves as a commentary and supplement to the Brahmanas, while the Smarta deals with domestic and social regulations which derive their authority from the memory of and tradition among the sages. There are many schools which have preserved their *Kalpas* intact, but the majority have left only fragments of their *Kalpas;* of the former class are the schools of Apastamba, Baudhyayana, Hiranyakesin, Asvalayana and Katyayana; of the later, i.e., those whose *Kalpas* we get only in a fragmentary and incomplete condition are Bharadvaja, Masaka, Gautama, Vasistha and so forth." *(Shastri. Cat.,* Vol. III, Smriti Manuscripts, preface, pp. vi-vii).

১৬. অনুবাদ : যে দিনে মনে বৈরাগ্য জাগবে সেইদিনই সংসার ত্যাগ করা উচিত।

১৭. মহাবীরের জন্ম আনুমানিক ৫৯৯ খৃস্টপূর্বাব্দে। বাবা সিদ্ধার্থ। মা বৈশালীর লিচ্ছবিরাজার মেয়ে ত্রিশলা। জন্মনাম বর্ধমান। জ্ঞাতৃ-বংশীয় ক্ষত্রিয় বলে অন্য নাম জ্ঞাতৃপুত্র। দিগম্বর সম্প্রদায়ের মতে বর্ধমান অবিবাহিত ছিলেন। শ্বেতাম্বর মতে তাঁর স্ত্রীর নাম যশোদা এবং একমাত্র সন্তান অনুজা বা প্রিয়দর্শনা। তিরিশ বছর বয়সে বর্ধমান সন্ন্যাসী হয়ে যান। বারো বছর তপস্যার পরে পরেশনাথ পাহাড়ের কাছে নদীতীরে এক শালগাছের নিচে কেবল-জ্ঞান অর্জন করেন। সিদ্ধিলাভের পর তাঁর নাম হয় মহাবীর, কেবলী, জিন অর্থাৎ যিনি জয়লাভ করেছেন (জৈন শব্দটি জিন্ থেকে উদ্ভূত)। উত্তর ও দক্ষিণ বিহারে এবং পশ্চিমে কৌশাম্বী অবধি ভ্রমণ করে মহাবীর নিজের ধর্মমত প্রচার করেন। তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল রাজগৃহ-নালন্দা অঞ্চল। মহাবীরের ঘনিষ্ঠ এগারো জন শিষ্য গণধর নামে পরিচিত ছিলেন। এঁরা তাঁর অনুগামী শ্রমণদের নিয়ন্ত্রণ করতেন। সংঘের সকলকে কঠোর নিয়ম-সংযম মানতে হত। মহিলাদেরও সংঘে নেওয়া হত। গৃহস্থ নারীপুরুষ শ্রাবক নামে সংঘের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন। ক্রমিক বিকাশের পথে আত্মার মুক্তি মহাবীরের জৈনধর্মের মূল কথা। আত্মাকে কর্মের আবরণ মুক্ত করাই মোক্ষ। মোক্ষ-পথে অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের ভিত্তি জীব (আত্মা), অজীব, আস্রব, বন্ধ, পুণ্য, পাপ, সংবর, নির্জরা ও মোক্ষ— এই নয়টি তত্ত্ব। নয়টি তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে সম্যক্ দর্শন, সম্যক্ জ্ঞান ও সম্যক্ চারিত্র—রত্নত্রয় যুক্ত হলে ব্যক্তি মুক্তিমার্গে অগ্রসর হতে পারে। জৈন মতে সাক্ষাৎ মুক্তি দেবতাদের অনায়ত্ত, মুক্তিলাভের জন্য দেবতাদেরও মানুষ হয়ে জন্মাতে হয়। মানবজীবন শ্রেষ্ঠতম, কারণ, একমাত্র মানুষই মুক্তির জন্য যোগ সাধনায় সমর্থ। জৈনধর্মে ঈশ্বর উপাসনার স্থান নেই, সৃষ্টি এঁদের দৃষ্টিতে অনাদি এবং অনন্ত।

আনুমানিক ৫২৭ খৃস্টপূর্বাব্দে মহাবীরের মৃত্যু হয়।

১৮. জৈন তীর্থংকর পরম্পরায় ২৩তম পার্শ্বনাথ কাশীর এক রাজপরিবারের ছেলে। জন্ম মহাবীরের প্রায় আড়াই শো বছর আগে, অষ্টম খৃ. পূর্বাব্দে। বাবা অশ্বসেন, মা বামা। কুশস্থল-রাজ প্রসেনজিতের মেয়ে প্রভাবতীকে পার্শ্বনাথ বিয়ে করেন। তিরিশ বছর বয়সে সংসার ছেড়ে যান এবং চুরাশি দিন তপস্যার পরে কেবল-জ্ঞান অর্জন করেন। প্রচলিত বিশ্বাস, সিদ্ধিলাভের পরে সত্তর বছর ধরে তিনি ধর্মপ্রচার করেছিলেন। পার্শ্বনাথের মূল শিক্ষা চারটি, মতান্তরে পাঁচটি—১. অহিংসা, ২. সত্য, ৩. অচৌর্য, ৪. বিষয়ে অনাসক্তি, ৫. ব্রহ্মচর্য। পার্শ্বনাথের অ-বৈদিক ধর্মমত ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল, তাঁর অনুগামী শ্রমর্ণ-সংঘ সুসংগঠিত ছিল। একশো বছর বয়সে পরেশনাথ পাহাড়ে পার্শ্বনাথের মৃত্যু হয়।

১৯. স্থবিরবাদী সম্প্রদায়ের পালি 'সুত্তপিটক'-এর অন্তর্গত "দীঘনিকায়ে"র আটানাটিয় সূত্রান্তে গৌতমবুদ্ধকে নিয়ে সাত জন বুদ্ধের নাম আছে— ১. বিপস্সি, ২. সিখি, ৩. বেস্সভু, ৪. ককুসন্ধ, ৫. কোনাগমন, ৬. কস্সপ এবং ৭. অঙ্গীরস বা গৌতম। পরবর্তী বৌদ্ধশাস্ত্রে এই তালিকায় আরো নাম যুক্ত হয়েছে। যেমন, ১. দীপংকর, ২. কোণ্ডঞ্ঞ বা কৌণ্ডিন্য, ৩. মঙ্গল, ৪. সুমন, ৫. রেবত, ৬. শোভিত, ৭. অনোমদস্সি বা অনোমদর্শী, ৮. পদুম, ৯. নারদ, ১০. পদুমুত্তর, ১১. সুমেধ, ১২. সুজাত, ১৩. পিয়দস্সী বা প্রিয়দর্শী, ১৪. অথদস্সী বা অর্থদর্শী, ১৫. ধম্মদস্সী বা ধর্মদর্শী, ১৬. সিদ্ধার্থ, ১৭. তিস্স বা তিষ্য, ১৮. ফুস্স এবং আগে গৌতম ভিন্ন আর যে ছয় জন বুদ্ধের নাম করা হয়েছে তাঁদের নিয়ে ২৪ জন। 'বুদ্ধবংস' গ্রন্থে "বুদ্ধপ্রকীর্ণক কাণ্ড" অধ্যায়ে বলা হয়েছে দীপংকরের আগে তণহংকর, মেধংকর ও সরণংকর নামে আরো তিন জন বুদ্ধ আবির্ভূত হয়েছিলেন।

'ললিতবিস্তরে' ৫৪ জন বুদ্ধের উল্লেখ আছে। 'মহাবস্তু অবদানে' বলা হয়েছে বুদ্ধ অগণিত। ঐতিহাসিক ব্যক্তি গৌতমবুদ্ধের অলৌকিক মহিমা প্রতিপন্ন করার আগ্রহে এইভাবে কোটি কোটি পূর্বগামী বুদ্ধের অস্তিত্ব কল্পিত হয়েছে। বহু বুদ্ধ কল্পনার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শাস্ত্রীমশায় লিখেছেন—

"There, however, came a split in the Buddhist camp, in the second century after Buddhas Nirvana. The *Maha vamsa* ascribes this split to ten points of conduct, such as storing a bit of salt in a horn, taking some refreshment before going to an invitation to a distant village, continuing to take cooked food some minutes after twelve, and so on. The *Maha-vamsa* says, the younger generation of monks wanted relaxation of the food, conduct and moral regulations so rigidly enforced by Buddha himself and his elderly disciples. But the Elders would not yield and inch and there was a split, Modern thinkers consider these points of difference to be too trivial to warrant an abiding and everlasting separation. A perusal of the *Maha-vastu-Avadana* will convince the reader that there were deeper causes of separation. The Primitive Buddhism thought Buddha to be a human being who by exertion sustained through innumerable births attained to Buddhahood, or the position of the teacher and guide of the world. He was, they thought, *Laukika* or human but the new school thought him to be *Lokottara,* super-human. It may be noted here that from the colophons of the *Maha-vastu* some people thought it to be a work on the Vinaya of the Lokottaravadins among the Maha-sanghikas, or the new school. But this seems to be hardly convincing; the word *Lokottara-vadinam* in these colophons is a permanent adjective or *Uddesya-visesana* and not a predicative adjective or *Vidheya-visesana,* and among the various schools which arose in the new school, there is hardly any sect named Lokottara-vadin. According to this school Buddha was exerting through innumerable Kalpas. (Their idea of time and space is more spacious and of longer duration than that of primitive Buddhism). In one Kalpa it was pronounced by the Buddha of the time that this disciple of his would be a great man. In another Kalpa the Buddha of the time pronounced that he should be a Buddha, another Buddha of another Kalpa declared that his time was coming. Kasyapa of this Kalpa, appointed him yuva-raja and so he was born at Kapila-vastu and became Buddha. This is certainly, more than human. Primitive Buddhism thought that there were six Buddhas before him and one would follow him. These are called *Manusi* Buddhas. But the new school enumerates at least three hundred Buddhas (though by

counting I got only 297), and says that the number in infinite. In the *Maha-vastu* which is the gospel of the new school, Buddha is given the miraculous power of sending emanations from him exactly like him and calling them *Nirmitas* which were perhaps in later times called *Nirmana-Kayas. (Advayavajrasamgraha, G-O-S,* No. XL, 1927, Introduction, pp. xvii-xix.

জৈন মতে কালের দুই ভাগ, উৎসর্পিনী বা ক্রমোন্নতির যুগ এবং অবসর্পিনী বা ক্রমিক অবনতির যুগ। যুগ দুটি ছয়টি 'অর' বা ভাগে বিভক্ত। ক্রমোন্নতি ও ক্রমিক অবনতির তৃতীয় ও চতুর্থ অরে ২৪ জন করে তীর্থংকর আবির্ভূত হন। চলতি অবসর্পিনীর ২৪ জন তীর্থংকরের নাম—১. ঋষভ বা আদিনাথ, ২. অজিত, ৩. সম্ভব, ৪. অভিনন্দন, ৫. সুমতি, ৬. পদ্মপ্রভ বা সুপ্রভ, ৭. সুপার্শ্ব, ৮. চন্দ্রপ্রভ বা শশি, ৯. সুবিধি বা পুষ্পদন্ত, ১০. শীতল, ১১. শ্রেয়াংশ, ১২. বাসুপূজা, ১৩. বিমল, ১৪. অনন্ত, ১৫. ধর্ম, ১৬. শান্তি, ১৭. কুন্থু, ১৮. অর, ১৯. মল্লি, ২০. মুনিসুব্রত, ২১. নমি, ২২. নেমি বা অরিষ্টনেমি, ২৩. পার্শ্বনাথ এবং ২৪. মহাবীর। পার্শ্বনাথ এবং মহাবীর ভিন্ন আর-সব তীর্থংকর কাল্পনিক চরিত্র।

২০. এখনকার নেপালের ভৈরহাওয়া জেলার রুম্মিনদেই বুদ্ধদেবের জন্মস্থান লুম্বিনী। রুম্মিনদেই-এর প্রায় ২৩ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে নিগলিসাগর নামে জলাশয়ের তীরে একটি খাম্বা বা স্তম্ভের গায়ে লেখা আছে—

দেবানংপিয়েন পিয়দসিন লাজিন চোদস-বসা [ভিসিতেন]
বুধস কোনাকমনস থুবে দুতিয়ং বটিতে [। *]
[বীসতি-ব *] সাভিসিতেন চ অতন আগাচ মহোয়িতে
[সিলা-থম *] [চ *] [উস- *] পাপিতে [॥ *]

খাম্বাটির নিচের অংশ নেই। নিগলিসাগরের ১১ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত গোটিহাওয়াতে ভাঙা স্তূপের পাশে একটি খাম্বার নিচের অংশ আছে। নিগলিসাগরের ধারে পাওয়া খাম্বা এবং এটি একই পাথরে তৈরি। মাপ থেকে অনুমিত হয় এটি নিগলিসাগর-খাম্বার নিচের অংশ। কোনো সময়ে ভাঙা উপরের অংশ এখান থেকে নিগলিসাগরের ধারে নিয়ে যাওয়া হয়ে থাকবে। হিউয়েন্-ৎসাঙ খাম্বার পাশে স্তূপ দেখেছিলেন। নিগলিসাগরের ধারে কোনো স্তূপ নেই, রয়েছে গোটিহাওয়ায়। অশোক সম্ভবত এই স্তূপই সংস্কার করে দ্বিগুণ বাড়িয়েছিলেন। কনকমুনির নির্বাণ স্থান গোটিহাওয়ায় হওয়াই সম্ভব। খাম্বাটির লিপি থেকে বোঝা যাচ্ছে খৃস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে পূর্ব পূর্ব বুদ্ধের অস্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা প্রচলিত ছিল। দ্র. *S-I-I,* p. 71; *B-M.* pp. 250-53.

২১. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ প্রকাশিত *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ* ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮৩ সূত্র ১৩ দ্র.

২২. যে কুশলধর্মে প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষ আত্মমুক্তির দিকে অগ্রসর হতে সমর্থ হয় তাকে বলা হয় শীল। শীল শব্দের অর্থ সুনীতি অবলম্বনে কায়িক, বাচনিক, মানসিক সংযম অভ্যাস। গাছ, পাহাড় যেমন পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বৃদ্ধি ও বিপুলতা লাভ করে তেমনি মুক্তিকামী যোগী শীলকে আশ্রয় করে শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা— এই পাঁচ ইন্দ্রিয় ও পাঁচ বল ভাবনা করেন ('মিলিন্দপঞ্হো')। সাধারণ গৃহস্থের নিত্য পালনীয় পঞ্চশীল। আগ্রহী গৃহস্থ অষ্টশীল, এমন-কি দশশীল পর্যন্ত পালন করতে পারেন। দশশীল যথাক্রমে— ১. প্রাণীবধ থেকে বিরত, শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি (পাণাতিপাতা বেরমণী

সিক্‌খাংপদং সমাদিযামি), ২. অদত্ত বস্তু নেওয়া থেকে বিরত, শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি (অদিন্নাদানা...), ৩. ব্যভিচার থেকে বিরত, শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি (কামেসু মিচ্ছাচারা...), ৪. মিথ্যাবাদ থেকে বিরত, শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি (মুসাবাদা...), ৫. প্রমাদ স্থান, সুরা মৈরেয়— মদ্য থেকে বিরত, শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি (সুরা মেরেয়-মজ্জ-পমাদট্‌ঠানা...), ৬. বিকালে আহার থেকে বিরত, শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি (বিকাল ভোজনা...), ৭. নাচ-গান-বাজনা-বিধর্মীদের পুতুলনাচ দেখা থেকে বিরত, শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি (নচ্চ-গীত-বাদিত-বিসূকদস্‌সন...), ৮. বিভূষণের জন্য মালা পরা, সুগন্ধি মাখা থেকে বিরত, শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি (মালা-গন্ধ-বিল্লেপন-ধারণ-মণ্ডন-বিভূসনট্‌ঠানা...), ৯. উচু শয্যা মহাশয্যা ব্যবহার থেকে বিরত, শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি (উচ্চসযনা মহাসযনা...), ১০. সোনা-রূপা প্রতিগ্রহ থেকে বিরত, শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি (জাতরূপ-রজত পাটিগ্‌গহণা...)। পালি 'বিনয়পিটকে' এই দশশীলের উল্লেখ আছে। মহাযান বৌদ্ধশাস্ত্র 'মহাবস্তু অবদান', 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' প্রভৃতিতে দশশীল কিছুটা পৃথক।

২৩. সিদ্ধিলাভের পর অষ্টম সপ্তাহে বুদ্ধদেব অপ্রতিহত ধর্মচক্র প্রবর্তনের উদ্দেশে বারাণসীর মৃগদাবে (সারনাথ) উপস্থিত হয়ে ভদ্রবর্গীয় পঞ্চক নামে পরিচিত কৌণ্ডিন্য, ভদ্রজিৎ, বাষ্প, মহানাম ও অশ্বজিৎ— এই পাঁচ জন ব্রাহ্মণের সঙ্গে মিলিত হন। এঁরা উপদেশ চাইলে বুদ্ধদেব বলেন, প্রব্রজিতেরা সচরাচর দুটি পদ্ধতি আশ্রয় করেন। ১. একদল গ্রাম্য ও সাধারণ লোকের মতো সব সময় কাম সুখে নিরত থাকেন, ব্রহ্মচর্য পালনের বা ইন্দ্রিয়বৃত্তি সংযমের চেষ্টা করেন না। ২. অন্যদল সর্বদা নিজেকে পীড়ন করেন, সর্বদা নিজের ক্লেশজনক অনুষ্ঠানে নিরত থাকেন। এই দুই পদ্ধতিই হেয় এবং আর্যজনের পরিত্যাজ্য। দুই চরম পথ ত্যাগ করে মধ্যম পথ অবলম্বনই শ্রেয়। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই মধ্যম পথ (পৃ. ২৮২, সূত্র ৪ দ্র.)। প্রথম ধর্মদেশনায় এইভাবে বুদ্ধদেব চরমভোগ এবং চরম কৃচ্ছ্র দুয়েরই নিন্দা করেন। সংসারে যখন ছিলেন তখন রাজার ছেলে হিসাবে চরম ভোগসুখের স্বাদ তিনি জানতেন। সাধনার পথে এসে চরম কৃচ্ছ্রসাধন করেছিলেন। সমকালে প্রচলিত যোগসাধনার সমস্ত পদ্ধতি তিনি এই সময়ে অনুসরণ করেন। 'মজ্‌ঝিম নিকায়' প্রথম খণ্ডে বুদ্ধের উক্তিতে তাঁর দুশ্চর তপস্যার বিস্তৃত বিবরণ আছে। আস্ফানক ধ্যানের অনুষ্ঠানে তিনি বলবান্ লোক যেভাবে দুর্বলকে পর্যুদস্ত করে তেমনি দাঁতে দাঁত চেপে, তালুতে জিব প্রচণ্ড জোরে চেপে নিজেকে নিগ্রহ করতেন। কুম্ভকে প্রবৃত্ত হয়ে শ্বাসরোধ করতেন, হাপরের মতো শব্দে কান দিয়ে বাতাস বেরোত। শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা বোধ করতেন। মনে হত যেন কোনো কসাই তাঁর শরীর খণ্ড খণ্ড করছে বা তাঁকে কয়লার আগুনে পোড়ানো হচ্ছে। নিরন্তর উপবাসে শরীর এত শীর্ণ হয়ে গিয়েছিল যে কোথাও বসলে উটের খুরের দাগের মতো একটুখানি দাগ পড়ত। পুরানো চালার কড়ি বরগার মতো বুকের পাঁজর সব বেরিয়ে পড়েছিল। চোখ দেখাত যেন গভীর কুয়োর মধ্যে জলের আভাস। পেটের চামড়া শিরদাঁড়ার সঙ্গে এমনভাবে লেগে থাকত যে শিরদাঁড়া ছুঁলে পেটের চামড়ায় হাত লাগত, পেটের চামড়া ছুঁলে হাত লাগত শিরদাঁড়ায়। এই আত্ম-নিগ্রহের পথে বুদ্ধদেব সত্যের সন্ধান পান নি। উপলব্ধি করেছিলেন, উন্নত মানস-চর্চার জন্য শরীর সুস্থ রাখা প্রয়োজন। 'দীঘ নিকায়ে'র পাটিক সূত্রান্তে বুদ্ধদেব কুক্কুরব্রতী চতুষ্কুণ্ডিক (চতুষ্পদের মতো হাত পায়ের সাহায্যে ভ্রমণশীল) নগ্ন কোরক্ষত্তিয়র সাধন-পদ্ধতির নিন্দা করে বলেছেন, মাটিতে ফেলে দেওয়া খাবার খেয়ে বেড়ানো ওই

কুকুরব্রতীর অলসক রোগে মৃত্যু অবধারিত। মৃত্যুর পরে সে কালকঞ্জ নামে সর্বনিকৃষ্ট অসুরদের মধ্যে জন্মাবে। 'দীঘ নিকায়ে'র উদুম্বরিক-সীহনাদ সূত্রান্তে নিগ্রোধ ও সমবেত ভিন্নপন্থী পরিব্রাজকদের বুদ্ধদেব কৃচ্ছ্রসাধন সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছেন। উপদেশের মর্ম এই যে, কৃচ্ছ্রসাধনরূপ তপে তপস্বীর অহংকার, আত্মশ্রেয়ত্বের অহমিকাই প্রকাশ পায়। সংযমের দ্বারা সুরক্ষিত, সর্বপ্রাণীর হিতাকাঙ্ক্ষা দ্বারা পরিশুদ্ধ-চিত্ত, মৈত্রীসহগত-চিত্ত, অনেকবিধ পূর্বজন্ম স্মরণক্ষম যিনি, তাঁর ব্রহ্মচর্য ও কৃচ্ছ্রসাধন শ্রেষ্ঠত্বে ও সারত্বে উপনীত হয়। চিত্তের শুদ্ধি ও অগ্রগতির সঙ্গে সম্পর্কহীন উৎকট কৃচ্ছ্র বুদ্ধদেব অনুমোদন করেন নি।

২. অনুষঙ্গ

শাস্ত্রীমশায়ের লেখা CHRONOLOGY OF THE SAMKHYA LITERATURE প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক অংশ।

Patanjali in his *Mahabhasya* mentions the Samkhyas. The *Lankavatarasutra,* one of the Pre-Mahayana sutras of the Buddhists, mentions the Samkhya by name, and Asvaghosa, one of the precursors of Mahayana, bases the whole Buddhist system of thought on the influence of the Samkhya. He says that both the teachers to whom Buddha applied for the solution of the problem of life, were followers of Kapila. The first teacher, Adara Kalama, explained to him the system of Kapila and pointed out to him how the human soul in its upward march can reach Infinity of space without losing individuality. The second teacher, Uddaka Ramaputra, led him still further. But Buddha was not satisfied. He contended that if Individuality remained, one cannot attain absolute Nirvana. So he studied and meditated for six years under the Bo-tree at Gaya and at last succeeded in destroying Individuality. He came to a state in which there would be no Samjna and no Samjni. Thus he supplied, as it were, the coping-stone to the arch of the Samkhya system, and brought it to a transcendental hight never contemplated by the founder of the system, Kapila himself. It may be argued that this is the idea of Asvaghosa. But Asvaghosa was one of the patriarchs of Buddhism. He was the Guru of Kaniska and as such flourished in the first or second century A.D. His opinion on a matter like this carry a good deal of weight.

It is a well-known fact that the original sutras of Kapila are lost with their bhasyas, commentaries, nay the whole literature based on them. What authentic literature remains, is confined to the seventy karikas of Isvarakrsna, called in the Chinese *Tripitaka,* the Golden Seventy. The

Chinese Tripitaka is mainly, nay exclusively, Buddhistic. But it contains a few important Hindu works too, one of them is the 'Golden Seventy'. Gaudapada, the precursor of Sankara, writes a commentary on them, and to these Sankara is indebted for all his ideas and quotations of the Samkhya system of philosophy. Sankara belonged to the early years of the ninth century and Gaudapada one generation earlier. But what is the age of Isvarakrsna?

The question has been solved in a Chinese work entitled the life of Vasubandhu written by an Indian monk named Paramartha, who migrated to China at the end of the fifth century A.D. and there wrote the book. He informs us that Isvarakrsna was a contemporary and rival of Vasubandhu, a Buddhist monk born in Peshawar and lived at the city of Oudh. He and his brother Asanga were the two pillars of the Mahayana faith in that century. They found a tough antagonist in Isvarakrsna and it is said that Isvarakrsna gained a reward of three lakhs of rupees by refuting the Buddhists, from the then reigning king, Baladitya.

So the work, entitled *Isvarakrsna-Karika* is the sheet anchor of the chronology of the Samkhya Literature. Isvarakrsna belonged to the fifth century A.D. and we have to go backwards and forwards in our quest of the dates of the Samkhya works. At the end of his work he gives us some information about the previous history of his system. The history is very meagre. But still it is authentic as coming from a man of Isvarkrsna's stamp. He says this system of philosophy was taught by the founder, Paramarsi to Asuri and he gave it to Pancasikha who wrote many works. The names of Asuri and Pancasikha are well known to every Brahmin, who cares to perform his daily ablutions, for he has to pour water everyday for the benefit of certain Rsis and these are,—Sanaka, Sananda, Sanatana, Kapila, Asuri, Bodhu and Pancasikha. But are they really historical persons? Sanaka, Sananda and Sanatana are mythical. Are the rest also mythical? The historicity of Kapila is never doubted. He is the founder of the Samkhya system and is called Paramarsi. Asuri and Pancasikha are both mentioned in the *Mahaoharata* and in that part of it which is really historical, commencing with such expressions as—

Tatrapyudaharantimam itihasam puratanam

There is a dialogue in the Santiparvan between Janaka and Pancasikha. Asuri also is mentioned there. But we have more tangible proofs of their existence as authors. Gunaratna, in his commentary, page 104, gives a quotation from Asuri on a vital question of the system and Pancasikha has been several times quoted in the Vyasa Bhasya on the Yogasutras.

Isvarakrsna gives us another piece of information that with the exception of the stories (in support of the Samkhya Theory) and with the exception of the refutation of other systems his seventy Karikas will give all that is to be found in the *Sastitantra.* So there was a work entitled *Sastitantra,* in which, not only were the Samkhya doctrines elaborated, but stories were given and refutations of other systems. But we know nothing more about the *Sastitantra* except a quotation in Gaudapada's commentary from that work and a summary of its contents in the Pancatantra work entitled *Ahirbudhna-samhita.* There is however a body of sutras divided into six chapters entitled *Samkhyà-Pravacana* and commented upon by a scholar named Vijnana Bhiksu in the eleventh century, which contains a chapter of Akhyayikas (stories) and another on refutations. Cannot this *Samkhya-Pravacana* be the *Sastitantra?* But we know nothing of the *Sastitantra* beyond the only quotation and the enumeration of topics just referred to and the name which means 'sixty topics' differently explained by different commentators. Was the *Sastitantra* in a sutra form? We do not know. But the *Pravacana* is in sutras. That the *Pravacana* is not the original *Sastitantra* is proved by its inclusion of a good many modern ideas. For instance, it calls the Advaita System by the name of Advaita, so it is not *Sastitantra.* It quotes the opinion of Pancasikha, so it cannot be the original sutras of Kapila, All that can be said about its authenticity is that it is based upon Sastitantra, but has been altered and interpolated beyond recognition. But what is the authority of Isvarakrsna? Does he follow an old tradition or does he give new interpretation to the Samkhya doctrine prevailing in his time? He simply says that all that is to be found in the *Sastitantra* is also to be found in his seventy Karikas. This shows that he does not introduce any novelty but only follows an old tradition, and from whom does that tradition derive its anthority? The question is rather difficult to be solved for want of materials. I found, however, after a good deal of search, a manuscript of the Karikas at the Jaina Upasraya named Sripujya in the city of Bikaner in which the Karikas are described as Mathara Bhasya. From that I inferred that there was a body of Samkhya sutras on which Mathara wrote a Bhasya and that Isvarakrsna simply followed him. Curiously enough, Gunaratna in enumerating the works of Samkhya literature says—

Samkhyanam tarkagranthah Sastitantroddhararupam Mathara bhasyam Samkhyasaptatinamakam,—which accords perfectly with the ideas I imbibed at Bikaner. But before that I several times read that passage but could not understand it, as the Italian editor of Gunaratna has put commas after Sastitantroddharapm and after Mathara-bhasya. I was

led to think that Gunaratna speaks of three works. But *Matharabhasya* is not the seventy Karikas. It has a separate existence, as Gunaratna quotes in page 96.

तदुक्तं माठरप्रान्ते— (प्रान्ते being a misprint for ग्रन्थे)

हस पिव लल खाद पिव नित्यं
भुंक्ष्य च भोगान् यथाभिकामं ।
यदि विदितं ते कपिलमतं
तत् प्राप्स्यसि मोक्षसौख्यमचिरेण ॥

Professor Sylvain Levi tells us from Chinese sources that there were three learned men at the court of Kaniska at the end of the first century A.D., (1) Asvaghosa was his Guru, (2) Mathara, his prime-minister and (3) Caraka his chief physician. I am tempted to identify the Bhasyakara Mathara with the prime-minister, because the other-two of his contemporaries were both experts in the Samkhya. He also presumably was an expert too, and primeministers in ancient days were not averse to writing exhausitive and comprehensive works. But the great difficulty is to fix the individuality of the authors because Mathara and Caraka are Gotra names.

The question of the derivation of the word 'Samkhya' was a difficult one. I did not understand why the system of Kapila should be named Samkhya. When asked, the pandits generally give a couplet in explanation which runs thus—

संख्यां प्रकुर्वते यस्मात् प्रकृतिञ्च प्रचक्षते ।
तत्त्वानि च चतुर्विंशत् तस्मात् सांख्याः प्रकीर्त्तिताः ।

Evidently the word 'Samkhya' means number, enumeration. But the pandits invariably explain it by Vivekakhyati, the differentation between the spirit and the matter, Prakrti and Purusa. But Professor Garbe boldly translated the word as Enumeration and called the Samkhya System as the Enumerative System and not the Hylotheistic System as translated by Hall. That gave me some food for though. It occured to me that Kaplila tried to fix philosophical ideas by numbers and my readings in the later Vedic literature confirmed me in my idea. I found that the Vedic writers were not very definite at their numbers. In enumerating the organs of sense they were not very definite about the number five. They would often say, Caksu, Srotra, Ghrana, Prana, Vak, etc. So also in the case of vital airs. They would sometimes say Prana and Apana; sometimes they would include Vyana but rarely they would speak of the five vital airs. So

I began to think that Kapila did a great service to Indian thought by fixing philosophical ideas by numbers. I found Buddha also did the same. He also fixed his ideas by numbers, Four Noble Truths, Eightfold Path to Arhatship and so on, and Buddha was a follower of Kapila. Mahavira also did the same and I am inclined to think that all the six heretical schools also followed the same method. All the ancient writers of India were, in this matter at least, the disciples of Kapila till Kanada introduced a higher method of philosophizing, namely that of finding Sadharmya and Vaidharma, similarity and dissimilarity, and it took several centuries to rise from enumeration to comparison, Comparison led to classification in which the earlier writers were very deficient.

... ...

The chronology of the original works is very difficult to settle. I now give my own ideas for whatever they are worth. I think that Kapila wrote his sutras, 22 in number, for the benefit, either of Asuri, his brother and disciple, or for an unknown Brahmin in the latter part of the Vedic period, before the *Svetasvataropanisad* or the *Kathopanisad* were composed. That the Enumerative School was adopted by all schools of thought, orthodox Brahmins, Buddhists, Jainas, Ajivakas, Lokayatas and others. As the sutras were perfectly unsectarian, the different schools put their own interpretations on them and made them to serve their own purpose. The Brahmins wrote a comprehensive body of the sutras based on these, not only one body of sutras, but I believe, there were many such bodies of sutras; for, Gaudapada in his commentary quotes a sutra which is not to be found in the *Samkhya-Pravacana,* which consists of 553 sutras, but he says it belonged to the *Sastitantra.* Buddhism and Jainism are simply expansions of Kapila's ideas but it is wonder of wonders that we still get manuscripts of the original sutras of Kapila, though often in a modified and mutilated form.

... ...

I believe that Kapila wrote the 22 sutras, giving the bare outline of his system of primitive philosophy. He wrote before the *Svetasvatara, the Katha Upanisad* and other later Vedic works embodying Samkhya ideas, were composed. His ideas were accepted in the seventh and sixth centuries B.C., a century or two later than the end of the Vedic period by all classes of thinkers. But they modified his system according to their own ideas and carried them to their logical conclusion by discarding Individuality. The Jainas kept to his last conclusion by making 'Kaivalya' or 'individuality' absolute. The orthodox Brahmins on the other hand,

wrote a body of sutras embodying his ideas but incorporating is it such peculiar ideas of their own as the authenticity of the Vedas, efficacy of sacrifices and so on. This body of the sutras is lost. One single sutra only is to be found in Gaudapada's commentary of the Golden Seventy. Mathara wrote a commentary on this body of the sutras and some one perhaps elaborated it into the form of *Sastitantra* or Sixty Topics. Isvarakrsna epitomized *Sastitantra* and followed *Matharabhaasya* in the fifth century, Gaudapada wrote a commentary on the seventy Karikas of Isvarakrsna, but he knew of the existence of the work in the Brahmana form, for he says, in the beginning of his work, that Kapila was the son of Brahma; with him were born jnana, Dharma, Vairagya and Aisvarya; and he imparted his knowledge to a Brahmin of Asurigotra; (So Asuri was not his brother, because Kapila belonged to Gautama gotra which contained many eminent men known in the Vedas). The *Samkhya-Pravacana* was based on the previous literature on the subject but modified by Sankara's ideas for Vijnanabhiksu, the earlier and Sesvara commentator, was a downright follower of Sankara. His disciple, Bhava Ganesa however comments on the 22 sutras and there were many commentaries on the same later on. *(J-B-O-R-S,* Vol. IX, part II, 1923, pp. 151-62).

৫

হীনযান ও মহাযান...

অনেকে জিজ্ঞাসা করেন, হীনযান ও মহাযানে প্রভেদ কী? হীনযান কাহাকে বলে, মহাযানই বা কাহাকে বলে? কেনই বা হীনযানকে 'হীন' বলে, আর মহাযানকে 'মহা' বলে? আগে যাহা যাহা লিখিয়াছি তাহাতে অনেক জায়গায়ই এই তফাত দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। এবার যতদূর পারি পরিষ্কার করিয়া সেই তফাতই দেখাইব।

হীনযান বলিয়া কোনো যান নাই। মহাযানেরা আগেকার বৌদ্ধদের হীনযান বলিত। যেহেতু তাহারা 'মহা', সুতরাং তাহাদের আগেকার যাহারা, তাহারা 'হীন' অর্থাৎ ছোটো। আগে কিন্তু দুটি যান ছিল—১. প্রত্যেকবুদ্ধযান বা প্রত্যেকযান আর ২. শ্রাবকযান। বুদ্ধদেবও প্রত্যেকবুদ্ধযান স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, যখন পৃথিবীতে কোনো বুদ্ধ উপস্থিত নাই, তাঁহার মুখ হইতে ধর্মকথা শুনিবার কোনো সুবিধা নাই, তখনো লোকে আপনার চেষ্টায়, আপনার যত্নে ও আপনার উদ্যমে জন্মজরামরণাদির হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে। হিন্দুদের ঋষিরা এইরূপে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। এইরূপে যাহারা নিজের যত্নে, বুদ্ধের সাহায্য না পাইয়া, উদ্ধার হয়, তাহাদিগকে প্রত্যেকবুদ্ধ বলে; তাহাদের যে যান তাহার নাম প্রত্যেকবুদ্ধযান। এই প্রত্যেকবুদ্ধেরা আপনিই উদ্ধার হইতে পারে, আর-কাহাকেও উদ্ধার করিবার শক্তি ইহাদের নাই।

বুদ্ধের মুখে ধর্মকথা শুনিয়া যাহারা ধর্মজ্ঞান লাভ করে, তাহাদের নাম 'শ্রাবক'। বুদ্ধের পরামর্শ লইয়া অনেক শ্রাবক উদ্ধার হইয়াছেন। তাঁহারা প্রথমে 'শ্রাবক' হন তাহার পর 'ভিক্ষু' হন, বিহারে বাস করেন। অনেক দিন বিহারে থাকিতে থাকিতে 'স্রোতাপন্ন' হন, 'সকৃতাগামী' হন, 'অনাগামী' হন, পরে 'অর্হৎ' হইয়া যান।[১] ইহারাও জন্মজরামরণাদি হইতে অব্যাহতি পান, কিন্তু ইঁহারাও কাহাকেও উদ্ধার করিতে পারেন না। ইঁহাদের যে যান, তাহার নাম 'শ্রাবকযান'। বুদ্ধ নির্বাণ পাইলে তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্য হইতে যাঁহারা ধর্মকথা শোনেন, তাঁহারা পর-পর জন্মে ধার্মিক বৌদ্ধ হইতে পারেন, কিন্তু আবার না যতদিন বুদ্ধদেবের প্রাদুর্ভাব হয়, ততদিন তাঁহাদের মুক্তি পাইবার উপায় নাই। এমনও অনেক জায়গায় শোনা যায় যে, একজন বুদ্ধের শ্রাবক অনেক জন্মের পর আর-একজন বুদ্ধের কাছে উদ্ধার হইলেন।

মহাযানের লোকেরা বলিত 'প্রত্যেক' ও 'শ্রাবক' এই দুই যানই হীন, কারণ ইহারা প্রত্যেকেই অত্যন্ত স্বার্থপর। আপনার উদ্ধার হইলেই হইল, ইহারা জগতের কথা ভাবে না, ইহাদের কাছে যেন জগৎ নাই, তাই মহাযানেরা ইহাদিগকে 'হীন' বলিয়া নিন্দা

করিয়া থাকে। আপনাদিগকে মহাযান বলে, যেহেতু তাহারা আপনার উদ্ধারের জন্য তত ভাবে না, জগৎ উদ্ধারই তাহাদের মহাব্রত। পূর্বেই বলিয়াছি 'অবলোকিতশ্বের'[২] উদ্ধার হন-হন, মহাশূন্যে বিলীন হন-হন, এমন সময়ে জগতের সমস্ত প্রাণী তাঁহাকে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, আপনি নির্বাণ প্রাপ্ত হইলে কে আমাদের উদ্ধার করিবে? তাই শুনিয়া 'অবলোকিতেশ্বর' প্রতিজ্ঞা করিলেন, একটিও প্রাণী যতক্ষণ বদ্ধ থাকিবে, ততক্ষণ আমি নির্বাণে প্রবেশ করিব না। এই যে করুণা, সর্বভূতে দয়া, ইহাই মহাযানকে 'মহা' করিয়া তুলিয়াছে, আর ইহারই তুলনায় অপর দুই যানই হীন হইয়া গিয়াছে।

হীনযান অর্হত্ব পাইলেই খুশি, মহাযান তাহাতে খুশি নয়—তাহারা বুদ্ধত্ব চায়। এ দূয়ে তফাত কী? অর্হৎও নির্বাণ পাইলেন, বুদ্ধও নির্বাণ পাইলেন। উভয়েই জন্মজরামরণের হাত হইতে উদ্ধার পাইলেন। উভয়েরই বোধিজ্ঞান লাভ হইল। তবে ইঁহাদের মধ্যে প্রভেদ কী? অর্হতেরা হীনযান হইলেন, আর বুদ্ধ মহাযান হইলেন কেন? বুদ্ধ যখন বোধগয়ায় অশ্বত্থ গাছের তলায় সম্যক্ সম্বোধি লাভ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ নির্বাণ লাভের জন্য ব্যাকুল হইলেন, সেই সময় ব্রহ্মা ও ইন্দ্র আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, আপনি এখন নির্বাণ লাভ করিলে মগধের গতি কী হইবে? মগধ যে অধর্মের ভারে ডুবিতে বসিয়াছে। তাঁহাদের কথায় বুদ্ধ স্বীকার করিলেন যে, তিনি মগধের উদ্ধারের জন্য বহুকাল বাঁচিয়া থাকিবেন। তাই তিনি কাহারো মতে পঁয়তাল্লিশ, কাহারো মতে একচল্লিশ বৎসর ধর্মপ্রচার করেন ও আশি বৎসর বয়সে নির্বাণ লাভ করেন। তিনি পরের উদ্ধারের জন্য চেষ্টা পাইয়াছিলেন—তাই তিনি 'বুদ্ধ' আর তাঁহার শিষ্যেরা নিজেরাই উদ্ধার হইতেন—তাই তাঁহারা 'অর্হৎ'।

যখন মহাযান প্রচার হইতে লাগিল, তখন শ্রাবকযানেরা বলিল, এ কী? বুদ্ধ তো এ ধর্ম প্রচার করেন নাই, এরূপ ব্যাখ্যাও তিনি করেন নাই। পালিতে তাঁহার যে-সকল উপদেশ আছে, তাহাতেও তো এ-সকল কথা বলে না। এ একটা নূতন মত প্রচার হইতেছে, ইহা বুদ্ধের মত নহে। তখন মহাযানেরা বলিল, বুদ্ধ ঠিকই ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তোমরা বুঝ নাই। বুদ্ধদেব নিজে কী করিয়াছিলেন? তিনি তো মগধের উদ্ধারের জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন। তোমরা তো তাহা কর নাই, সুতরাং তোমরা তাঁহার কথার মর্ম বুঝ নাই। তোমরা বুদ্ধের অক্ষরার্থ গ্রহণ করিয়াছ, তাঁহার কথার সোজাসুজি মানে করিয়া লইয়াছ, তাহার ভাবার্থ গ্রহণ করিতে পার নাই। তাই তিনি পরের উদ্ধারের জন্য যে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহাই তোমরা আপনার উদ্ধারের পথ বলিয়া মনে করিয়া লইয়াছ। ইহাতে শ্রাবকযান উত্তর করিল, বা! তা কি কখনো হয়—'পরার্থে' কি উপদেশ হয়? উপদেশটা 'স্বার্থেই হয়, সেটা 'পরার্থে' গিয়াই দাঁড়ায়। আমি তোমার উদ্ধারের জন্য উপদেশ দিলাম, তুমি উদ্ধার হইলে। আমার এ উপদেশটা কি 'স্বার্থে' উপদেশ হইল? আমি তো তোমায় উদ্ধার করিয়া দিলাম, 'পরার্থে'ই উপদেশ দিলাম। এইরূপে রামের 'স্বার্থ', হরির 'স্বার্থ', শ্যামের 'স্বার্থ' হইতে হইতে সেই 'স্বার্থ'ই তো 'পরার্থ' হইয়া দাঁড়াইল। তবে তুমি আর 'পরার্থ' 'পরার্থ' বলিয়া একটা কী জাঁক করিতেছ? মহাযান বলিলেন, আমরা উহাকে 'পরার্থ' বলিতেছি না। তোমার উপদেশ যদি তোমার শিষ্যের স্বার্থের জন্যই হয়, সেটা 'স্বার্থোপদেশ'ই হইল। তুমি তো আর তোমার

শিষ্যকে পরের উদ্ধারের জন্য উপদেশ দিতেছ না। তুমি সকলকেই উপদেশ দিতেছ, বাপু আপনার আপনার পথ দেখো। তুমি তো আর তাহাকে বলিয়া দিতেছ না, বাপু জগৎ উদ্ধার করো। তুমি সম্বোধি পাইলে বটে, কিন্তু 'অনুত্তরসম্বোধি'[৩] তুমি কী করিয়া পাইলে? যাহার চেয়ে আর বড়ো সম্বোধি নাই, সেই সর্বোচ্চ সম্বোধি তুমি পাইলে কই?

আর-এক কথা—তুমি তো বাপু আপনার লইয়াই ব্যস্ত; তোমার শিষ্যেরাও আপনার লইয়া ব্যস্ত; তাহার শিষ্যেরাও আপন লইয়াই ব্যস্ত। তোমরা তো সকলেই অর্হৎ হইতে চলিলে, তোমাদের ভিতর বুদ্ধ হইবে কে? তোমাদের শ্রাবকযান তো কিছুতেই বুদ্ধ হইবার উপায় হইতে পারে না। কারণ তোমরা চাহ অর্হৎ হইতে; তোমরা বুদ্ধ হইবার উপায় জান না; তোমরা দুগ্ধ খাইতে চাও কিন্তু গোরুর বাঁট চেন না। শুনিয়াছ গোরু দুহিলেই দুধ হয়, তাই শিং ধরিয়া টানিতেছ—তাহাতে দুধ পাইবে কিরূপে? তোমরা 'স্বার্থোপদেশ' দিতেছ, তোমরা 'পরার্থোপদেশ' জান না— কেমন করিয়া বুদ্ধ হইবে? তোমরা মহাযানের মর্ম জান না, তোমরা হীনযানই থাকিবে।

তোমরা অর্হৎ হইতে চাও, 'বোধিসত্ত্ব' কাহাকে বলে তাহা তোমরা জান না। তোমরা জান বুদ্ধ এককালে বোধিসত্ত্ব ছিলেন, আর মৈত্রেয় একজন বোদিসত্ত্ব আছেন, তিনি একদিন বুদ্ধ হইবেন। তোমরা বোধিসত্ত্ব হইতে চাও না। বোধিসত্ত্ব হইতে গেলে, তাহাকে বুদ্ধ কী উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহা তোমরা জান না, পড় না, হয় তো কেয়ারও কর না। কিন্তু বোধিসত্ত্ব হইবার উপদেশও তো বুদ্ধদেব দিয়া গিয়াছেন। কারণ বোধিসত্ত্ব না হইলে তো একেবারে বুদ্ধ হইবার জো নাই। একথা তো তিনিও বলিয়া গিয়াছেন। সে উপদেশের 'আশয়' অতি উচ্চ; অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা অতি উচ্চ; তাহার উপদেশও অতি উচ্চ; তাহার জন্য শিক্ষা অতি উচ্চ; তাহার জন্য সাধনা অতি উচ্চ; তাহার জন্য যে-সকল সামগ্রী আবশ্যক, তাহা অতি দুর্লভ; তাহার জন্য কত জন্ম যে সাধনা করিতে হয়, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তোমাদের কী? তোমাদের আকাঙ্ক্ষা অতি অল্প, উপদেশ সহজ, সাধনা সহজ, সামগ্রী অল্প ও সুলভ। আর কালের কথা বলিতে চাও—তোমরা তো তিন জন্মেই আপনার কার্যসিদ্ধি করিয়া লইতে পার। এই-সকল কারণেই আমরা তোমাদের 'হীন' বলি। এখন বুঝিয়া দেখো দেখি, তোমরা 'হীন' কিনা? আর আমাদের আকাঙ্ক্ষা কত বড়ো, আমরা বুদ্ধ হইব; আমাদের উপদেশ কত বড়ো, আমরা জগৎ উদ্ধার করিবার উপদেশ দিই; আমাদের সাধনা কত উচ্চ, আমরা একাই জগৎ উদ্ধার করিব, এই আমাদের সাধনা; আমাদের সামগ্রী ব্রহ্মাণ্ডময়, আর আমরা যত জন্মই যাউক না, আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি না হইলে কিছুতেই বিরত হইব না। দেখো দেখি, আমাদের যান মহাযান কিনা? দেখো দেখি, তোমাতে আমাতে কত তফাত?

শ্রাবকযান বলিতেছেন—তোমার বুদ্ধবচনের উপর বড়োই আদর দেখিতেছি, কিন্তু বুদ্ধবচন হইতে গেলে 'সূত্রে' তো থাকা চাই, 'বিনয়ে' তো থাকা চাই, 'অভিধর্মে'ও তো থাকা চাই। এই লইয়াই তো 'ত্রিপিটক'।[৪] ত্রিপিটকের বাহিরে তো বুদ্ধবচন নাই। তোমাদের এসব কোথায়? তোমরা তো বলিয়া বেড়াও কোনো ধর্মেরই 'সত্তা' নাই—'স্বভাব' নাই। তোমাদের মতে তো সবই অভাব—সবই শূন্য। এ-সকল বুদ্ধবচন হইল

কিরূপে? তাহার উত্তরে মহাযান বলিতেছেন—কেন আমাদের তো শত শত সূত্র রহিয়াছে। এক প্রজ্ঞাপারমিতাই[৫] তো সকল সূত্রের রাজা, তাহার পর আরো কত সূত্র আছে। বিনয়ের কথা বলিতে চাও—বোধিসত্ত্বের বিনয়—সে অতি বড়ো। বিনয়ের উদ্দেশ্য তো ক্লেশনাশ, সমস্ত বিকল্পই ক্লেশ। এই যা-কিছু চারি দিকে দেখিতে পাইতেছি—সমস্তই 'বিকল্প'। যখন 'পরমার্থ সত্য' জানিতে পারিব, সমস্ত বিকল্প নাশ হইয়া যাইবে। যখন নির্বিকল্প হইয়া যাইব, তখনই আমাদের বিনয়ের চূড়ান্ত হইবে। আমাদের 'বিনয়' ছোটোখাটো কথা লইয়া ব্যস্ত থাকে না; আমাদের বিনয়ের উদারতা ও গভীরতা তোমাদের বিদ্যাবুদ্ধির অতীত। আর অভিধর্মের কথা বলিতেছ—অভিধর্ম তো ধর্ম লইয়া। আমাদের ধর্ম 'অনুত্তরসম্যক্‌সম্বোধি' প্রাপ্তি। সুতরাং আমাদেরও 'সূত্র'ও আছে, 'বিনয়'ও আছে, 'অভিধর্ম'ও আছে।

শ্রাবকযানে সর্বপ্রথম 'ত্রিশরণ' গমন,[৬] তাহার পর 'পঞ্চশীল'গ্রহণ[৭]। এ দুটি জিনিস গৃহস্থরাও করিত, ভিক্ষুরাও করিত। ইহার পর 'অষ্টশীল'গ্রহণ অর্থাৎ ঐ পাঁচের উপর আরো তিন, স্রক্‌চন্দনাদি ত্যাগ, রূঢ়বাক্যপ্রয়োগ ত্যাগ, গীতবাদিত্রাদি ত্যাগ। অর্থাৎ ফুলের মালা গলায় দিবে না, চন্দন ও অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্য মাখিবে না, মোটামুটি বিলাসদ্রব্য সব ত্যাগ করিবে। কাহাকেও রূঢ় কথা কহিবে না, কাহাকেও গালাগালি দিবে না, অর্থাৎ জিহ্বা সংযম করিবে এবং গান বাজনা প্রভৃতি করিয়া সময়ক্ষেপ করিবে না। এই যে তিনটি শীল, ইহা খুব উচ্চ ভক্ত গৃহস্থের জন্য। গৃহস্থ ইহার উপর আর যাইতে পারিবে না। ইহার উপর আর দুটি শীল দিলে দশ শীল হয়। সে দুটি উচ্চাসন-মহাসন-ত্যাগ ও কাঞ্চনত্যাগ অর্থাৎ পয়সা কড়ি হাতে করিবে না। এ দুটি শীল শুধু ভিক্ষুদিগের জন্য, গৃহস্থের ইহাতে অধিকার নাই। এ দশ শীল ছাড়া শ্রাবকযানের আর-একটা বড়ো জিনিস 'পোষধ'ব্রত অর্থাৎ উপোস করা। দুই অষ্টমীতে, দুই চতুর্দশীতে, পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় উপোস করিয়া কেবল ধর্মকথা শুনিবে। সেইদিন গৃহস্থ ও ভিক্ষু সবাই বিহারে আসিয়া ধর্মচর্চা করিবে।

মহাযানে আমরা ত্রিশরণগমনের কথা খুব পাই। শীলরক্ষার কথাও পাই। কিন্তু 'পোষধ'ব্রতের কথা বড়ো একটা পাই না। শীলরক্ষাটা শ্রাবকেরা যত বড়ো বলিয়া মনে করেন, বোধিসত্ত্বেরা তত বড়ো বলিয়া মনে করেন না। তাঁহাদের ধর্ম আর-একরূপ; তাঁহারা 'শরণ'-গমনের পরই কিসে বোধিলাভের জন্য একান্ত আগ্রহ জন্মে, তাহারই চেষ্টা করেন—ইহারই নাম 'চিত্তোৎপাদ' বা 'বোধিচিত্তোৎপাদ'। 'বোধিচিত্তোৎপাদে'র পর আর-দুইটি কথা শুনিতে পাই—'পাপদেশনা' ও 'পুণ্যানুমোদনা', অর্থাৎ পাপ কাহাকে বলে তাহার উপদেশ ও পুণ্যের প্রতি আসক্তি। ইহার পর তাঁদের 'ষট্‌পারমিতা'। পারমিতা শব্দের অর্থ লইয়া বড়ো গোলযোগ আছে; অনেকে ইহার অর্থ করেন 'পারং ইতা' অর্থাৎ যে পারে গিয়াছে অর্থাৎ যে পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু আমার মনে হয়, এরূপ ব্যাখ্যা করিলে ব্যাকরণ থাকে না। 'প্রজ্ঞাপারমিতা' ব্যাকরণদুষ্ট নহে, যেহেতু 'পারমিতা'ও স্ত্রীলিঙ্গ, 'প্রজ্ঞা'ও স্ত্রীলিঙ্গ। কিন্তু 'শীলপারমিতা' কী করিয়া হইবে? 'শীল' ক্লীবলিঙ্গ, 'পারমিতা' স্ত্রীলিঙ্গ। শীলপারমিতা শব্দটি ব্যাকরণদুষ্ট হইল। যদি বলো বৌদ্ধ-পণ্ডিতেরা ব্যাকরণের বন্ধনের মধ্যে যাইতে চাহেন না, তাহা হইলে এ ব্যাখ্যা চলিতে

পারে। কিন্তু আর-এক ব্যাখ্যাও আছে—মিশ্রভাষায় পরমস্য ভাবঃ—'পারম্যং' শব্দটি 'পারমি' হইয়া যায়। বৌদ্ধ-সংস্কৃতেও 'পারমি' শব্দের অনেক প্রয়োগ আছে। তাহার উপর ভাবে 'তা' করিলে, পারমিতা হয়। অর্থ হয়—পরমের ভাব, সর্বোৎকৃষ্টের ভাব। তাহা হইলে দানপারমিতা, শীলপারমিতা, প্রজ্ঞাপারিমতার অর্থ হয়—সর্বোৎকৃষ্ট দানের ভাব, সর্বোৎকৃষ্ট শীলের ভাব ইত্যাদি। ইহাতেও একটু দোষ হয়, উপরি উপরি দু বার ভাব প্রত্যয় হয়—তাহা রীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু এরূপ প্রয়োগ দু-চারটা দেখা যায়। বোধিসত্ত্বগণ শীলরক্ষার জন্য বড়ো ব্যস্ত হইতেন না, অথবা সেটা তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধই হইয়া যাইত। তাঁহারা শীলের চরম উৎকর্ষ লাভ করিবার চেষ্টা করিতেন। এই জায়গায় মহাযান ও হীনযানে বড়োই তফাত দেখা যায়। হীনযানে 'বিরত' হইবার জন্য প্রতিজ্ঞা হইত, "আমি প্রাণাতিপাত হইতে বিরত হইব, মিথ্যা কথা হইতে বিরত হইব।" বোধিসত্ত্বেরা যেন আপনা আপনিই তাহাতে বিরত ছিলেন—তাঁহারা সেই শীলের কিরূপে চরম উৎকর্ষ লাভ করিতে পারা যায় তাহারই চেষ্টা করিতেন। হীনযানের শিক্ষা নিষেধ-মুখে, মহাযানের উপদেশ বিধিমুখে। হীনযানের যেন জীবনীশক্তি কম, নাই বলিলেই যেন হয়। এটা করিও না, ওটা করিও না—চুপ করিয়া থাকো। মহাযানের এই জীবনীশক্তি বড়ো বেশি। তাঁহাদের একটি পারমিতার নামই 'বীর্য', অর্থাৎ বীরত্ব অর্থাৎ উৎসাহ। শীলরক্ষা করিয়া যাইব, ক্রমে এমন হইয়া উঠিবে যে, আমি শীলরক্ষায় সকলের উপর উঠিব এবং অন্যে যাহাতে শীলরক্ষা করিতে বা জিতেন্দ্রিয় হইতে পারে, তাহার উপায় করিয়া দিব। হীনযানে 'বীর্য' শব্দটিই নাই। মহাযানে উহা একটি পারমিতার মধ্যে। শুধু সামান্য উৎসাহ নহে; এমন উৎসাহ যে উহা হইতে আর বেশি কল্পনা করা যায় না।

শ্রাবকযানে চারিটি ধ্যানের কথা খুব শুনা যায়। চারিটি ধ্যানের নাম পাওয়া যায় না। একটিতে বিতর্ক থাকে, আর-একটিতে থাকে না। একটিতে প্রীতি থাকে আর-একটিতে থাকে না। একটিতে সুখ থাকে আর-একটিতে থাকে না। যাহাতে সুখও থাকে না সেইটিই চরম ধ্যান। তাহার পর ভিক্ষু ক্রমে 'স্রোতাপন্ন', 'সকৃতাগামী' ও 'অনাগামী' হইয়া পরে অর্হৎ হন। মহাযানে ধ্যানের কথা আছে, এ চারিটি ধ্যানের কথাও আছে, কিন্তু ইহা ছাড়াও অসংখ্য ধ্যান ও সমাধির কথাও আছে। ধ্যান ও সমাধি লইয়া তাঁহাদের অনেক পুস্তক আছে। স্রোতাপন্ন, সকৃতাগামী, অনাগামী ও অর্হৎ এ-সকল শব্দ মহাযানে পাওয়া যায় না। ইহার বদলে পাওয়া যায় 'দশ বোধিসত্ত্ব ভূমি'[৮] অর্থাৎ বোধিসত্ত্ব যেমন ধ্যান, ধারণা, দান, শীল, ক্ষান্তি ইত্যাদিতে ক্রমে দক্ষ হইতে থাকেন, তাঁহার মনোবৃত্তি সকলও সেইরূপ ক্রমে উচ্চে উঠিতে থাকে। মানুষের মনোবৃত্তি অনন্ত। প্রথম ভূমিতে কতকগুলি থাকে, কতকগুলি ত্যাগ করা হয় এবং কতকগুলি প্রবল হইয়া উঠে। দ্বিতীয় ভূমিতে আবার কতকগুলি আসে, প্রথমের কতকগুলি, হয় একেবারে চলিয়া যায়, নয় তো হীনবীর্য হইয়া পড়ে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে বোধিসত্ত্ব দশটি ভূমি অতিক্রম করিলে তবে তিনি নির্বাণপথের যথার্থ পথিক হইতে পারেন। যে করুণার নাম পর্যন্ত শ্রাবকযানে দেখা যায় না, সেটি বোধিসত্ত্বের চিরসহচর, যতই উচ্চ ভূমিতে উঠিবেন ততই করুণা প্রবল হইতে থাকিবে।

পাঁচটি পারমিতায় দক্ষতালাভ করিলে তাহার পর 'প্রজ্ঞাপারমিতা'। 'প্রজ্ঞাপারমিতা'ই আসল পারমিতা। একজন গ্রন্থকার বলিয়াছেন, প্রজ্ঞাপারমিতা ছাড়িয়া দিলে অন্যান্য পারমিতা-সকল পারমিতা নামই লাভ করিতে পারে না। কিন্তু শুধু প্রজ্ঞাপারমিতাও ঠিক নহে। অপর পাঁচের সহিত প্রজ্ঞাপারমিতা মিলিত হইলে পূর্ণ পারমিতা হয়। প্রজ্ঞাপারমিতার মোট কথা এই যে, সত্য দুই প্রকার—সাংবৃত সত্য ও পরমার্থ সত্য। সাংবৃত সত্য—ব্যবহারিক সত্য। আমরা চারি দিকে যে-সকল জিনিস দেখিতে পাই সেগুলিকে সত্য বলিয়া ধরিয়া না লইলে ব্যবহার চলে না; তাই সেগুলিকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। কিন্তু বিশেষ রূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাই যে, তাহার একটিও সত্য নহে। পরমার্থ সত্য কখনোই অন্যথা হয় না, সে চিরকালই সত্য থাকে, সেটিকে মহাযানেরা শূন্য বলেন।

হীনযান ত্রিশরণগমনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। মহাযানেরও ত্রিশরণগমনের ব্যবস্থা আছে। ত্রিশরণগমনের মন্ত্র দুই যানেই এক, তবে মহাযানে ত্রিরত্ন, বুদ্ধ ধর্ম ও সংঘ নহে, ধর্ম বুদ্ধ ও সংঘ। বুদ্ধকে প্রথম স্থান হইতে নামাইয়া দ্বিতীয় স্থানে দিবার অর্থ এই যে, মহাযান বুদ্ধ হইতে ধর্মকে প্রধান বলিয়া মনে করেন। মহাযানে শাক্যমুনির অবস্থা একটু শোচনীয়—তিনি একটি 'মানুষী'বুদ্ধ। মানুষীবুদ্ধদের মধ্যেও তাঁহার স্থান সাতের দাগে।[৯] এখনকার মহাযানেরা বলেন যে, হিন্দুদের ব্যাস যেমন সব জিনিস কলমবন্দি করিয়া গিয়াছেন, আমাদের শাক্যসিংহও তেমনি মাত্র কলমবন্দি করিয়া গিয়াছেন। আমাদের মত, আমাদের ধর্ম আদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। যাঁহারা মত চালাইয়াছেন, তাঁহারা 'ধ্যানীবুদ্ধ'[১০]। 'অমিতাভ' একজন 'ধ্যানীবুদ্ধ'। মহাযানে তাঁহার প্রভাব খুব অধিক। জাপানে তাঁহার খুব উপাসনা হয়। বৈরোচন আর-একজন বড়ো 'ধ্যানীবুদ্ধ'। ক্রমে মহাযানেরা শেষ অবস্থায় পাঁচ জন ধ্যানীবুদ্ধ মানিত। নেপালের স্বয়ম্ভূক্ষেত্রে স্বয়ম্ভূচৈত্যের চারি দিকে এই পাঁচ জন ধ্যানীবুদ্ধের মন্দির আছে। সেখানে শাক্যসিংহের স্থান নাই দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তিনি কোথায়?" আমার সঙ্গে যে বজ্রাচার্য ছিলেন তিনি আমাকে চৈত্য হইতে কিছু দূরে লইয়া গিয়া, পূর্বে নিচু হইতে পাহাড়ে উঠিবার যে পথ ছিল, তাহারই উপরে শাক্যসিংহের প্রতিমা দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, "তিনি এইখানে আছেন, তিনি পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের একপ্রকার দ্বারপাল। আমরা তাঁহাকে মানি, যেহেতু তিনি আমাদের সব জিনিস কলমবন্দি করিয়া দিয়াছেন।"

বুদ্ধ অপেক্ষা ধর্ম মহাযানে বড়ো। স্তূপ বা চৈত্যই ধর্ম। সেই চৈত্যের গায়ে পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের মন্দির, সুতরাং ধর্মের সঙ্গে বুদ্ধের কী সম্পর্ক তাহা এইখানেই বুঝা গেল। নেপালের মহাযানদিগের মধ্যে সংঘ বলিতে গেলে এক বিহারে যতগুলি ভিক্ষু থাকে তাহাদিগকে বুঝায়; কিন্তু উহারা বলে সংঘ ক্রমে বোধিসত্ত্বে পরিণত হইয়াছে।

পূর্বে যাহা ধর্ম বুদ্ধ ও সংঘ ছিল, মহাযান খুব বাড়িয়া উঠিলে তাহাই হইল প্রজ্ঞা উপায় ও বোধিসত্ত্ব। ধর্ম হইলেন প্রজ্ঞা, একথা বুঝানো কঠিন নহে। কারণ বৌদ্ধেরা, বিশেষ মহাযানেরা, ঘোর জ্ঞানবাদী। তাহারা ভাবে জ্ঞানই মুক্তি। ধর্ম যদি জ্ঞান হইলেন, তবে বুদ্ধ কী হইলেন? তিনি হইলেন—উপায়। তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া, তাঁহার উপদেশ লইয়া, বাস্তবিক তাঁহাকে উপায় করিয়া, আমরা জ্ঞান পাইতে পারি। প্রজ্ঞা ও উপায় যখন ধর্ম ও

বুদ্ধের স্থান অধিকার করিলেন, তখন বিহারবাসী ভিক্ষুরা তো আর সংঘ হইতে পারেন না, তখন সংঘ আর-একটা কিছু উঁচু জিনিস হওয়া চাই। তখন সংঘ হইলেন—বোধিসত্ত্ব।

এইরূপে আমরা হীনযান ও মহাযান যতই তুলনা করি, ততই দেখিতে পাই, ততই আমাদের মনে হয়, যে হীনযান ধর্মনীতি ও সমাজনীতি লইয়া ব্যস্ত, আর মহাযান দার্শনিক মত লইয়া ব্যস্ত ও পারমিতা লইয়া ব্যস্ত। স্বভাবচরিত্র বিশুদ্ধ হইলে, মানুষ পৃথিবীর বস্তু ছাড়িয়া কোনো উচ্চতর বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করিলে নিশ্চয়ই বড়ো হয়। হীনযান মানুষকে সেইরূপ বড়ো করিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু মহাযান তাহাতে তৃপ্ত হইতেন না। তাঁহারা মানুষকে সর্বময় সর্বনিয়ন্তা করিবার চেষ্টা করিতেন। দর্শনে তাঁহারা শূন্যবাদী, নীতিতে তাঁহারা করুণাবাদী। তাই তাঁহারা আপনাদিগকে বড়ো বা 'মহা' মনে করিতেন ও শ্রাবক ও প্রত্যেকযানকে 'হীন' বা ছোটো মনে করিতেন।

'নারায়ণ'
আষাঢ়, ১৩২২ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. এই বইয়ের পৃ. ৩০ (প্রাসঙ্গিক তথ্য), সূত্র ৪ দ্র.

২. এই বইয়ের পৃ. ১৮ (প্রাসঙ্গিক তথ্য), সূত্র ১৬ দ্র.

৩. সম্বোধি, সম্যক্ বোধি। সম্যক্ জ্ঞান। দুঃখ উৎপত্তির কারণ এবং দুঃখ নিরোধের উপায় জানাই বোধি। বোধি লাভের পর বুদ্ধদেব এই উদান গেয়েছিলেন—

অনেকজাতিসংসারং সংধাবিস্‌সং অনিব্বসং।
গৃহকারকং গবেসন্তো দুক্‌খা জাতি পুনপ্পুনং ॥
গহকারক দিট্‌ঠোসি পুন গেহং ন কাহসি।
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্‌গা গহকূটং বিসংখিতং।
বিসংখারগতং চিত্তং তণ্‌হানং খয়মজ্‌ঝগা ॥

অনুবাদ : জন্মজন্মান্তর-পথে ফিরিয়াছি, পাইনি সন্ধান
সে কোথা গোপনে আছে, এ গৃহে যে করেছে নির্মাণ।
পুনঃপুনঃ দুঃখ পেয়ে দেখা তব পেয়েছি এবার,
হে গৃহকারক, গৃহ না পারিবি রচিবারে আর;
ভেঙেছে তোমার স্তম্ভ, চুরমার গৃহভিত্তিচয়,—
সংস্কারবিগত চিত্ত, তৃষ্ণা আজি পাইয়াছে ক্ষয় ॥

(সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

গৃহ= দেহ; গৃহকারক = তৃষ্ণা; সংসার = বারবার জন্মগ্রহণ;
সংস্কার= প্রবৃত্তি; বিসংস্কারগত = প্রবৃত্তিহীন।

প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্রে বুদ্ধদেবের বোধি এবং অন্যদের বোধির মধ্যে কোনো প্রভেদ দেখানো হয় নি। সব্বাসবক্‌খয়-ঞাণ, সর্বাস্রবক্ষয় জ্ঞান বা সব দুঃখ-ক্লেশ ক্ষয়ের জ্ঞান যিনিই

অর্জন করেন তিনিই অর্হৎ। বুদ্ধদেব প্রথম অর্হৎ। তিনি প্রথম সম্বোধি লাভ করেছিলেন। কিন্তু কালক্রমে বুদ্ধদেব এবং অন্য অর্হৎদের মধ্যে গুণগত প্রভেদ দেখানো শুরু হয়। মহাযান মতে বোধিসত্ত্ব ধারণা বিকাশের ধারায় আধ্যাত্মিক অগ্রগতির তিনটি পৃথক স্তর নির্দিষ্ট হয়েছে। ১. অনুত্তর-সম্যক্-সম্বোধি (অনুত্তর অর্থ যার উত্তর বা পর আর কিছু নেই, সর্বোৎকৃষ্ট); ২. প্রত্যেকবোধি; ৩. শ্রাবক-বোধি। মহাযানে অনুত্তর-সমাক্-সম্বোধি শ্রেষ্ঠ, কারণ, অনুত্তর-সম্যক্-সম্বোধির অধিকারী অপরের মুক্তির দায়িত্ব মানেন, অপরকে মুক্তিলাভে সহায়তা করেন। প্রত্যেক-বোধি ও শ্রাবকবোধি শুধুই ব্যক্তিগত মুক্তির জ্ঞান। দ্র. প্রবোধচন্দ্র সেন, 'ধম্মপদ-পরিচয়', বিশ্বভারতী ১৩৬০, পৃ. ৫৮-৫৯।

৪. পিটক অর্থ ভাণ্ড বা ঝুড়ি। বৌদ্ধ পারিভাষিক অর্থ 'পর্যাপ্তিভাজন' বা গ্রন্থাধার। সুত্ত, বিনয় ও অভিধম্ম নিয়ে ত্রিপিটক। ত্রিপিট শব্দে গ্রন্থসমূহ এবং গ্রন্থনিবদ্ধ বিষয় দুই-ই বোঝায়। তিন মূল গ্রন্থাধার অর্থে ত্রিপিটক শব্দের প্রথম ব্যবহার পাওয়া যায় চুল্‌ল বগ্‌গের একটি গাথায়।

আনন্দকে বুদ্ধদেব বলেছিলেন, তোমাদের এমন মনে হতে পারে, শাস্তার প্রবচন বা প্রকৃষ্ট বাণী অতীত হয়ে গেছে, অতএব আমাদের আর শাস্তা নাই। কিন্তু, বিষয়টি এভাবে দেখলে চলবে না। কেননা আমার দ্বারা উপদিষ্ট ও প্রজ্ঞাত ধর্ম ও বিনয়ই আমার অবর্তমানে তোমাদের শাস্তা হবে। বুদ্ধদেবের উক্তি বলে মানা হয় এমন আরো অনেক বিবরণে ধর্ম ও বিনয় কথা দুটি পাওয়া যায়। শব্দ দুটি বুদ্ধের শাসন বা শিক্ষা পদ্ধতি বোঝায়, ক্রমে সেই শিক্ষা সূত্রবদ্ধ যে হয়ে উঠছিল এমন ইঙ্গিতও পাওয়া যায়। যেমন ভোগ নগরে বুদ্ধদেব ভিক্ষুদের উদ্দেশে বলেছিলেন, কোনো ভিক্ষু যদি এসে এমন বলেন যে, এসব কথা স্বয়ং বুদ্ধদেবের মুখ থেকে শুনেছি তাহলে আগ্রহ বা বিরক্তি প্রকাশ না করে তাঁর কথা সূত্র ও বিনয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা উচিত হবে। মিললে ভগবানের বচন বলে মানবে, না মিললে অগ্রাহ্য করবে। ('দীর্ঘ নিকায়' মহাপরিনির্বাণ সূত্রান্ত)। এই উক্তি থেকে মনে হয় বুদ্ধদেব বর্তমান থাকতেই সূত্র ও বিনয় সুসংবদ্ধ হয়ে উঠছিল।

বুদ্ধ-পরিনির্বাণের চতুর্থ মাসে রাজগৃহে বৈভার পাহাড়ের সপ্তপর্ণী গুহায় প্রথম সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান উদ্যোগী মহাকাশ্যপের আহ্বানে ৫০০ অথবা ৫০১ জন ভিক্ষু সমবেত হন। সভাপতি রূপে মহাকাশ্যপ উপালিকে বিনয়-বিষয়ে প্রশ্ন করেন, উপালি যে উত্তর দেন সেইগুলি 'বিনয়-পিটকে' সংকলিত হয়। 'বিনয়-পিটকে'র তিন ভাগ : ১. সুত্তবিভঙ্গ, যার প্রধান অঙ্গ পাটিমোক্‌খ বা প্রাতিমোক্ষ, ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য ২২৭টি অনুশাসন; ২. খন্দক, খন্দকের দুই ভাগ—মহাবগ্‌গ ও চুল্‌লবগ্‌গ; মহাবগ্‌গে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের বিনয় সম্পর্কিত প্রধান বিষয়ের এবং চুল্‌লবগ্‌গে গৌণ বিষয়ের বর্ণনা; ৩. পরিবার পাঠ, বিনয় সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর, সূচি, পরিশিষ্ট ইত্যাদি।

মহাকাশ্যপ আনন্দকে ধর্ম বিষয়ে প্রশ্ন করেন, আনন্দের উত্তরগুলি সংকলিত হয় 'সুত্তপিটক' বা 'সূত্রপিটকে'। 'সুত্তপিটকে'র পাঁচ ভাগ : ১. দীঘ নিকায় বা দীর্ঘ নিকায়, ২. মজ্‌ঝিম নিকায় বা মধ্যম নিকায়, ৩. সংযুক্ত নিকায় বা সংযুক্ত নিকায়, ৪. অঙ্গুত্তর নিকায়, ৫. খুদ্‌দক নিকায় বা ক্ষুদ্রক নিকায়।

ত্রিপিটকের তৃতীয় অংশ 'অভিধম্মপিটক' মূলত 'সুত্তপিটক' অনুসরণে রচিত; ধর্ম বিষয়ে উপদেশ উপমায়, রূপকে, উপাখ্যানে বিস্তারিতভাবে 'সুত্তপিটকে' বিবৃত হয়েছিল। 'অভিধম্মে' মূল বক্তব্য সংহত ও নৈর্ব্যক্তিকভাবে এবং পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করে

সাজানো হয়েছে। সম্ভবত প্রাচীন বৌদ্ধদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর পৃথক পৃথক 'অভিধম্ম' ছিল। কিন্তু শুধু চীনা ও তিব্বতি অনুবাদে সর্বাস্তিবাদীদের এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার থেরবাদীদের মূল 'অভিধম্ম' পাওয়া গেছে। থেরবাদীরা মনে করেন, বৌদ্ধদর্শনের শ্রেয়তম অংশ 'অভিধর্ম্মপিটকে' সংকলিত আছে। প্রকৃতপক্ষে 'অভিধম্মে' সুশৃঙ্খল ধারাবাহিক দার্শনিক আলোচনা নেই। পারমার্থিক ও নৈতিক উপদেশই প্রধান বিষয়। 'অভিধম্মপিটক' বা অভিধর্মপিটকের অন্তর্গত গ্রন্থ সাত খানি : ১. 'ধম্মসংগণি', ২. 'বিভঙ্গ', ৩. 'কথাবত্থু' বা কথাবস্তু, ৪. 'পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তি' বা পুদ্গল প্রশস্তি, ৫. 'ধাতুকথা', ৬. 'যমক', ৭. 'পঠ্‌টান' বা প্রস্থান।

৫. এই বইয়ের পৃ. ১৯ (প্রাসঙ্গিক তথ্য), সূত্র ১৭ দ্র.

৬. বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের আশ্রয় নিচ্ছি—তিনবার এই সংকল্প উচ্চারণ করাকে ত্রিশরণ গ্রহণ করা হয়। বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি, ধম্মং সরণং গচ্ছামি, সংঘং সরণং গচ্ছামি—বৌদ্ধধর্মের মূল মন্ত্র। বুদ্ধত্ব লাভের পর বুদ্ধদেব বারাণসীর কাছে মৃগদাবে (সারনাথ) প্রথম ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন। এখানে বুদ্ধদেবের উপদেশ শুনে ৬১ জন অর্হৎ পদ লাভ করেন। বুদ্ধদেব স্থির করলেন এই অর্হতেরা বিভিন্ন দেশে গিয়ে তাঁর ধর্ম প্রচার করবেন। ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব দিয়ে এঁদের উদ্দেশে যে নির্দেশ দিলেন সেখানেই ত্রিশরণের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়।

৭. এই বইয়ের পৃ. ৫৪-৫৫ (প্রাসঙ্গিক তথ্য) সূত্র ২২ দ্র.

৮. প্রথম 'ভূমি' বা দশার নাম 'দুরারোহা', দ্বিতীয় 'বর্ধমানা', তৃতীয় 'পুষ্পমিণ্ডতা', চতুর্থ 'রুচিরা', পঞ্চম 'চিত্তবিস্তরা', ষষ্ঠ 'রূপবর্তী', সপ্তম 'দুর্জয়া', অষ্টম 'জন্মনিদেশ', নবম 'যৌবরাজ্য', দশম 'অভিষেক'। বোধিসত্ত্বদের ভূমিসমূহ অপরিমেয়, অনেক ও অনন্ত কল্প ব্যাপ্ত। সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞায় বোধিসত্ত্বদের সব সংসার বা প্রত্যেক জন্মকেই ভূমি বা পৃথিবীতুল্য বলে কল্পনা করা হয়। সেইজন্য এর নাম 'ভূমি'। প্রথম ভূমিতে স্থিত বোধিসত্ত্বের আচরণবিধি আটটি : ১. ত্যাগ বা দানশীলতা. ২. করুণা, ৩. অপরিখেদ, ৪. অমান বা অভিমানের অভাব, নম্রতা, ৫. সবশাস্ত্রের অধ্যয়ন, ৬. বিক্রম, ৭. লোকের অনুজ্ঞা বা অনুমতি গ্রহণ, ৮. ধৃতি অর্থাৎ ধৈর্য। ক্রমে নবম ভূমি অতিক্রম করে বোধিসত্ত্ব দশম ভূমিতে উত্তীর্ণ ও পূর্ণসম্পাদন করে মানব জন্ম আকাঙ্ক্ষা করেন এবং অপুনরাবর্তনের জন্য অর্থাৎ এই-ই শেষ জন্ম জেনে মাতৃগর্ভে অবতীর্ণ হন। (মহাবস্তু অবদান)

৯. 'দীঘ নিকায়'-এর মহাপদান সূত্রান্তে শ্রাবস্তীর জেতবন আরামের করেরি-কুটিরে সমবেত ভিক্ষুদের উদ্দেশে বুদ্ধদেবের মুখে বুদ্ধদেবের আগে আবির্ভূত আরো ছয় জন বুদ্ধের উল্লেখ এবং বিস্তৃত পরিচয় বর্ণনা করা হয়েছে। ভিক্ষুদের উদ্দেশে বুদ্ধদেব বলছেন, এখন থেকে আগের একানব্বই কল্পে বিপস্‌সী, (বিপশ্যী) একত্রিশ কল্পে শিখী ও বেস্‌সভূ (বিশ্বভূ) এবং বর্তমান কল্পে ককুসন্ধ (ক্রকুচ্ছন্দ), কোণাগমন ও কস্‌সপ (কশ্যপ) এই ছয় জন বুদ্ধ আবির্ভূত হয়েছিলেন। বুদ্ধদেব এবং পূর্বগামী ছয় বুদ্ধকে নিয়ে সাত জন মানুষীবুদ্ধের কল্পনা বৌদ্ধশাস্ত্রে প্রচলিত। এঁদের মধ্যে ককুসন্ধ ও কোণাগমন ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মান, অন্য পাঁচ জন ক্ষত্রিয় সন্তান। বুদ্ধদেব প্রচারিত বৌদ্ধধর্মের প্রাচীনতর ঐতিহ্য প্রতিপন্ন করাই পূর্বগামী বুদ্ধদের অস্তিত্ব কল্পনার কারণ। সাত মানুষীবুদ্ধের শক্তি যথাক্রমে বিপশ্যন্তী, শিখিমালিনী, বিশ্বধরা, ককুদ্বতী, কণ্ঠমালিনী, মহীধরা ও যেশোধরা এবং এঁদের বোধিসত্ত্ব যথাক্রমে মহামতি, রত্নধর, আকাশগঞ্জ, শকমঙ্গল, কনকরাজ, ধর্মধর এবং আনন্দ।

১০. বৈরোচন, রত্নসম্ভব, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধি ও অক্ষোভ্য—এই পাঁচ জন ধ্যানীবুদ্ধ পঞ্চ স্কন্ধের অধিষ্ঠাতা। ধ্যানীবুদ্ধ থেকে বুদ্ধ শক্তির উৎপত্তি এবং বুদ্ধ শক্তি থেকে বোধিসত্ত্বদের উৎপত্তি। পাঁচ ধ্যানীবুদ্ধের শক্তি যথাক্রমে লোচনা বা রোচনা, বজ্রধাত্বীশ্বরী, পাণ্ডরা, তারা ও মামকী। বোদিসত্ত্বেরা কোনো-না-কোনো ধ্যানীবুদ্ধ-কুলের অন্তর্গত। বোধিসত্ত্ব মূর্তির মাথার উপরে কুল-জ্ঞাপক ধ্যানীবুদ্ধের একটি ছোটো মূর্তি দেওয়া হত। বৌদ্ধ মতে রূপ; বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পাঁচটি উপাদান পুঞ্জ বা স্কন্ধের সমবায়ে পুঙ্গল বা ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়। ধ্যানীবুদ্ধ কল্পনার ভিত্তি এই পঞ্চস্কন্ধ। ধ্যানীবুদ্ধ কল্পনার উদ্ভব প্রসঙ্গে শাস্ত্রীমশায় লিখেছেন—

"So Buddha taught that man is simply an aggregate of five Skandhas or bunches; (i) Rupa, matter; (ii) Vedana, feeling; (iii) Samjna, conception; (iv) Samskara, activity and (v) Vijnana, consciousness. They come together by force of their previous *karma* and form a human being. At death the five separate and go their own way as directed by their *karma*. So there is no Atma or soul. The five Skandhas enjoy or suffer according to their *karma*....

"After the full development of the Mahayanic ideas of Tri-Kaya [**ধর্মকায়, সম্ভোগকায়, নির্মাণকায়**], of Prajna, of Karuna, and of others there was in the seventh century A.D. a craving among the Buddhists for the representation of these subjective, etherial and metaphysical ideas on canvas and in stones for the edification of those who are not fit for such a hard study as the Mahayana required, and so the five Skandhas were represented as the five Dhyani Buddhas. The phrase Dhyani Buddha is a misnomer given to those representations by people who did not understand their import. They were neither Buddhas nor were engaged in *Dhyana* or meditation. They are simply the representations of the absolute form of the five Skandhas." *ADVAYAVAJRASAMGRAHA,* G-O-S, No. XL, 1927, Introduction pp. xxvii-xxviii.

জাপানে অমিতাভ নামটির সংক্ষেপিত রূপান্তর অমিদ। ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে জাপানে বৌদ্ধধর্ম গৃহীত হয়। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যকালে প্রথম অমিদ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তার পর থেকে ক্রমে সমগ্র জাপানে অমিদর উপাসনা প্রচলিত হয়।

৬

মহাযান কোথা হইতে আসিল?

অনেকেই মনে করেন যে, নাগার্জুনই[১] মহাযান মত চালাইয়া দেন। তাঁহার 'মাধ্যমকবৃত্তি' মহাযানের প্রথম গ্রন্থ। তিনিই পাতাল হইতে 'প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র' উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাঁহারই শিষ্য আর্যদেব[২] এই মত চারি দিকে ছড়াইয়া দিয়াছিলেন। চীনেরা বলে, "আর্যদেব অধ্যাত্মবিদ্যার চূড়ান্ত করিয়া গিয়াছেন।" এই দুই জনই মহাযানের আদিগুরু। কিন্তু বিশেষ করিয়া দেখিলে বোধ হইবে নাগার্জুনের পূর্ব হইতেই মহাযান মত চলিতেছিল। নাগার্জুনের দুই পুরুষ পূর্বে অশ্বঘোষ[৩] 'মহাযানশ্রদ্ধোৎপাদসূত্র' নামে এক পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' ও 'সৌন্দরানন্দ' মহাযান মতে ভরপুর। 'শ্রদ্ধোৎপাদসূত্র' তর্জমা করিতে করিতে জাপানি পণ্ডিত সুজুকি[৪] বলিয়াছেন অশ্বঘোষেরও পূর্বে মহাযান মত চলিত। 'লঙ্কাবতার' প্রভৃতি তিনখানি মহাযানসূত্র অশ্বঘোষের পূর্বেও চলিত ছিল; সুতরাং মহাযানের আদি ঠিক বলিয়া উঠা কঠিন। বৌদ্ধেরা বলে বুদ্ধদেবের মৃত্যুর প্রায় একশত বৎসর পরে বৌদ্ধ সংঘের মধ্যে ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হয়। স্থবিরেরা বুদ্ধদেব যেরূপ বিনয়ের বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা হইতে একচুল তফাত হইতে চাহিত না, কিন্তু যাহাদের বয়স অল্প, তাহারা অনেক বিষয়ে স্থবিরদিগের মতে চলিত না। বুদ্ধদেবের কঠিন শাসন ছিল। বারোটার পর কেহ আহার করিবে না। তাহারা বলিত এক-আধ ঘণ্টা পরে খাইলে দোষ কী? বুদ্ধদেব ভিক্ষুদিগকে কিছুই সঞ্চয় করিতে দিতেন না। তাহারা বলিত শিংয়ের ভিতর যদি একটু লুন সঞ্চয় করিয়া রাখা হয়, তাহাতে কী দোষ হইতে পারে। এইরূপে দশটি বিষয় লইয়া স্থবিরদিগের সহিত তাহাদের মতের অনৈক্য হয়। এইরূপ অনৈক্য হওয়াতে যাঁহারা বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তাঁহারা একটি সভা করিয়া এ-সকল বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে চান। বৈশালীতে এক মহাসভা হয়। এই সভায় কিছুই মীমাংসা হইল না, কিন্তু অধিকাংশ বৌদ্ধ স্থবিরের দল হইতে পৃথক হইয়া পড়িল। বৌদ্ধদিগের মধ্যে দুই দল হইল, স্থবিরবাদ বা থেরাবাদ ও মহাসাংঘিক।[৫] একে তো মহাসাংঘিকদিগের দলে লোক অধিক ছিল, তার পর আবার তাহাদের বয়স অল্প, উহারা মহা-উৎসাহে আপনাদের মত প্রচার করিতে লাগিল। উহারা প্রথম হইতেই লোকোত্তরবাদী হইল। অর্থাৎ বুদ্ধদেব সামান্য মানুষ ছিলেন না, তিনি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, তিনি নির্বাণ প্রাপ্ত হইলেও জগৎব্যাপ্ত হইয়া আছেন, যখন তাঁহার মত চলিতেছে, যখন তাঁহার মতে লক্ষ লক্ষ লোক পৃথিবীতে আপনার জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছে, আপনাদিগের আচার-ব্যবহার স্থির করিয়া লইতেছে, তখন তিনি শুধু মরিলে কী হইল? তাঁহার একটা অলৌকিক অনির্বচনীয়

অস্তিত্ব আছেই। লোকোত্তরবাদীরা যতই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দার্শনিক মত বাহির করিতে লাগিল, স্থবিরবাদীরা ততই বিনয় সম্বন্ধে বেশি কড়া হইতে লাগিল। দুই দলে যে আর-কখনো মিল হইবে, তাহার আর সম্ভাবনা রহিল না। অশোকরাজার সময়ে পাটলিপুত্রে যে মহাসভা হয়, তাহাতে মহাসাংঘিকেরা কেহই স্থান পায় নাই।[৬] সকল বৌদ্ধেরা সে সভাকে সভা বলিতেই প্রস্তুত নহে। মহাসাংঘকি ও মহাযানদিগের মতে সে সভার কোনো অস্তিত্বই নাই। অশোকরাজা স্থবিরবাদীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, সুতরাং তাঁহার সময়ে এই মতই অনেক স্থানে চলিয়া গিয়াছিল। তিনি সিংহলে বৌদ্ধধর্মের অধিক পরিমাণে প্রচার করেন, সুতরাং সিংহলে স্থবিরবাদ চলিয়া যায় ও এখনো চলিতেছে। মগধ ও বাংলায় এই মতেরই লোক অধিক ছিল, কিন্তু ভারতবর্ষের মধ্যভাগে অযোধ্যা, মথুরা প্রভৃতি স্থানে এবং পঞ্জাবে মহাসাংঘিকেরাই প্রবল হইয়া উঠে। ক্রমে এই দুই দলই নানা শাখায় ভাগ হইয়া যায়। স্থবিরবাদের প্রধানত দুই শাখা হয়—'মহীশাসক' ও 'বজ্জিপুত্তক'। মহীশাসকেরা আবার দুই ভাগ হয়—'সর্বত্থবাদী' ও 'ধর্মগুপ্তিক'। সর্বত্থবাদ ক্রমে 'কশ্যপীয়', 'সংকান্তিক' ও 'সুত্তবাদ' হইয়া যায়। 'বজ্জিপুত্তক'দের চারি শাখা হয়—'ধম্মত্থানীয়', 'ছন্দাগারিক', 'ভদ্দজানিক' ও 'সম্মতীয়'।

মহাসাংঘিকদিগের দুই দল হয়—'গোকুলিক' ও 'একব্যোহারিক'। গোকুলিকদিগের আবার তিন শাখা হয়—'পণ্ণত্থিবাদ', 'বাহুলিক' ও 'চেতিয়বাদ'। এতদ্ভিন্ন দেশভেদেও অনেকগুলি শাখা হয়—'হেমবন্ত', 'রাজগিরীয়', 'সিদ্ধত্থক', 'পূর্বশেলিয়', 'অপরশেলিয়', 'বাজিরীয়'। কিন্তু কী লইয়া যে এই-সকল শাখাভেদ হয় তাহা আমরা এখনো জানিতে পারি নাই।

এই-সকল ভিন্ন শাখার মধ্যেও পরস্পর বিবাদ বিসংবাদ ছিল। বিবাদ বিসংবাদ হইলেই লোকে দুর্বল হইয়া পড়ে। এইরূপ দুর্বল অবস্থাতেই সামবেদী সুঙ্গগোত্রের ব্রাহ্মণেরা অশোকের রাজ্য ধ্বংস করিয়া নূতন রাজ্যস্থাপন করিলেন। তাঁহারা বৈদিক আচারের পক্ষপাতী ছিলেন। প্রথমেই পাটলিপুত্রে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া অশোকের উপর তাঁহাদের যে রাগ ছিল, সে রাগ তুলিলেন। এই বংশের প্রথম রাজা পুষ্যমিত্র, ঘোর বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন। তিনি তিন-চারি বার বৌদ্ধদিগকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এখনো অনেক বৌদ্ধ পুষ্যমিত্রের নাম মুখে আনে না, এবং তাঁহার নাম শুনিলে গালি দেয়। অশোকরাজা ব্রাহ্মণবিরোধী ছিলেন। তিনি তাঁহার রাজ্যময় পশুবধ করিয়া যজ্ঞ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন,এবং ব্রাহ্মণদিগের ক্ষমতার হ্রাস করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন; সুতরাং অশোকের দলের উপরই পুষ্যমিত্রের রাগ যে বেশি ছিল, তাহা অনায়াসেই অনুমান করা যায়।[৭] তাহা হইলেই বুঝা যায় স্থবিরবাদীরাই পুষ্যমিত্রের কোপে পড়িয়াছিলেন এবং তাহাদেরই উপর তাঁহার অত্যাচার অধিক হইয়াছিল। বিশেষ আবার তাঁহারাই পুষ্যমিত্রের রাজধানীর নিকট বাস করিতেন। মহাসাংঘিকেরা অনেকে তাঁহার রাজ্যে বাস করিতেন কিন্তু অধিকাংশই তাঁহার রাজ্যের বাহিরে পঞ্জাব প্রভৃতি যবনদিগের রাজ্যে পড়িয়াছিলেন। একে তো নানা শাখা হওয়ায় বৌদ্ধেরা আপনা-আপনিই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল, পুষ্যমিত্রের নির্যাতনে তাহাদের দুর্বলতা আরো বাড়িয়া গেল।

সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে পশ্চিমাঞ্চলে শক, যবন ও পহলব প্রভৃতি জাতির রাজত্ব হইল। মহাসাংঘিকেরা সেখানে যাইয়া বিদেশীয় রাজগণকে আপনাদের মতে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল, ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্যও হইল। কিন্তু এরূপ কৃতকার্য হইতে পায় দুই শত বৎসর লাগিয়াছিল। নির্যাতন হইলেই আপনার ঘর একটু বাঁধিয়া উঠে। অনেক বৌদ্ধগণ আপনার শাখার অস্তিত্ব ভুলিয়া বৌদ্ধধর্মেরই যাহাতে রক্ষা হয় তাহারই চেষ্টা করিতে থাকে। মহাসাংঘিকেরা কনিষ্ক রাজার সময় জলন্দরে একটি মহাসভা করে।[৮] সে সভায় স্থবিরবাদীরা বড়ো স্থান পায় নাই। ঐ সভায় তাহারা আপনাদের ধর্মপুস্তক ও তাহার টীকা ও আপনাদের ধর্মমত স্থির করিয়া লন। অনেকে বলেন, এইখানে মহাযান-মতাবলম্বীরা উপস্থিত ছিল, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অল্প ছিল বলিয়া তাহারা বড়ো একটা মাথা তুলিতে পারে নাই। কিন্তু একথা বিশ্বাস হয় না, কারণ কনিষ্করাজার গুরু অশ্বঘোষ নিজেই মহাযানমতের পোষক ছিলেন। আমার বোধ হয় এই সভারই মহাসাংঘিকেরা মহাযানরূপে পরিণত হয়, কারণ মহাসাংঘিক ও মহাযানে অনেক বিষয়ে মতের ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। মহাসাংঘিকেরাও বুদ্ধত্ব লাভের প্রয়াসী ছিল, মহাযানেরাও তাহাই ছিল। মহাসাংঘিকেরা দশভূমি মানিত, ইহারাও দশভূমি মানিত। মহাসাংঘিকেরা উচ্চ দার্শনিক মতের পক্ষপাতী ছিল, মহাযানেরাও তাহাই ছিল। তবে মহাসাংঘিকদিগের মধ্যে বোধিসত্ত্ববাদ তত প্রবল হয় নাই, করুণাবাদের তো নামও শুনিতে পাওয়া যায় না।

আমার মনে হয় মহাসাংঘিকেরাই ক্রমে ক্রমে মহাযান হইয়া দাঁড়ান, কিন্তু 'মহাসাংঘিক' হইতে মহাযান মতে উপস্থিত হইতে তিন শত বৎসর লাগিয়াছিল। এ সম্বন্ধে ঠিক কথা বলিবার জো নাই, কারণ মহাসাংঘিকদিগের একখানি মাত্র পুস্তক পাওয়া গিয়াছে ও প্রকাশিত হইয়াছে; সেখানি 'মহাবস্তু অবদান'। বইখানিতে লেখা আছে—"আর্য্য-মহাসাঙ্ঘিকানাং লোকোত্তরবাদিনাং পাঠেন"—অর্থাৎ লোকোত্তরবাদী মহাসাংঘিকদিগের এই পুস্তক। এইখানি যে কী ভাষায় লেখা, তাহা ঠিক বলিতে পারা যায় না। যে ভাষায় 'ললিতবিস্তরে'র অধ্যায়ের শেষের গাথাগুলি লেখা, এও সেই ভাষায়। যে ভাষায় 'সদ্ধর্মপুণ্ডরীকে'র গাথাগুলি লেখা, এও সেই ভাষায়। যে ভাষায় 'শতসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা গুণরত্নসঞ্চয় গাথা' লেখা, এও সেই ভাষায়। মথুরার ছোটো ছোটো শিলালেখগুলি যে ভাষায় লেখা, এও সেই ভাষায়। যে ভাষায় নাসিক, কার্লি প্রভৃতি গুহায় সাতকর্ণি রাজাদের শিলালেখগুলি লেখা এও সেই ভাষায়। ইহা কতক কতক সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ অনুসারে চলে, কতক কতক সে ব্যাকরণ একেবারে মানে না। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইহার নাম দিয়াছেন গাথাভাষা। সিনার সাহেব [E. Senart] এ ভাষার নাম দিয়াছেন মিক্সড্ সংস্কৃত (mixed Sanskrit)। কেহ কেহ ইহার নাম দিয়াছেন ভারনাকুলারইজড্ সংস্কৃত (vernacularised Sanskrit)। কেহ কেহ ইহার নাম দিয়াছেন স্যান্স্কৃটাইজড্, ভারনাকুলার (Sanskritized vernacular)—যেমন আমাদের পণ্ডিতি বাংলা[৯]। 'কাব্যদর্শকার[১০] ভারতবর্ষে চারি ভাষার উল্লেখ করিয়াছেন—সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপ্রভ্রংশ ও মিশ্র; কিন্তু তিনি মিশ্র ভাষার উদাহরণ দিয়াছেন—"মিশ্রন্তু নাটকাদিকং"। তাঁহার এ উদাহরণটি ঠিক হয় নাই, কারণ তিনি ভাষার উদাহরণ দিতে

গিয়া সাহিত্যের উদাহরণ দিয়াছেন। আমার বোধ হয়, তিনি যখন লিখিয়াছিলেন, তখন একটি প্রাচীন কারিকায় ভাষাগুলির নাম পাইয়াছিলেন, সেই কারিকাটি তুলিয়া দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সময় মিশ্রভাষা চলিত না, তাই "মিশ্রন্তু নাটকাদিকং" বলিয়া একটা যা তা উদাহরণ দিয়া গিয়াছেন। 'মহাবস্তু অবদানে'র ভাষা বাস্তবিকই মিশ্রভাষা। এ ভাষায় "বাস্তু" "বস্তু" হইয়া যায়, তাই যেখানে অশ্বঘোষ কপিলবাস্তু লিখিয়াছেন, সেখানে 'মহাবস্তু অবদানে' "কপিলবস্তু" লেখা আছে। এরূপ সংস্কৃতকে বাঁকাইয়া ফেলা বাংলায় বিরল নহে, যেমন আমাদের বাংলা ভাষায় "সমভিব্যাহার' শব্দ "সমিভ্যার" হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা আমাদের ইতিহাস অনুসন্ধান করেন, তাঁহাদের বিশেষ করিয়া এই ভাষাটির আলোচনা করা উচিত।

মহাসাংঘিক হইতে কেমন করিয়া মহাযান হইল, তাহা জানার এই একখানি বৈ আর পুস্তক নাই। কনিষ্কের সময় যে-সকল পুস্তক লেখা হইয়াছিল তাহার একখানিও এখনো পাওয়া যায় নাই। চীনে তাহার কয়েকখানা পুস্তকের তর্জমা আছে। শুনিয়াছি সক্‌ডিয়ানায়[১১] মহাসাংঘিকদিগের এক শাখা চলিত, শুনিয়াছি মধ্য-এশিয়ায় মহাসাংঘিকদিগের আর-এক শাখার মত চলিত, কিন্তু তাহারো কোনো পুস্তক এ পর্যন্ত চক্ষে পড়ে নাই। 'মহাবস্তু অবদানে'র পর এবং নাগার্জুনের পূর্বে যত পুস্তক রচনা হইয়াছিল তাহার মধ্যে আমরা 'লঙ্কাবতার সূত্র' দেখিতে পাই, আর অশ্বঘোষের তিন-চারিখানি পুস্তক দেখিতে পাই। ইহাতেই দেখা যায় যে, মহাযানের মূল মতগুলি ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া যাইতেছে। 'মহাবস্তু অবদানে' দশভূমির কথা আছে, বুদ্ধত্ব লাভেরও কথা আছে, কিন্তু বোধিসত্ত্ববাদ নাই। 'লঙ্কাবতারে' বোধিসত্ত্ববাদ সামান্যভাবে আছে। অশ্বঘোষের 'সৌন্দরানন্দে' আছে, "তোমার নিজের উদ্ধার হইলেই নিশ্চিন্ত থাকিও না, পরকেও উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিবে। তোমার কৃত্য সমাপ্ত হইয়াছে, তুমি অপরকে উদ্ধার করো" ইত্যাদি। এ-সকলেই আমরা মহাযান মতের মূল দেখিতে পাইতেছি। 'লঙ্কাবতারে' কথা তুলিয়াছে "তথাগত" কি অবিনশ্বর?

অনেকে মনে করেন, হিন্দু ও বৌদ্ধদিগকে মিলাইবার জন্য নাগার্জুন মহাযানমতের সৃষ্টি করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, বুদ্ধদেবের পর কোনো মহা প্রতিভাশালী ব্যক্তি 'ভগবদ্গীতা' রচনা করেন। 'ভগবদ্গীতা'র মত মাহসাংঘিকদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মহাযান হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এরূপ মনে করিবার কোনো কারণ নাই, বরং ইহার বিরুদ্ধ মতের অনেক প্রমাণ আছে। একথাটি বুঝাইতে গেলে একটু বাজে কথার দরকার এবং সে বাজে কথা কহার দরুণ কেহ যেন কিছু মনে না করেন।

নেপালিরা বলে ধর্ম দুই প্রকার হইতে পারে। খাঁটি ধর্ম দু রকম ছাড়া তিন রকম হইতে পারে না। সেই দুই প্রকার ধর্ম—১. দেবভাজু ২. গুভাজু। হয় দেবতাকে ভজনা করো, না হয় গুরুকে ভজনা করো। ব্রাহ্মণেরা দেবভাজু, বৌদ্ধেরা গুভাজু, সুতরাং বৌদ্ধধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম কিছুতেই মিশিতে পারে না। বৌদ্ধধর্মের শ্রাবকযান ও প্রত্যেকযান দুই-ই গুভাজু, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। মহাযানও সম্পূর্ণরূপে গুভাজু, তাহারা বুদ্ধকেই মানে, বুদ্ধই তাহাদের গুরু, বুদ্ধকেই তাহারা মুক্তির উপায় বলিয়া মনে করে, কোনো দেবতাকেই তাহারা উপাসনা করে না, তবে তাহাদিগকে হিন্দু ও বৌদ্ধের

সামঞ্জস্য বলিয়া কেমন করিয়া মনে করিব? বরঞ্চ হীনযানে সময়ে সময়ে ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি করিতে বলে, কিন্তু মহাযানে সেটুকু বড়ো দেখা যায় না। একজন আচার্য তাঁহার এক সেবককে ভিক্ষু করিবার জন্য বড়োই চেষ্টা করিতেন। সেবক বলিত, "মহাশয়, আমার এখনো সময় হয় নাই।" কিছুদিন পরে সে আসিয়া বলিল, "আচার্য মহাশয়, আমার আর ভিক্ষু হইবার দরকার নাই, আমি একেবারে বৌদ্ধ হইয়া গিয়াছি।" আচার্য বলিলেন, "কিসে এমন হইল?" সে বলিল, "এখন ব্রাহ্মণ দেখিলেই ইচ্ছা হয় ইহাকে খুন করিয়া ফেলি।" আচার্য বলিলেন, "তবে ঠিকই হইয়াছে।" ইহার উপরেও কি বলিব যে, মহাযান হিন্দু ও বৌদ্ধের সামঞ্জস্য মাত্র। তবে এক কথা—একদেশে যদি দুই-তিন ধর্মের লোক থাকে, তবে তাহাদের আচার ব্যবহার ক্রমে কতকটা এক হইয়া যায়। আমাদের দেখাদেখি ভদ্রঘরের মুসলমানের মেয়েরা বিধবা হইলে আর বিবাহ করিতে চায় না, মুসলমানের দেখাদেখি আমরাও পীরের শিরনি দিই। ফিরিঙ্গিরা কালীর কাছে মানত করে। এই মানতের দৌলতে কলিকাতার বহুবাজার স্ট্রিটে ফিরিঙ্গি-কালীর মন্দিরে, মার্বেলের মেজে হইয়া গিয়াছে। এ-সকল গৃহস্থের মধ্যে চলিতে পারে; কিন্তু যাহারা ধর্মের কর্তা তাহাদের ভিতর এসব করিলে চলে না। তাহাদের আপন আপন ধর্মের মত ঠিক মানিয়া চলিতে হয়, নহিলে গৃহস্থেরা তাহাকে মানিবে কেন?—তাহার কথাই বা শুনিবে কেন?

মহাযানের কিন্তু বাহাদুরি আছে। যতদিন মহাসাংঘিক ছিল, ততদিন তাহাদের মধ্যে নানারূপ মতভেদ ছিল, আর পরস্পর বেশ রেষারেষিও ছিল, কিন্তু মহাযানের পর সেটা আর বড়ো দেখা যায় না। সবাই আপনাকে মহাযান বলিয়া পরিচয় দিতেই ব্যগ্র হয়। শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদ মহাযানের দুইটা প্রকাণ্ড দার্শনিক মত, কিন্তু উভয়ই মহাযান এবং মহাযান বলিয়া উভয়েই স্পর্ধা করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে যে অন্য কোনো বিষয় লইয়া দলাদলি আছে তাহা বোধ হয় না। আর মহাযান হইতে এই যে মন্ত্রযান, বজ্রযান, সহজযান, কালচক্রযান প্রভৃতি নানা যানের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহারাও সকলে আপনাদিগকে মহাযান বলিয়াই স্পর্ধা করিয়া থাকে। এরূপ হইবার কারণ কী? আমার বোধ হয় মহাযানধর্মের উদারতাই ইহার কারণ। জগৎ উদ্ধারই আমাদের উদ্দেশ্য। যে যে-প্রকারই করুক না কেন, তাহাতে আমাদের বৃদ্ধি বৈ ক্ষতি নাই। সুতরাং আমাদের পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদ কেন? জগৎ একটা প্রকাণ্ড বস্তু, একা কিছু উদ্ধার করা যায় না। সুতরাং তুমি যাহা করিলে, সেও আমার কার্য, আমি যাহা করিলাম, সেও তোমার কার্য। তাহা লইয়া তোমায় আমায় ঝগড়া হইবে কেন?

মহাযান কোথা হইতে আসিল ইহার উত্তর এই যে, মহাসাংঘিকেরাই ক্রমে মহাযান হইয়া গিয়াছে; ব্রাহ্মণ্যধর্মের সহিত উহার কোনো বিশেষ সম্বন্ধ নাই; ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধের সামঞ্জস্য করিবার জন্য মহাযানের সৃষ্টি হয় নাই; মহাযানের উদ্দেশ্য মহৎ, উহা সকল ধর্মকেই আপনার ক্রোড়ে টানিয়া লইতে পারে।

'নারায়ণ'
শ্রাবণ, ১৩২২ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. মাধ্যমিক দর্শনের প্রবর্তক নাগার্জুন খৃস্টীয় দ্বিতীয় শতকে বর্তমান ছিলেন। বিদর্ভের (বেরার) কোনো ব্রাহ্মণ বংশে তাঁর জন্ম। অন্ধ্র দেশের রাজা সাতবাহনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। নাগার্জুনের রচনায় ব্রাহ্মণ্য চিন্তার সঙ্গে গভীর পরিচয়ের নিদর্শন থেকে বোঝা যায়, বৌদ্ধ মতবাদ আশ্রয় করার আগে তিনি চতুর্বেদ ও আনুষঙ্গিক শাস্ত্রে পারংগম হয়েছিলেন। চীনা ভাষায় কুমারজীব অনূদিত নাগার্জুনের জীবনচরিতে বলা হয়েছে, মাত্র ৯০ দিনে তিনি সমগ্র 'ত্রিপিটক' আয়ত্ত করেছিলন। ঐ জীবনীগ্রন্থে এবং তিব্বতি বিবরণে তাঁকে একজন অসাধারণ জাদুকর বলা হয়েছে। তাঁকে নানা অলৌকিক শক্তির অধিকারী মনে করার মূলে আছে তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বিস্ময় বোধ। নাগার্জুনের প্রধান রচনা, মাধ্যমিক দর্শনের মূল গ্রন্থ 'মাধ্যমিক-কারিকা' ৪০০ শ্লোকে সম্পূর্ণ। 'অকুতোভয়া' নামে তিনি এর একখানি টীকা লিখেছিলেন। অন্যান্য রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'শূন্যতাসপ্ততি', 'যুক্তিষষ্টিকা', 'বিগ্রহব্যাবর্ত্তনী', 'বৈদল্যসূত্র' ও 'ব্যবহারসিদ্ধি'। নাগার্জুনের মূল রচনা পাওয়া যায় নি, চীনা ও তিব্বতি অনুবাদ থেকে তাঁর দার্শনিক মতবাদ সংগ্রহ করা হয়েছে।

নাগার্জুনের আগে বৌদ্ধ দর্শনে বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক মতবাদের উদ্ভব হয়েছিল। বৈভাষিক দর্শনের ভিত্তি 'বিভাষা' নামে 'অভিধর্ম্মে'র টীকা। সৌত্রান্তিক দর্শনের ভিত্তি সূত্রগ্রন্থ। বৈভাষিকেরা "ধর্ম" অর্থাৎ স্বলক্ষণযুক্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। সৌত্রান্তিক মতে "ধর্ম" শূন্য-স্বভাব, অলীক। নাগার্জুন এই দুই চরম মতবাদের কোনোটিই গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি। তাঁর মতে অস্তি ও নাস্তির চরম অবস্থান থেকে পরমার্থ সত্যের ব্যাখ্যা করা যায় না। তিনি বুদ্ধদেবের মধ্যমা প্রতিপদ বা মধ্যপথ অবলম্বনের উপদেশ আশ্রয় করে নিজের তত্ত্বপ্রস্থান গঠন করেন। মাধ্যমিক দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য শূন্যতা। নাগার্জুন প্রতিপন্ন করেছেন, "ধর্ম" বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের উৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশ কিছুই প্রমাণ করা যায় না। 'ধর্মের" উৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশ যেমন নেই, তেমনি ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ ব্যাপী কালপ্রবাহও নেই। হীনযান মতে বলা হয় পুদ্‌গল বা ব্যক্তিত্ব না থাকলেও ধর্ম আছে। বেদান্ত মতে আত্মা আছে কিন্তু কর্মজগৎ নেই। কর্তা নেই অথচ কর্ম আছে, কর্ম নেই অথচ কর্তা আছে—নাগার্জুনের মতে দুটি ধারণাই অযৌক্তিক। তিনি বলেন—কর্তা বা কর্ম, পুদ্‌গল বা ধর্ম কিছুরই অস্তিত্ব নেই, আছে শুধু তার আভাস। আভাসের উৎপত্তির হেতু প্রতীত্যসমুৎপাদ বা "অবিদ্যা" থেকে "সংস্কার", সংস্কার থেকে "বিজ্ঞান", বিজ্ঞান থেকে "নামরূপ", নামরূপ (পুদ্‌গল) থেকে 'ষড়ায়তন" (চোখ-কান-শ্রোত্র-ঘ্রাণ-জিব-কায়-মন—এই ৬ ইন্দ্রিয়), ষড়ায়তন থেকে "স্পর্শ", স্পর্শ থেকে 'বেদনা" (অনুভূতি), বেদনা থেকে "তৃষ্ণা" (কাম-রূপ-অরূপ তৃষ্ণা), তৃষ্ণা থেকে "উপাদান", উপাদান থেকে "ভব" (জন্মাকাঙ্ক্ষার কারণ), ভব থেকে "জাতি" (জন্মান্তর) এবং জাতি থেকে "জরামরণ"—এই এক কারণ থেকে অন্য কারণ উৎপত্তির নিয়ম। আভাস সর্বদাই ব্যবহারিক, অন্যসাপেক্ষ। সাপেক্ষ পদার্থমাত্রেই মিথ্যা। শূন্যতা একমাত্র পারমার্থিক সত্য। প্রশ্ন উঠতে পারে, উৎপত্তি-বিলয় যদি না থাকে তাহলে এমন-কি বুদ্ধদেব প্রচারিত ধর্ম, সংঘ বা স্বয়ং বুদ্ধও মিথ্যা। নাগার্জুন ব্যবহারিক সত্য এবং পারমার্থিক সত্য—দুই তত্ত্বের সাহায্যে এই সংশয় নিরসন করেছেন। দেখিয়েছেন, বুদ্ধ-বচনের মধ্যেই ব্যবহারিক ও পারমার্থিক সত্যের ইঙ্গিত আছে। ব্যবহারিক দিক থেকে

জন্ম-জরা-মৃত্যু, দুঃখ, সংসার, কর্ম, কর্মফল সবই আছে। কিন্তু পারমার্থিক দিক থেকে এর কিছুই নেই। স্বভাব-শূন্যতা একমাত্র সত্য।

নাগার্জুন অসাধারণ নৈয়ায়িক। তাঁর বিচার-পদ্ধতি দ্বন্দ্ব মূলক। অস্তি এবং নাস্তি—এই দুই চরম অবস্থানের সঙ্গে নাগার্জুন আরো দুটি বিকল্প অবস্থান যোগ করেছেন : আছে এবং নেই, আছে এমনও নয় আবার নেই এমনও নয়। এই চারটি বিকল্পকে তিনি বলেন "চতুষ্কোটি"। কোনো সমস্যা বিবেচনায় যত দৃষ্টিকোণ ভাবা সম্ভব, সবই এই চতুষ্কোটির মধ্যে পড়বে। নাগার্জুন পারমার্থিক সত্য প্রমাণের জন্য দ্বন্দ্বময় বিকল্পগুলির সমন্বয়ের চেষ্টা করেন নি। প্রত্যেক মত বা দৃষ্টিকে তারই বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে সেই মতের অসংগতি উদ্‌ঘাটন করেছেন। দেখিয়েছেন, পারমার্থিক সত্য স্বভাব-শূন্যতা "চতুষ্কোটি বিনির্মুক্ত"। সমস্ত বিতর্কের ঊর্ধ্বে'।

২. এই বইয়ের পৃ. ৪৯-৫০ (প্রাসঙ্গিক তথ্য), সূত্র ৫ দ্র.

৩. এই বইয়ের পৃ. ১৯-২১ (প্রাসঙ্গিক তথ্য), সূত্র ১৯ দ্র.

৪. Daisetz Teitaro Suzuki, *Asvaghosha's discourse on the Awakening of Faith in the Mahayana, 1900.*

৫. এই বইয়ের পৃ. ৩৪-৩৫ (প্রাসঙ্গিক তথ্য), সূত্র ১ দ্র.

৬. 'দীপবংস', 'মহাবংস', 'মহাবোধিবংস 'সাসনবংস', 'সদ্ধর্মসঙ্গহ' প্রভৃতি স্থবিরবাদী শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, অশোকের রাজত্বের (খৃ. পূ. আ. ২৭৩-৩২) অষ্টাদশ বর্ষে এক সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এটি তৃতীয় বৌদ্ধ-সংগীতি। এই সময়ে বৌদ্ধ-সংঘে প্রবেশ করলে রাজপোষকতা পাওয়া সহজ হওয়ায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিন্ন মতাবলম্বীরাও সংঘে যোগ দেয়। ফলে সংঘের নীতি-নিয়ম বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। সংঘনায়ক মোগ্‌গলীপুত্ত তিস্‌স, মৌদ্‌গলীপুত্র তিষ্য বিরক্ত হয়ে পাটলিপুত্রের অশোকারাম ছেড়ে গিয়ে অহোগঙ্গ পর্বতে আশ্রয় নেন। সাত বছর পরে অশোক তাঁকে আবার ফিরিয়ে এনে তাঁর সাহায্যে সংঘে শৃঙ্খলা এবং বিনয়-বিধি প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। স্থবিরবাদের শুদ্ধতা ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে একটি বিচার সভার আয়োজন হয়। পরে ১০০০ নির্বাচিত ভিক্ষু-প্রতিনিধিদের নিয়ে তিস্‌সর সভাপতিত্বে সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। এই সংগীতির কাজ চলে নয় মাস ধরে। সারনাথে পাওয়া একটি স্তম্ভ লিপিতে সংঘ-ভেদ রোধে অশোকের উদ্যোগের উল্লেখ আছে। বিচারসভায় পাঁচ শো বিরুদ্ধ মত খণ্ডন করা হয়েছিল। বিচারের বিবরণ 'কথাবত্থু', 'কথাবস্তু' নামক অভিধর্ম-প্রকরণে সংকলিত আছে। সূত্র এবং বিনয় সংশোধন তৃতীয় সংগীতির উদ্দেশ্য ছিল। এই সময়ে 'ত্রিপিটক' পূর্ণাঙ্গ করে তোলা হয়েছিল মনে করা হয়। তৃতীয় সংগীতির পরে মোগ্‌গলীপুত্ত তিস্‌স কাশ্মীর-গান্ধার, মহিষমণ্ডল, বনবাসী, অপরান্ত, যবনলোক, হিমালয় প্রদেশ, সুবর্ণভূমি, লঙ্কাদ্বীপ—এই প্রত্যন্ত জনপদগুলিতে স্থবিরবাদী বৌদ্ধমত প্রচারের জন্য নয় জন স্থবিরকে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। লঙ্কায় গিয়েছিলেন অশোকের ভাই, মতান্তরে ছেলে মহেন্দ্র। দ্র. Haraprasad Shastri, "Chips from a Buddhist Workshop". *The Buddhistic Studies,* Chapter xxxiv, pp. 818-58.

৭. অশোক ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী ছিলেন এবং ব্রাহ্মণদের অসন্তোষ ও বৌদ্ধবিরোধী মনোভাব মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের কারণ, "Causes of the Dismemberment of the Maurya Empire" প্রবন্ধে শাস্ত্রীমশায় এই মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, পশুবলি নিষেধ,

জাতিধর্ম নির্বিশেষে দণ্ড-সমতা ও ব্যবহার-সমতা নীতি প্রয়োগ, ধর্মমহামাত্র নিয়োগের ফলে কর্তৃত্ব লোপ—প্রভৃতি কারণে ব্রাহ্মণরা অশোকের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতেন। অশোকের কঠোর শাসন যতদিন ছিল ততদিন তাঁরা অসম্মান সহ্য করেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে উত্তরাধিকারী সম্রাট্‌দের বিরুদ্ধে মাথা তোলেন। "They began to cast their eyes for a military man to fight for them. And they found such a man in Pusya Mittra, the Commander-in-Chief of the Maurya empire.... He was a Brahminist to the core and hated the Buddhists. At first he led the Maurya armies against the Greeks, who advanced year after year to the very heart of the Maurya empire. After a successful campaign, he returned to Pataliputra with his victorious army, and the feeble representative of Asoka on the throne accorded him a fitting reception. A camp was formed outside the city and a review was held of a large army. In the midst of the festivities an arrow struck the king on the forehead. The king expired instantly. the Maurya empire was gone and Pusya Mittra became the master of the situation, and we read in the *Malavikagnimittra* that he remained with his army at Pataliputra and made his son king of Vidisa. We clearly see the hands of Brahmanas in this great revolution. For, shortly after the revolution, Pusya Mittra planned a horse sacrifice at Pataliputra, the very capital of Asoka, who prohibited the slaughter of animals throughout his empire. Does not this show the Brahmanas triumphant? Vasumittra, his grandson, was appointed to guard the horse in its unrestrained career through his empire. His mother, the queen of Agnimittra, invoked the blessings of Brahmanas for her son, and she arranged for the distribution of 800 gold money a month to विद्याचार्येभ्यो ब्राह्मणेभ्यः । Eight hundred gold money a month is a very respectable educational grant. In some Buddhist books Pusya Mittra is regarded as a persecutor of Buddhism. In fact, he was entirely in the hands of Brahmanas, and in two generations, the Brahmanas not only made themselves actual masters of the Maurya empire as it then stood, but spread their influence far and wide, gave a new turn to Buddhist and Jaina religions, compiled and codified all branches of knowledge then known, and gave a turn to Brahmanism which it has not lost ever since." (*J-A-S-B,* N-S, Vol. vi, May 1910, pp. 260-61).

দু বছর পরে "Who were the Sungas" নিবন্ধে শাস্ত্রীমশায় আবার লেখেন, "In a paper contributed by me on the *Dismemberment of the Maurya Empire* I advanced a theory that they were of Persian origin from the fact that the names of the kings of this dynasty ended with the word

'Mitra', a favourite deity of the Persians. I have now got some facts for the identification of the family. In page 312 of the *Latyayana Srauta Sutra* there is a sutra in which the opinion of the Sungas are cited in support of the author. A commentator, in explaining the word 'Sunga', says 'Sungah Acaryya', that is, the Sungas were Acaryyas or teachers of the *Sama Veda. (J-A-S-B, N-S,* Vol, viii, July 1912, pp. 287).

"Causes of the Dismemberment of the Maurya Empire" প্রবন্ধটি থেকে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের কারণ সম্পর্কে ধারাবাহিক গবেষণার সূত্রপাত হয়। পরবর্তী গবেষকেরা শিলালিপির বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও অন্যান্য সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে শাস্ত্রীমশায়ের যুক্তি ও সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন। অশোক তাঁর সাম্রাজ্যের সর্বত্র সব ধরনের পশুহত্যা নিষিদ্ধ করেছিলেন এমন প্রমাণ নেই। বিশাল সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিচারের নীতি অভিন্ন হওয়া কাম্য বিবেচনা করে অশোক "জনপদ হিতসুখায়ে" নিযুক্ত "রাজুক" স্তরের প্রশাসকদের উদ্দেশে "ব্যবহার-সমতা" ও 'দণ্ড-সমতা" নীতি মেনে চলার নির্দেশ দেন। ব্রাহ্মণদের মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই পাবার অধিকার হরণ এ নির্দেশের উদ্দেশ্য ছিল না। বিশেষত, প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণরা যে এমন কোনো বিশেষ অধিকার ভোগ করতেন না—তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কোনো কোনো শিলালিপিতে বিশেষভাবে ব্রাহ্মণদের প্রতি দুর্ব্যবহার নিষেধ করা হয়েছে, ব্রাহ্মণদের স্বার্থ দেখবার জন্য ধর্মমহামাত্র নিয়োগের উল্লেখও পাওয়া যায়।

শেষ মৌর্য সম্রাট বৃহদ্রথ নিহত হলে তাঁর প্রধান সেনাপতি পুষ্যমিত্র শুঙ্গবংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন এবং আনুমানিক ১৮৭-১৫১ খৃষ্ট-পূর্বাব্দ পর্যন্ত ৩৬ বৎসর রাজত্ব করেন। শুঙ্গরা পশ্চিম ভারতের উজ্জয়িনী অঞ্চলের সামবেদী ব্রাহ্মণ।

বৌদ্ধ সাহিত্যে পুষ্যমিত্রকে বৌদ্ধ-বিদ্বেষী বলা হয়েছে। বলা হয়েছে অশোক ৮৪,০০০ স্তূপ নির্মাণ করে বিখ্যাত হয়েছিলেন, পুষ্যমিত্র এই ৮৪,০০০ স্তূপ ধ্বংস করে বিখ্যাত হতে চেয়েছিলেন। এইসব উক্তির সত্যতা বিষয়ে সংশয়ের কারণ আছে। প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ থেকে জানা যায় শুঙ্গ রাজত্বে স্তূপ সংস্কার এবং উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হত। যেমন, এই সময়েই সাঁচি স্তূপটি বড়ো করা হয় এবং ঘিরে রাখার ব্যবস্থা হয়। পুঁষ্যমিত্রের নাতি, অগ্নিমিত্রের ছেলে বসুমিত্র গ্রীক আক্রমণ প্রতিরোধ করেন। এইজন্য পুষ্যমিত্র দু বার অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। অশোকের উপরে রাগ অশ্বমেধ যজ্ঞের কারণ নয়। দ্র. Romila Thapar, *Asoka and the Decline of the Mauryas,* OUP Paper Back 1973, pp. 197-212; Debala Mitra, *Buddhist Monuments,* Calcutta 1971, pp. 24-26.

৮. কুষাণ রাজা কনিষ্কের রাজত্বকাল সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা একমত নন। ৭৮ থেকে ১৪৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোনো সময়ে তাঁর রাজত্ব শুরু হয়েছিল। তাঁর রাজধানী ছিল পুরুষপুরে (পেশোয়ার)। বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক কনিষ্ক ১৮টি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশে চতুর্থ বৌদ্ধ-মহাসংগীতি আহ্বান করেন। তিব্বতের ঐতিহাসিক বু-তোন, Bu-Ston-এর বিবরণ অনুযায়ী ১৮টি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পূর্বশৈল, অপরশৈল, হৈমবত, লোকোত্তরবাদী ও প্রজ্ঞপ্তিবাদী—মাহাসংঘিক সম্প্রদায়ের অন্তর্গত;

মূল সর্বাস্তিবাদী, কাশ্যপীয়, মহীশাসক, ধর্মগুপ্ত, বাহুশ্রুতীয়, তাম্রচৈতীয় ও বিভজ্যবাদী—সর্বাস্তিবাদী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত; জেতবনীয়, অভয়গিরিবাসী ও মহাস্থবির—স্থবির সম্প্রদায়ের অন্তর্গত; কুরুকুল্লক, অবন্তক ও বাৎসীয়পুত্রীয়—সম্মিতীয় সম্প্রদায়ের অন্তর্গত; বিভিন্ন গ্রন্থে সম্প্রদায়গুলির নাম এবং শ্রেণীবিভাগের ভিন্নতা দেখা যায়। আনুমানিক ১০০ খৃস্টাব্দে জালন্ধরে, মতান্তরে কাশ্মীরের কুণ্ডল-বন-বিহারে চতুর্থ মহাসংগীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সভাপতিত্ব করেন আচার্য বসুবন্ধু। চীনা ও তিব্বতি বিবরণ অনুযায়ী 'ত্রিপিটক' বিষয়ে পারঙ্গম ৫০০ নির্বাচিত স্থবির এই সংগীতিতে যোগ দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন মহাসাংঘিক। থেরবাদীরা সম্ভবত চতুর্থ সংগীতিতে যোগ দেন নি। কোনো থেরবাদী গ্রন্থে চতুর্থ সংগীতির উল্লেখ পাওয়া যায় না। হিউয়েন্-ৎসাঙ লিখেছেন, তিনটি পিটকের প্রত্যেকটির উপরে এক লক্ষ শ্লোকে টীকা রচিত হলে অশ্বঘোষ সংশোধন করে এই 'অট্ঠকথা', অর্থকথার চূড়ান্ত রূপ দেন। 'অট্ঠকথা' সংগ্রহকে বিভাষাশাস্ত্র বলা হয়। তামার পাতে 'ত্রিপিটক' এবং প্রস্তুত 'অট্ঠকথা' খোদাই করিয়ে পাথরের আধারে মাটির নিচে পুতে রাখা হয়। কনিষ্ক তার উপরে একটি স্তূপ প্রতিষ্ঠা করেন। শাস্ত্র এবং শাস্ত্রের গৃহীত ব্যাখ্যায় বিকৃতি রোধ করার জন্য এই ব্যবস্থা হয়েছিল। তামার পাতে খোদাই করা লেখা অবশ্য এখনো পাওয়া যায় নি। সম্ভবত সংস্কৃতে বিভাষাশাস্ত্র রচিত হয়েছিল এবং এই সময় থেকে সংস্কৃত ভাষা বৌদ্ধ-বিদ্যার বাহন হয়ে ওঠে।

৯. এই বইয়ের পৃ. ১৬ (প্রাসঙ্গিক তথ্য) সুত্র ১১ দ্র.

১০. দণ্ডী রচিত অলংকারশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'কাব্যাদর্শ'। দণ্ডী আনুমানিক সপ্তম শতাব্দীর শেষ দিকে বর্তমান ছিলেন। 'কাব্যাদর্শ' তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। আলোচিত বিষয় কাব্যলক্ষণ, বৈদর্ভী ও গৌড়ী রীতি এবং শ্লেষ-প্রসাদ-সমতা ইত্যাদি দশটি গুণ। 'দশকুমারচরিত' গদ্যকাব্য দণ্ডীর রচনা রূপে পরিচিত, কিন্তু আলংকারিক দণ্ডীই 'দশকুমারচরিতে'র লেখক কিনা এ বিষয়ে সংশয় আছে।

১১. মধ্য -এশিয়ায় প্রাচীন পারস্য সাম্রাজ্যের অংশ সোগ্ডিয়ানা (Sogdiana) বক্ষু (Oxus) এবং জাক্সারটেস (Jaxartes) নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল। প্রধান শহর সমরকন্দ।

৭

সহজযান

মহাযানমতে নির্বাণ লাভ করা অত্যন্ত কঠিন। কত জন্মজন্মান্তর ধরিয়া ধ্যান, ধারণা, সমাধি করিয়া "দশভূমি" অতিক্রম পূর্বক শূন্যের উপর শূন্য, তার উপর শূন্য পার হইয়া, তবে নির্বাণ-পদ লাভ হয়। এত তো লোকে করিয়া উঠিতে পারে না। সুতরাং একটা সহজ পথ চাই। সে সহজ পথ কোথা হইতে আসে?

মহাযানে তো "সাংবৃত সত্য" বা সংসারকে একেবারে উড়াইয়া দিয়াছে এবং "পরমার্থ সত্য"কে শূন্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। নির্বাণ ও শূন্য একই। মাধ্যমিকেরা[১] শূন্যকে "চতুষ্কোটি-বিনির্মুক্ত" বলিয়াছে—অতএব উহা "অস্তি"ও নয়, 'নাস্তি"ও নয়, "তদুভয়"ও নয়, "অনুভয়"ও নয়। তবে উহা কী?—অনির্বচনীয় রূপ কিন্তু উহার ধারণা ভাবরূপে হয়, অভাবরূপে নয়—ইংরাজিতে বলিতে গেলে Positive, Negative রূপে নয়। যোগাচার বা বিজ্ঞানাবাদীরা[২] বলেন যে, ঐ অবস্থায় শূন্য বিজ্ঞানমাত্র। ইহাও "ভাব"। সহজবাদীরা বলিলেন, তোমাদের সংসারও যেমন মিথ্যা, নির্বাণও তেমনই মিথ্যা। মানুষ সকলেই নিত্যমুক্ত, পাপ পূণ্য বলিয়া কোনো জিনিসই নাই।

সহজধর্মের অনেক বই বাংলায় লেখা। হওয়াই উচিত। যদি নির্বাণটাকে সহজই করিতে হয়, তবে উহাকে সংস্কৃত দিয়া কঠিন করা কেন? বাংলায় বলিলে উহা তো আরো সহজ হইবে। তাই তাঁহারা বাংলাতেই সহজধর্ম প্রচার করেন। সরহপাদ[৩] বাংলায় বলিলেন—

অপণে রচি রচি ভব নির্বাণা
মিছেঁ লোঅ বন্ধাবএ অপনা।
অন্তে না জাণহু অচিন্ত জোই
জাম মরণ ভব কইসণ হোই ॥
জইসো জাম মরণ বি তইসো
জীবন্তে মঅলেঁ ণাহি বিশেসো ॥
জাএথু জাম মরণে বিসঙ্কা।
সো করউ রস রসানেরে কথা ॥ [বৌ-গা-দো, পৃ. ৩৮]

লোকে বৃথা আপনা-আপনি সংসার ও নির্বাণ মনে মনে রচনা করিয়া আপনাকে বদ্ধ করিয়া ফেলে। আমি অচিন্ত্যযোগী—আমি জানি না জন্ম মরণ ও ভব কিরূপ? জন্মও যেরূপ, মরণও সেইরূপ; জীয়ন্তে ও মরণে কোনোই বিশেষ নাই। জন্ম ও মরণে যাহার শঙ্কা, সেই রস ও রসায়নের আকাঙ্ক্ষা করুক।

ভাদেপাদের[৪] কথা এই—

এতকাল হাঁউ অচ্ছিলেঁ স্বমোহেঁ
এবেঁ মই বুঝিল সদ্‌গুরুবোহেঁ ॥
এবেঁ বিঅরাঅ মকুঁ ণঠা।
গণসমুদে টলিআ পইঠা ॥
পেখমি দহদিহ সর্ব্বই শূন।
চিঅ বিহুন্নে পাপ না পুন্ন ॥
বাজুলে দিল মোহকখু ভণিআ
মই অহারিল গঅণত পণিআঁ ॥
ভাদে ভণই অভাগে লইআ
চিঅরাঅ মই অহার কএলা ॥ [পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪]

এতকাল আমি আমার মোহেতেই ছিলাম। এখন আমি সদ্‌গুরুর নিকট উপদেশ পাইয়া ঠিক বুঝিতে পারিলাম। এখন বুঝিলাম আমার চিত্তরাজ একেবারেই নাই। তিনি টলিয়া গগন-সমুদ্রে পড়িয়া গিয়াছেন। আমি দেখিতেছি দশ দিক সকলই শূন্য। চিত্তই যখন নাই, তখন পাপও নাই, পুণ্যও নাই। আমার বজ্রগুরু আমার মোহের কুঠারি ভাঙিয়া দিয়াছেন। আমি গগনে পড়িয়া হারাইয়া গিয়াছি। ভাদেপাদ বলিতেছেন, ভাগ তো নাই, আমি আমার চিত্তরাজকে আহার করিয়া ফেলিয়াছি, অর্থাৎ, তাহাকে "নিঃস্বভাব" করিয়াছি।

এই দুইটি গান হইতে আমরা কী বুঝিতে পারিতেছি? যখন সবই শূন্য—তখন উৎপত্তিও নাই, নিবৃত্তিও নাই, ভঙ্গও নাই; জন্মও নাই, মরণও নাই, সংসারও নাই। "চিত্ত" "চিত্ত" বলিয়া যে পদার্থ আছে বল, তাহাও তো শূন্যসমুদ্রে পড়িয়া মিশাইয়া গিয়াছে। তাহা হইলে পাপও নাই, পুণ্যও নাই। সকল জিনিসই যখন নিঃস্বভাব, তখন আমার চিত্তেরই যে স্বভাব থাকিবে, তাহারই বা অর্থ কী? আমি যতদিন নিজে জন্ম-মরণ-সংসারের ভাবনা ভাবিতেছিলাম, ততদিন আমি মোহে বা ধোকায় পড়িয়াছিলাম। ঠিক গুরুর কাছে ঠিক উপদেশ পাইয়া, আমি বুঝিলাম আমার চিত্তরাজ নাই। আমি চিত্তরাজকে "আহার" করিয়া ফেলিলাম।

যোগাচারমতে যেমন—কিছুই থাকে না, বিজ্ঞানমাত্র থাকে; সহজ-মতে তেমনই কিছুই থাকে না, আনন্দমাত্র থাকে। এই আনন্দকে তাঁহারা সুখ বলেন, কখনো বা মহাসুখ বলেন। সে সুখ স্ত্রীপুরুষ-সংযোগজনিত সুখ। ইঁহাদের মতে চারিটি শূন্য আছে—নিচের শূন্য কয়টি কিছুই নয়, আলোকমাত্র; চতুর্থ শূন্যের নাম প্রভাস্বর। সে শূন্যে আপনি উজ্জ্বল। সেই শূন্যে চিত্তরাজ গিয়া উঠিলেন, তাহার পর নিরাত্মাদেবীর সহিত মহাসুখে মগ্ন হইয়া "নিঃস্বভাব" হইয়া গেলেন।

সহজযানের মূল কথা—সদ্‌গুরুর উপদেশ।

এই যানের কথা—

ন বিনা বজ্রগুরুণা সর্ব্বক্লেশপ্রহাণকম্।
নির্ব্বাণঞ্চ পদং শান্তমবৈবর্ত্তিকমাপ্নুয়াৎ ॥ ('শ্রীসমাজতন্ত্র')[৫]

বজ্রগুরু ব্যতিরেকে নির্বাণপদ পাওয়া যায় না। যে নির্বাণে সকল ক্লেশের নাশ হয়, শান্তি যে নির্বাণের চরম ফল, যে নির্বাণে আর "বিবর্ত" থাকে না, অর্থাৎ, কোনোরূপ পরিবর্তন হয় না, সে পদ গুরুর কৃপা ভিন্ন পাওয়া যায় না।

গুরুর কথা শুনিলে, তাঁহার হিত উপদেশ পাইলে, তুমি ইচ্ছা করো আর না-ই করো, তুমি নিশ্চয়ই মোক্ষলাভ করিবে। ('বজ্রজাপ')

গুরুর প্রসাদেই পরম সুখলাভ হয়, সে সুখ নিজেই বুঝিতে পারা যায়, পরেও আমাকে বুঝাইতে পারে না, আমিও পরকে বুঝাইতে পারি না। সে সুখে তন্ময়তা লাভ হয়, অর্থাৎ সুখ ভিন্ন জগতের অন্য কোনো পদার্থের অস্তিত্ব থাকে না, সে সুখ গুরু হইতেই উদয় হয়। অনেক পুণ্য থাকিলে, গুরুর অনেক উপাসনা করিলে, সে সুখ লাভ হইয়া থাকে। ('সরহপাদপ্রবন্ধ')

সে গুরুকে আমরা বজ্রগুরু বলি কেন? বজ্র বলিতে শূন্যতা বুঝায়। 'যোগরত্নমালা'য়[৬] লিখে—

দৃঢ়ং সারমশৌর্য্যমচ্ছেদ্যাভেদ্যলক্ষণম্।
অদাহী অবিনাশী চ শূন্যতা বজ্র উচ্যতে ॥

শূন্যতাই বজ্র। উহা ছেদ করা যায় না, ভেদ করা যায় না, দগ্ধ করা যায় না, বিনাশ করা যায় না, উহাতে ছেঁদা করা যায় না—উহা অতি দৃঢ় ও সারবান্। যে গুরু এই শূন্যতাবজ্রের উপদেশ দেন, তিনিই বজ্রগুরু।

গুরুর উপদেশে যাহা লাভ হয়, সে লাভ শতসহস্র সমাধিতে হয় না। আমাদের এই যে সহজযান ইহাতে গুরুর উপদেশই লইতে হয়, ইন্দ্রিয় নিরোধের চেষ্টা করা বৃথা, পাপ পরিহারের চেষ্টা বৃথা, কঠোর ব্রত ধারণের চেষ্টা বৃথা, কঠিন কঠিন নিয়মপালন করাও বৃথা।

'শ্রীসমাজতন্ত্রে' বলিতেছেন—

দুষ্করৈর্নিয়মৈস্তীব্রৈর্মূর্ত্তিঃ শুষ্যতি দুঃখিতা।
দুঃখাদ্ধি ক্ষিপ্যতে চিত্তং বিক্ষেপাৎ সিদ্ধিরন্যথা ॥

যদি তুমি কঠোর নিয়ম পালন কর, তাহা হইলে তোমার শরীর শুষ্ক হইবে, ও তোমার নানারূপ দুঃখ উপস্থিত হইবে। দুঃখ উপস্থিত হইলে মন স্থির থাকিবে না, মনস্থির না থাকিলে কখনোই সিদ্ধিলাভ হয় না।

'হেবজ্রতন্ত্রে'ও[৭] বলিতেছে—

রাগেণ বধ্যতে লোকো ব্রাগেণৈব বিমুচ্যতে।
বিপরীতভাবনা হ্যেষা ন জ্ঞাতা বুদ্ধতীর্থিকৈঃ ॥

বিষয়ের আসক্তিতেই লোকে বদ্ধ হয়, আবার সেই আসক্তিতেই লোকে মুক্ত হয়। আসক্তির এই যে বিপরীত ফলদানের ক্ষমতা বুদ্ধতীর্থিকেরা এটা জানিত না, অর্থাৎ, অন্য বৌদ্ধসম্প্রদায়ের লোকেরা ইহা জানে না, আমরা, সহজপন্থীরাই, কেবল জানি।

আবার 'শ্রীসমাজ' বলিতেছেন—

পঞ্চকামান্ পরিত্যজ্য তপোভির্নৈব পীড়য়েৎ।
সুখেন সাধয়েদ্বোধিং যোগতন্ত্রানুসারতঃ ॥

পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিষয়, বিষয়কেই ভোগ বলে, বিষয়কেই কাম বলে। সেই পাঁচটি ভোগ ত্যাগ করিয়া তপস্যার দ্বারা আপনাকে পীড়া দিবে না। যোগতন্ত্রানুসারে সুখভোগ করিতে করিতে বোধির সাধনা করিবে।

সরহপাদ বলিতেছেন—

তনুতরচিত্তাঙ্কুরকো বিষয়রসৈর্যদি ন সিচ্যতে শুদ্ধৈঃ।
গগনব্যাপী ফলদঃ কল্পতরুত্বং কথং লভতে ॥

যখন চিত্ত অল্পে অল্পে বোধির দিকে যায়, তখন সেই চিত্তরূপ ছোটো অঙ্কুরটির গোড়ায় বিষয়রস যদি না সেক কর, কেমন করিয়া সেই অঙ্কুর কল্পতরু হইবে, কেমন করিয়া সে আকাশ ছাইয়া ফেলিবে, কেমন করিয়া সে সকলের বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিবে?

এই-সকল সহজপন্থীর শাস্ত্র স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতেছে যে, যদি তোমার বোধিলাভের ইচ্ছা থাকে, তবে পঞ্চকাম উপভোগ করো।

পঞ্চকাম উপভোগ তো সকলেই করে। তাহার জন্য আবার শাস্ত্র কেন, তাহার জন্য আবার ধর্ম কেন? সে তো সকলে আপনা হইতেই করে? তাহার জন্য আবার গুরু কেন? একটু আছে। মানুষমাত্রেই পঞ্চকামোপভোগ করে। কিন্তু তাহাতে তাহারা পাপপুণ্যে লিপ্ত হয়। কিন্তু যখন বজ্রগুরু বুঝাইয়া দেন যে, সবই শূন্য, কিছুরই স্বভাব নাই, তখনই সহজিয়ারা পঞ্চকামোপভোগ করে ও পাপপুণ্যে লিপ্ত হয় না। তাই দারিকপাদ[৮] বলিলেন—

কিন্তো মন্তে কিন্তো তন্তে কিন্তো রে ঝাণবখানে।
অপইঠানমহাসুহলীণে দুলখ পরমনিবাণেঁ ॥
দুঃখেঁ সুখেঁ একু করিআ ভুঞ্জই ইন্দিজানী
স্বপরাপর ন চেবই দারিক সঅলানুত্তরমাণী ॥ [পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩]

অরে বালযোগি, তোর মন্ত্রেই বা কী? তন্ত্রেই বা কী? ধ্যানেই বা কী? ব্যাখ্যানেই বা কী? তোমার যখন মহাসুখলীলায় প্রতিষ্ঠা নাই, তখন নির্বাণ তোমার পক্ষে দুর্লভ। তুমি গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া পরমার্থ সত্যের সহিত মহাসুখলীলাকে এক করিয়া পঞ্চকাম উপভোগ করো। দায়িক এই উপায়েই পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া সংসারে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহার আত্মপর বোধ নাই।

তিনি এই সঙ্গেই আবার বলিতেছেন—

রাআ রাআ রাআরে অবর রাঅ মোহেরা বাধা
লুইপাঅপএ দারিক দ্বাদশভূঅণেঁ লধা ॥ [পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩]

আর যত রাজা আছেন, তাঁহারা সকলেই বিষয়ের মোহে বদ্ধ। কিন্তু নিজগুরু লুইপাদের প্রসাদে দ্বাদশভুবন অতিক্রম করিয়া দারিক পরমসুখ লাভ করিয়াছেন।

মহাসুখ লাভ করিলে সহজিয়াদের কী অনির্বচনীয় অবস্থা হয়, সে সম্বন্ধে আগমে এই কথা বলে—

ইন্দ্রিয়াণি স্বপন্তীব মনোঽন্তর্বিশতীব চ।
নষ্টচেষ্ট ইবাভাতি কায়ঃ সৎসুখমূর্চ্ছিতঃ ॥

শরীর যখন সৎসুখে মূর্ছিত হয়, তখন ইন্দ্রিয়সকল যেন ঘুমাইয়াই পড়ে, মন মনের ভিতর ঢুকিয়া যায়। শরীরের কোনোরূপ চেষ্টা থাকে না।

এই যে পঞ্চকামোপভোগ—ইহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন্‌টি? সে বিষয়ে 'অনুত্তরসন্ধি'তে এই কথাটি দেখা যায়—

'সর্ব্বাসাং খলু মায়ানাং স্ত্রীমায়ৈব বিশিষ্যতে।
জ্ঞানত্রয়প্রভেদোয়ং স্ফুটমত্রৈব লক্ষ্যতে ॥

সকল মায়ার মধ্যে স্ত্রীমায়াই বড়ো। ইহাতেই তিনটি জ্ঞানের যে প্রভেদ, তাহা স্পষ্ট দেখা যায়। তিনটি জ্ঞান—প্রথম তিনটি শূন্য। সে তিনটি যে কিছুই নয়, তাহা পরিষ্কার করিয়া বুঝা যায় এবং বিরমানন্দ রূপ যে চতুর্থ শূন্য তাহা পাইতে পারা যায়। এই চতুর্থ শূন্যের নাম প্রভাস্বর। ইহাতেই নিরাত্মাদেবীকে কণ্ঠে ধারণ করিয়া চিত্ত মহাসুখে লীন হয়।

সবরপাদ[৯] বলিতেছেন—

তইলা বাড়ির পাসেঁর জোহ্না বাড়ী তাএলা ॥
ফিটেলি অন্ধারি রে অকাশ ফুলিআ ॥
কঙ্গুরি না পাকেলা রে শবরাশবরি মাতেলা
অণুদিণ শবরো কিল্লি ন চেবই মহাসুহেঁ ভেলা ॥

[পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫]

তৃতীয় বাড়ির (সন্ধ্যাভাষায় বাড়ি বলিতে শূন্য বুঝাইল) পাশে জ্যোৎস্না বাড়ি বা জ্যোৎস্না শূন্য। সেখানে জ্ঞানচন্দ্র সর্বদা উদিত। সেখান হইতে সকল অন্ধকার, সকল দুঃখ পলাইয়াছে। সেখানে আকাশপুষ্প সত্যসত্যই ফুটিয়া আছে। সেখানে কাঁকুড় পাকিল না (সন্ধ্যাভাষায় কাঁকুড় শব্দের অর্থ সর্বব্যাপী সুখ; পাকিল না, অর্থাৎ শেষ হইল না। অর্থাৎ, সুখই রহিল)। শবর ও শবরী (বোধিচিত্ত ও নিরাত্মা দেবী) উন্মত্ত হইয়া বিহার করিতে লাগিলেন। শবরের জ্ঞান-চৈতন্য কিছুই রহিল না। তিনি অনুক্ষণ মহাসুখে ডুবিয়া রহিলেন।

এই যে মত ইহা সাধারণ লোককে যে একেবারে মাতাইয়া তুলিয়াছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। লোকে যাহা চায়, সহজিয়ারা তাহাই দিল; কেবল বলিল গুরুর কাছে উপদেশ লও। শুধু কথায় বলিয়াই নিশ্চিন্ত রহিল না। তাহারা নানা রাগ-রাগিণীতে এই-সকল গান গাহিয়া বেড়াইত, এবং দেশের লোককে একেবারে মাতাইয়া তুলিত। তাহারা কী কী যন্ত্র ব্যবহার করিত, জানা যায় না। তাহাদের খোল করতাল ছিল কি না, বলিতে পারা যায় না। তবে একতারা ছিল বলিয়া জানা যায়—প্রমাণ—বীণাপাদ[১০] বলিতেছেন—

সুজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী
অণহা দাণ্ডী বাকি কিঅত অবধূতী ॥
বাজই অলো সহি হেরুঅবীণা
সুন তান্তি ধনি বিলসই রুণা ॥ [পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০]

সূর্য হইলেন লাউয়ের বস্—অর্থাৎ পাকা লাউয়ের শক্ত খোলা, তাহাতে চাঁদ, তাঁত বা তন্ত্রী লাগিল, অণহা অর্থাৎ অনাহতকে দণ্ড করা হইল ও অবধূতী বাকি অর্থাৎ বাজনাওয়ালা হইল। হে সখি ঐ শুন হেরুকের বীণা বাজিতেছে। আর সেই তন্ত্রীধ্বনিতে শুনিয়া [শূন্যতা] ও করুণা বিলাস করিতেছে।

এই যে বীণাধ্বনি ইহা একরকম music of the sphere-এর মতো, অথবা বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির মতো। মিউসিকে যে বীণা ধ্বনিতে, স্বর্গ-মর্ত-পাতাল ভরিয়া যায়, হেরুকের বীণা ধ্বনিতেও ত্রৈধাতুকময় সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া গেল।

তাহারা পটহ বা ঢোল বাজাইত—

বেটিল হাক পড়অ চৌদীশ (ভুসুকুর গান)[১১]

[পূর্বোক্ত, পৃ. ১২]

তাহারা ডমরু ব্যবহার করিত, মাদলও বাজাইত—

অনহা ডমরু বাজএ বীরনাদে (কৃষ্ণাচার্য) [পূর্বোক্ত, পৃ. ২১]

ভবনির্ব্বাণে পড়হ মাদলা

মণ পবণ বেণি করণ্ড কশালা (কৃষ্ণাচার্য) [পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩]

তাহাদের দুন্দুভি ছিল।

জঅ জঅ দুন্দুহি সাদ উছলিআঁ

কাহ্ন ডোম্বী বিবাহে চলিআ (কৃষ্ণাচার্য) [পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩]

তাঁহারা যে-সকল রাগে গান গাহিতেন, তাহার অনেকগুলি রাগ এখনও সংকীর্তনে চলিতেছে।

যথা—রাগ পটমঞ্জরী, রাগ বরাড়ী, রাগ গুঞ্জরী, রাগ শীবরী, রাগ কামোদ, রাগ মল্লারি, রাগ দেশাখ, রাগ ভৈরবী, রাগ মালসী, রাগ গবুড়া, রাগ রামক্রী, রাগ বঙ্গাল ইত্যাদি।

পদকর্তারা সন্ধ্যাভাষায়[১২] গান করিতেন। সন্ধ্যাভাষা অর্থাৎ আলোআঁধারে ভাষা। উপরে কথায় কথায় একরূপ মানে হয়, অথচ ভিতরে অন্যরূপ গূঢ় অর্থ থাকে। ইহাকে রূপক বলিতে চাও, বলো। কিন্তু রূপকে দুই অর্থই প্রকাশ থাকে। বোধিচিত্ত ও নিরাত্মা দেবীর মিলনকে কখনো বিবাহ বলিতেছেন, কখনো তরুলতা সাজাইতেছেন, কখনো হরিণ-হরিণীর ক্রীড়া বলিতেছেন, কখনো দুধ-দোহা বলিতেছেন, কখনো বা শুঁড়িনীর মদ বেচার সহিত তুলনা করিতেছেন, কখনো বা নদীর উপর সাঁকো গড়ার সহিত তুলনা করিতেছেন, কখনো শূন্য ও করুণার মিলন দেখাইতেছেন, কখনো গঙ্গা-যমুনার মাঝে নৌকার সহিত তুলনা করিতেছেন, কখনো ইঁদুরের সহিত তুলনা করিতেছেন। এইরূপ নানা রসে, নানা ভাবে, নানা ছন্দে, নানা অলংকারে তাঁহারা সহজ মত নানা দিকে প্রচার করিয়া বেড়াইতেন।

বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে যাঁহারা গান লিখেন, তাঁহাদের নাম পদকর্তা এবং তাঁহাদের গানের নাম পদ। বৌদ্ধ-সংকীর্তনে যাঁহারা গান লিখিতেন, তাঁহাদিগকেও পদকর্তা বলিব। তাঁহারা যে গান লিখিতেন, তাহার নাম চর্যাপদ বা গীতিকা। তাঁহারা চর্যাপদ ছাড়া আরো পদ লিখিতেন—যেমন বজ্রপদ বা বজ্রগীতিকা, উপদেশপদ বা উপদেশগীতিকা।

তখন অনেক বড়ো বড়ো লোকেও গীতিকা লিখিতেন। যিনি বঙ্গ দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া, তিব্বতে গিয়া বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, সেই দীপংকর শ্রীজ্ঞান বা অতিশাও[১৩] বাংলায় গীতিকা লিখিতেন। যে রত্নাকর শান্তির[১৪] নামে আর্যাবর্তের দার্শনিকেরা ভয় পাইতেন, তিনিও গীতিকা লিখিতেন। অনেক বাঙালি বৌদ্ধ তো গীতিকা লিখিতেনই, এতদ্ভিন্ন আসামি, উড়িয়া ও মৈথিলেরাও গীতিকা লিখিতেন। সহজধর্মের গুরুদিগকে সংস্কৃতে বজ্রগুরু বলিত, বাংলায় বাজিল, বজুল ও বজগু বলিত। লোকে মনে করিত ইহাদের নানারূপ অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। হাঁহারা দাড়িগোঁপ কামাইতেন, মাথায় বড়ো বড়ো চুল রাখিতেন, আলখেল্লা পরিতেন। এখন যেমন আউলেরা,[১৫] তাঁহারাও কতকটা তেমনই গান করিয়া বেড়াইতেন। ইঁহাদিগকে সময়ে সময়ে সিদ্ধাচার্য বলিত। তিব্বত দেশে এখনো সিদ্ধাচার্যের পূজা হইয়া থাকে। অনেক সিদ্ধাচার্যের মূর্তি তাঁহাদের দেশে আছে। লুইপাদ[১৬] সিদ্ধাচার্যদের আদি, তাঁহাকে লোকে সিদ্ধাচার্য বলে। লোকে বলে সর্বসুদ্ধ চুরাশি জন সিদ্ধাচার্য ছিলেন। লুইয়ের বাড়ি বাংলা দেশে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নাই। তিব্বত দেশের সাহিত্যে তাঁহাকে বাঙালি বলিয়া উল্লেখ করা আছে। তিনি মৎস্যের অন্ত্র বা মাছের পোঁটা খাইতে ভালোবাসিতেন, সেইজন্য তাঁহার নাম হইয়াছিল, মৎস্যান্ত্রাদ। রাঢ় দেশে যাহারা ধর্মঠাকুর মানে, তাহারা অনেকেই লুইকেও মানে এবং লুইয়ের উদ্দেশে পাঁটা ছাড়িয়া দেয়। লুইয়ের পূজার দিন তাহারা সেই পাঁটা বলি দেয়। যদি কেহ সেই পাঁটা চুরি করিয়া খায়, তবে তাহার অত্যন্ত অমঙ্গল হয়। নগেনবাবু [নগেন্দ্রনাথ বসু] বলেন, ময়ূরভঞ্জের যে অংশটুকু রাঢ় বলে, সেখানেও লুইয়ের পূজা হইয়া থাকে। লুইয়ের বংশে আরো কেহ কেহ সিদ্ধাচার্য ছিলেন, এবং বাংলায় গান লিখিয়াছিলেন।

এখন বৈষ্ণবদের যেমন আখড়াধারী আছে, সিদ্ধাচার্যেরা যদি তেমনই আখড়াধারী ছিলেন বলিয়া মনে করা যায়, এবং এখন আখড়াধারীদের যেমন অনেক চেলা থাকে সেইরূপ সিদ্ধাচার্যদেরও অনেক চেলা ছিল যদি মনে করা যায়, তাহা হইলে তখন বাংলার কিরূপ অবস্থা ছিল, ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তখন ব্রাহ্মণদিগের এত প্রাদুর্ভাব হয় নাই। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণে তখন হাজার ঘরও ছিল কিনা খুব সন্দেহ। সুতরাং ব্রাহ্মণধর্মের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল বলিয়া বোধ হয় না। সিদ্ধাচার্যগণও তাঁহাদের চেলারা দেশের একরূপ কর্তা ছিলেন। একে তো তাঁহাদের ধর্ম অতি সহজ, মানুষে যাহা চায়, তাই তাঁহারা দিতেন। তাহাও আবার বক্তৃতার ছটায় নয়, শাস্ত্রের দোহাই দিয়া নয়, সংস্কৃতের ব্যাখ্যায় নয়, উপদেশ দিয়া নয়। গানে, নানা সুরে, নানা বাদ্যের সঙ্গে গান করিয়া তাঁহারা লোকদের বলিয়া দিতেন, "বাপুহে সবই তো শূন্য—সংসারও শূন্য, নির্বাণও শূন্য—তবে যে আমি আমি বলিয়া বেড়াই, একটা কেবল ধোকা মাত্র।

"এই ধোকার পশরা নামাইয়া ফেলো। তখন দেখিবে কিছুই কিছু নয়। সুতরাং আনন্দ করো। আনন্দই শেষ থাকিবে। আদিতেও আনন্দ, মধ্যেও আনন্দ, শেষেও আনন্দ।"

এই যে আনন্দময় উপদেশ ইহার ফলে দেশের লোক মাতিয়া উঠিয়াছিল। সে মাতার ফল যে ভালো হয় নাই, তাহা তো আমরা দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু যাঁহারা

মাতাইয়াছিলেন, তাঁহারা খুব ক্ষমতাশালী পুরুষ ছিলেন, মানুষের মনের উপর কিরূপে প্রভুত্ব করিতে হয়, তাহা তাঁহারা বেশ জানিতেন। তাঁহারা গুরুগিরি করিয়া বেশ প্রতিপত্তি লাভ করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু চেলাদের যে কী পরিণাম হইবে, তাহা তাঁহারা একেবারেই ভাবেন নাই। তবে তাঁহারা আমাদের একটা বড়ো উপকার করিয়া গিয়াছেন—তাঁহারা বাংলা ভাষাটিকে সজীব, সতেজ, সরল ও মধুর করিয়া গিয়াছেন এবং বৌদ্ধজগতে তাহাকে একটি উচ্চস্থান দিয়া গিয়াছেন। তজ্জন্য বঙ্গবাসী মাত্রেরই ইঁহাদের উপর কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

ইঁহারা যে সহজধর্মের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, সে ধর্ম এখনো চলিতেছে, তবে ইহার রূপ বদলাইয়া গিয়াছে। তখন সহজিয়ারা আপনারাই সহজভাবে মত্ত থাকিতেন, এখন সহজিয়ারা দেবতাদের সহজভাবে ভোর হইয়া থাকেন। তখন তাঁহারা নিজেই যুগনদ্ধ ক্রীড়া করিতেন, এখন তাঁহারা দেবতাদের যুগনদ্ধ ক্রীড়া দেখিয়াই আনন্দ উপভোগ করেন।

'নারায়ণ'
ভাদ্র, ১৩২২ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. এই বইয়ের পৃ. ৭৭-৭৮ (প্রাসঙ্গিক তথ্য), সূত্র ১ দ্র.

২. যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদ মহাযানের অন্যতম প্রধান সম্প্রদায়। এই মতবাদের প্রবক্তা অসঙ্গ এবং বসুবন্ধু দুই ভাই। জন্ম গান্ধারের রাজধানী পুরুষপুর, আধুনিক পেশোয়ারে (পাকিস্তানের অন্তর্গত)। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে এঁরা অযোধ্যায় নতুন মত প্রবর্তক শাস্ত্র রচনা করেন। এই সম্প্রদায়ের সাধনমার্গকে যোগাচার এবং দর্শনকে বিজ্ঞানবাদ বলা হয়। অসঙ্গ প্রধানত সাধনমার্গের কথা আলোচনা করেছেন, দার্শনিক প্রস্থান সংগঠন করেছেন বসুবন্ধু। অসঙ্গের প্রসিদ্ধ রচনা 'মহাযান সূত্রালঙ্কার' এবং 'মহযান সম্পরিগ্রহশাস্ত্র'। বসুবন্ধুর প্রধান রচনা 'বিংশক-কারিকা-প্রকরণ', 'ত্রিংশিকা-প্রকরণ' এবং 'মধ্যান্ত-বিভঙ্গ-শাস্ত্র'। যোগাচার সম্প্রদায়ের অন্য পণ্ডিতদের মধ্যে প্রসিদ্ধ পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের দিঙ্‌নাগ স্থিরমতি এবং নালন্দার অধ্যাপক, শীলভদ্রের গুরু ধর্মপাল। হিউয়েন্‌-ৎসাঙ নালন্দায় শীলভদ্রের কাছে যোগাচার দর্শন চর্চা করেন। চীনা ভাষায় লেখা তাঁর 'বিজ্ঞপ্তি-মাত্রতা-সিদ্ধি' গ্রন্থে ভারতীয় যোগাচার সম্প্রদায়ের আচার্যদের মতামত ধারাবাহিক ভাবে আলোচনা করেছেন।

বিজ্ঞানবাদ মাধ্যমিক দর্শনেরই পরিণতি। মাধ্যমিকদের মতো বিজ্ঞানবাদীরাও মানেন, পারমার্থিক সত্য অদ্বয়। পরমার্থের সৎ, অসৎ বা অন্য কোনো অভিধা নেই। তার উৎপত্তি, বিনাশ, ক্ষয়বৃদ্ধি নেই। কিন্তু শূন্যতাই পরমার্থ—মাধ্যমিকদের এই তত্ত্বের পরিবর্তে বিজ্ঞানবাদীরা বলেন, বস্তুর অস্তিত্ব নেই এ জ্ঞান যাঁদের হয় তাঁরা চিত্তমাত্রে বা বিজ্ঞানে অবস্থান করেন। চিত্ত ভিন্ন কিছুরই অস্তিত্ব নেই—এই জ্ঞান হলে জানা যায়

চিত্তেরও অস্তিত্ব নেই। বিকল্পজ্ঞান নষ্ট হলে ধীমান্ ধর্মধাতুতে স্থিত হন। শূন্যতার পরিবর্তে এঁরা ধর্মধাতুর ধারণা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ধর্মধাতু প্রত্যক্ষ হলে অদ্বয়জ্ঞান লাভ হয়। বসুবন্ধুর দার্শনিক-প্রস্থানে বিজ্ঞানমাত্রতা পারমার্থিক সত্য এবং বিজ্ঞানের পরিণতি ত্রিবিধ, ১. আলয়বিজ্ঞান, ২. আলম্বন, ৩. বিষয়বিজ্ঞপ্তি। যেসব ধর্ম থেকে জগতের উৎপত্তি, তার বীজস্থান আলয় বিজ্ঞান। স্পর্শ, মনস্কার বা চিত্তের বিষয়মুখী ক্রিয়া, বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা—আলয় বিজ্ঞানের পরিণতি। এরই ফলে জলের ধারার মতো অনবচ্ছিন্ন কার্যকারণ-প্রবাহ বয়ে চলেছে। সংসারের সৃষ্টি হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, আলয়-বিজ্ঞানকে আশ্রয় করে মননাত্মক আলম্বনের উদ্ভব হয়। আলম্বনের পরিণতি—আত্মদৃষ্টি, আত্মমোহ, আত্মমান, আত্মস্নেহ—এই চার রকমের ক্লেশ। বিজ্ঞানের তৃতীয় পরিণতি বিষয়-বিজ্ঞপ্তি। বিষয় ছটি—রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শনীয় ও ধর্মাত্মক। চরাচরে যা-কিছু প্রতিভাত সবই বিষয়-বিজ্ঞপ্তিমাত্র। "সর্ব্বং বিজ্ঞপ্তিমাত্রকম্।" বিজ্ঞানবাদের সার কথা—জ্ঞেয় নিরপেক্ষভাবে বিজ্ঞান বা জ্ঞানের অস্তিত্ব সম্ভব। জ্ঞান বিকার প্রাপ্ত হলে বিষয় সম্পর্কে ধারণার উৎপত্তি হয়। দ্বৈততা এসে পড়ে। বিজ্ঞানের পরিণাম স্বরূপ জগৎ চরাচর সত্য নয়। এই আরোপিত দ্বৈততা থেকে মুক্ত জ্ঞানই বিশুদ্ধ সৎ বস্তু। বিজ্ঞানমাত্রতাই পারমার্থিক সত্য।

৩. সরহ নামে একাধিক বৌদ্ধ তান্ত্রিক-সাধক ছিলেন। চুরাশি সিদ্ধাচার্যের তালিকায় সরহ ওরফে রাহুলভদ্রের নাম আছে। অন্যত্র তাঁর নামান্তর সরোজবজ্র, সরোরুহবজ্র, পদ্মবর্জ্র। শাস্ত্রীমশায় 'বৌদ্ধগান ও দোহা'য় সরোজবজ্রের 'দোহাকোষ' প্রকাশ করেছেন। তেঙ্গুরের তালিকায় সরহের নামে দোহাকোষ, গীতিকা ও বজ্রযান-সাধনা বিষয়ক ২১ খানি বইয়ের নাম আছে। যেমন 'দোহাকোষগীতি', 'দোহাকোষনামচর্যাগীতি', 'দোহাকোষনামমহামুদ্রা-উপদেশ', 'বসন্ততিলকদোহাকোষগীতিকা', 'বাক্‌কোষরুচিরস্বরবজ্রগীতিকা', 'ত্রৈলোক্যবশংকর-অবলোকিতেশ্বরসাধন' ইত্যাদি। সব বই একজনের লেখা নয়। তিব্বতি লেখক সুম্‌পা তাঁর 'পাগ্-সাম্-জোন্-জাং' বইয়ে একজন সরহের পরিচয় দিয়েছেন। প্রাচ্য দেশের রত্নী শহরে এঁর জন্ম। কোনো ব্রাহ্মণ ও ডাকিনীর ছেলে। চন্দনপাল নামে কোনো রাজার আমালের এই সরহ ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধবিদ্যায় পারংগম ছিলেন। ইনি রাজা রত্নপাল ও তাঁর মন্ত্রীদের ধর্মান্তরিত করেন। নালন্দায় মহাচার্য হন। ওড়িশায় মন্ত্রযান শেখেন এবং মহারাষ্ট্রে গিয়ে এক যোগিনীর সঙ্গে সাধনা করে 'সিদ্ধ' হয়ে সরহ নামে পরিচিত হন। তিব্বতি ঐতিহাসিক তারনাথ দু জন সরহকে চিহ্নিত করেছেন। বয়সে যিনি বড়ো তিনি রাহুলভদ্র এবং যিনি ছোটো তিনি শাবরি। নেপালে নকল করা 'দোহাকোষ'-এর প্রাচীনতম পুথির তারিখের হিসাবে দোহাকার সরহ একাদশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে বর্তমান ছিলেন অনুমান করা যায়। 'বৌদ্ধগান ও দোহা'য় ২২, ৩২, ৩৮, ৩৯ সংখ্যক পদ সরহের রচনা। উদ্ধৃত অংশ ২২ সংখ্যক পদের প্রথম আট চরণ। দ্র. *S-M-II*, pp. xliv, cxvi; *H-B-1*, pp. 339-42, 348-49; বৌ-গা-দো, পৃ. ২৬-২৭; চ-গী-প, পৃ. ১৯-২০।

৪. 'বৌদ্ধগান ও দোহা'র ৩৫ সংখ্যক এই পদটির রচয়িতা ভাদে। তিব্বতি ঐতিহ্যে ইনি একজন আচার্য, নামান্তর ভাণ্ডারিন। তিব্বতে ভদ্রচন্দ্র, ভদ্রদত্ত, ভদ্রবোধি নাম পাওয়া গেছে। এঁদের কোনো একজন ভাদে হওয়া সম্ভব। ভাদের রচনা 'সহজানন্দ-দোহাকোষ-গীতিদৃষ্টি'র তিব্বতি অনুবাদ আছে। তারনাথ ভাদেপাদকে জালন্ধরি এবং কৃষ্ণাচার্যের শিষ্য বলেছেন। দ্র. চ-গী-প, পৃ. ২৩-২৪।

৫. এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত 'শ্রীসমাজতন্ত্র', 'হেবজ্রতন্ত্র', নাগার্জুনপাদের 'বজ্রজাপ', 'সরহপাদপ্রবন্ধ', 'যোগরত্নমালা' প্রভৃতি বইয়ের শ্লোকগুলি 'বৌদ্ধগান ও দোহা'র অন্তর্গত মুনিদত্তর 'চর্য্যাচর্য্য-টীকা'য় উদ্ধৃত আছে।

'শ্রীগুহ্যসমাজতন্ত্রম্' বা 'তথাগতগুহ্যক'। সংক্ষেপে 'শ্রীসমাজতন্ত্র'। বৌদ্ধ-তন্ত্রের অন্যতম আদি শাস্ত্র। চীনা ভাষায় অনূদিত হয়ে চীনা ত্রিপিটকের অন্তর্গত হয় দশম শতকে। এর তিব্বতি অনুবাদ তেঙ্গুর সংগ্রহের অন্তর্গত। তেঙ্গুরের তালিকায় 'শ্রীসমাজতন্ত্রে'র উপরে লেখা ৫২ খানি টীকার উল্লেখ আছে। টীকাকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাগার্জুন, কৃষ্ণাচার্য, লীলাবজ্র, রত্নাকরশান্তি, শান্তিদেব প্রভৃতি। টীকার সংখ্যা এবং পরবর্তী বৌদ্ধতান্ত্রিক গ্রন্থে ধারাবাহিকভাবে 'শ্রীসমাজতন্ত্র'কে প্রামাণিক শাস্ত্র হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বিনয়তোষ ভট্টাচার্য অনুমান করেছেন, যোগাচার দর্শনের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত অসঙ্গ খৃষ্টীয় তৃতীয় বা চতুর্থ শতকে 'শ্রীগুহ্যসমজাতন্ত্র' রচনা করেছিলেন। ভিন্‌ট্যরনিট্‌জ এই অনুমান ভিত্তিহীন মনে করেন। দ্র. Benoytosh Bhattacharyya ed. *Guhyasamaja Tantra or Tathagataguhyaka,* G-O-S, No. LIII; M. Winternitz, "Notes on the Guhyasamaj-Tantra and the Age of the Tantras", *I-H-Q,* March 1933 (Mm. Haraprasad Shastri Memorial Vol.).

৬. 'যোগরত্নমালা-নাম হেবজ্র-পঞ্জিকা' 'হেবজ্রতন্ত্রে'র টীকা। লেখক কৃষ্ণাচার্যপাদ। তেঙ্গুরের তালিকায় কৃষ্ণাচার্যের নামে অনেক বইয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। সব বই একজনের লেখা হতে পারে না। সব গবেষকই একাধিক কৃষ্ণাচার্যের অস্তিত্ব মানেন। 'যোগরত্নমালা' স্নেল্‌গ্রোভ তাঁর 'হেবজ্রতন্ত্রে'র সংস্করণের সঙ্গে ছেপেছেন। তাঁর ধারণা বইটি খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে রচিত। 'বৌদ্ধগান ও দোহা'য় কৃষ্ণাচার্যের নামে ১২টি পদ আছে। এই প্রবন্ধে পরে কৃষ্ণাচার্যের ১১ এবং ১৯ সংখ্যক পদ থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হয়েছে। দ্র. D. L. Snellgrove, *The Hevajra Tantra,* Part I and II, London Oriental Series : Vol. 6, London 1959; *I-B-I,* pp. 157-59.

৭. 'হেবজ্রতন্ত্র' বজ্রযানের অন্যতম মূল শাস্ত্র। প্রচলিত পাঠ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষ দিকে রচিত। বইটি ২ কল্পে বিভক্ত, ৭৫০ শ্লোকে সম্পূর্ণ। ভাষা সংস্কৃত, কিন্তু মাঝে মাঝে অপভ্রংশ আছে। মূলত এটি অপভ্রংশে রচিত এবং পরে সংস্কৃতে রূপান্তরিত হয়ে থাকতে পারে। 'হেবজ্র-পিণ্ডারথ-টীকা' নামে এই শাস্ত্রের একটি টীকার লেখক বজ্রগর্ভ ৫ লক্ষ শ্লোকে সম্পূর্ণ আদি 'হেবজ্রতন্ত্রে'র উল্লেখ করছেন। সে পূর্ণতর পাঠ অবশ্য পাওয়া যায় নি। স্নেল্‌গ্রোভ অনুমান করেছেন, প্রচলিত পাঠ বজ্রগর্ভেরই রচনা। 'হেবজ্রতন্ত্র' প্রচার করেন সরোরুহবজ্র। তেঙ্গুরের তালিকায় তাঁর লেখা 'হেবজ্রসাধন', 'হবজ্র-মণ্ডল-বিধি', 'হেবজ্র-তন্ত্র-পঞ্জিকা-পদ্মিনী-নাম' প্রভৃতি ৭ খানি টীকার উল্লেখ আছে।

হেবজ্র, নামান্তরে হেরুক মূর্তির পূজা প্রচলিত ছিল। অভয়াকর গুপ্তের 'নিষ্পন্নযোগাবলী'তে হেরুকের সঙ্গে তার শক্তির মূর্তি থাকলে হেবজ্র নামে উল্লেখ করা হয়েছে। এই বইয়ে হেবজ্রের চার রকম রূপ বর্ণিত; দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ, ষড়্‌ভুজ এবং ষোড়শ ভুজ। সবই শক্তি সমেত যুগনদ্ধ মূর্তি। দ্র. পূর্বোক্ত সূত্র।

৮. চর্যাগীতির ৩৪ সংখ্যক পদ "সুনকরুণরি অভি ন-চারেঁ কাঅবাক্‌চিঅ" দারিকের রচনা। শাস্ত্রীমশায় নেপালে এক লামার কাছ থেকে এঁর আর-একটি পদ "ফোইরে বংশা বাজিরে বীণা" সংগ্রহ করেছিলেন। দারিক নিজেকে লুইপাদের "পাঅপএ"—শ্রীচরণের অনুগ্রহে দ্বাদশ ভুবনে লব্ধ—বা সিদ্ধ বলেছেন। তেঙ্গুরের তালিকায় তাঁর লেখা 'কালচক্রতন্ত্র-

রাজস্য-সেকপ্রক্রিয়াবৃত্তি বজ্রপাদউদ্‌ঘাটিনীনাম', 'চক্রসম্বরসাধনত্ত্ব-সংগ্রহনাম', 'চক্রসম্বরমণ্ডলবিধিতত্ত্ব-অবতারনাম', 'চক্রসম্বরস্তোত্র-সর্বার্থ-সিদ্ধিবিশুদ্ধচূড়ামণিনাম', 'যোগানুসারিণীনাম-বজ্রযোগিনীটীকা', 'বজ্রযোগিনীপূজাবিধি', 'কংকালতারণসাধন', 'ওড্ডিয়ানবিনির্গত-মহাগুহ্যতত্ত্ব-উপদেশ', 'সপ্তমসিদ্ধান্ত', 'তথতাদৃষ্টি', 'প্রজ্ঞাপারমিতাহৃদয়সাধন',—এই এগারোখানি বইয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'ওড্ডিয়ানবিনির্গত-মহাগুহতত্ত্ব-উপদেশ' বইয়ের নামের সঙ্গে দারিককে লীলাবজ্রের শিষ্য বলে উল্লেখ করা আছে। লীলাবজ্র বজ্রযোগিণী-সাধনের অন্যতম প্রবর্তক, 'অদ্বয়সিদ্ধি'র লেখিকা লক্ষীংকরার শিষ্য।

৯. সবরপাদ, শবরীপাদ বা শবরীশ্বর চুরাশি সিদ্ধাচার্যের অন্যতম। সাধনমালায় এঁর 'সিতকুরুকুল্লাসাধন'এবং 'বজ্রযোগিন্যারাধনবিধি'—এই দুটি নিবন্ধ আছে। বিনয়তোষ ভট্টাচার্য মনে করেন, সবরপাদ বজ্রযোগিনী উপাসনার প্রবর্তক। তেঙ্গুরের তালিকায় এঁর 'বজ্রযোগিনী-সাধন', 'কূর্মপাদসিদ্ধি-সাধন', 'বজ্রযোগিনী-গণচক্র-বিধি' প্রভৃতি ১৬ খানি বইয়ের উল্লেখ আছে। 'বৌদ্ধ গান ও দোহা'য় সংকলিত ২৮ ও ৫০ সংখ্যক পদ সবরপাদের রচনা। উদ্ধৃত অংশ ৫০ সংখ্যক পদ থেকে তোলা হয়েছে। দ্র. *S-M-II*, p. cxiv; চ-গী-প, পৃ. ২১-২২।

১০. তেঙ্গুরের তালিকায় 'গুহ্য-অভিষেক-প্রক্রিয়া' নামে বীণাপাদের একখানি বইয়ের নাম আছে। টীকাকার মুনিদত্ত 'বৌদ্ধগান ও দোহা'য় সংকলিত এই ১৭ সংখ্যক পদটি বীণাপাদের রচনা বলেছেন, কিন্তু তৃতীয় পঙ্‌ক্তিতে 'বীণা' শব্দ যেভাবে আছে তা কবির ভণিতা মনে হয় না। পদটিতে বীণা যন্ত্রের গড়নের ও নাচগানের রূপক ব্যবহার করা হয়েছে। দ্র. চ-গী-প, পৃ. ১৯।

১১. 'বৌদ্ধগান ও দোহা'য় ভুসুকুর লেখা ৮টি পদ আছে। এই চরণটি ৬ সংখ্যক পদ থেকে উদ্ধৃত।

১২. "শব্দটিতে "ধ্যৈ" (বা 'ধা') ধাতুর অর্থ প্রকট আছে। যে ভাষায় বা যে শব্দে অভীষ্ট অর্থ অনুধ্যান করিয়া অর্থাৎ মর্মজ্ঞ হইয়া বুঝিতে হয় (সম্ + ধ্যে), অথবা যে ভাষায় বা শব্দে অর্থ বিশেষভাবে নিহিত (সম্ + ধা) তাহাই 'সন্ধ্যা' (অথবা 'সন্ধা') ভাষা। একটি চর্যার (১২) ব্যাখ্যার প্রারম্ভে মুনিদত্তের উক্তিতে এই কথারই সমর্থন আছে।—'পুনরপি তমেবার্থং দ্যূতক্রীড়াধ্যানেন প্রকথয়ন্তি কৃষ্ণাচার্যপাদাঃ।'

"সন্ধ্যাভাষা যে বৌদ্ধ যোগীদের রচনারই বৈশিষ্ট্য ছিল এ দাবি তাঁহারা করেন নাই। অদ্বয়বজ্র এমনও বলিয়াছেন যে,, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা বৈদিক মন্ত্রের সন্ধ্যা-ভাষার্থ না জানিয়া পশু আলম্ভন করায় তাহাদের পাপ সঞ্চিত হয়। 'তয়া শ্বেতচ্ছাগনিপাতনয়া নরকাদিদুঃখমনুভবন্তি। সন্ধাভাষমজা নানত্বাৎ চ।" (চ-গী-প, পৃ. ৩০-৩১)। প্রবোধচন্দ্র বাগচী দেখিয়েছেন 'সন্ধাভাষা'ই ঠিক প্রয়োগ, 'সন্ধ্যাভাষা' নয়। দ্র. "The Sandhabhasa and Sandhavacana", *Studies In The Tantras,* pt, I, Calcutta Universtiy 1975.

১৩. বাংলার বৌদ্ধ ঐতিহ্যে দশম-একাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম মনীষী দীপংকরশ্রী জ্ঞান অতিশ-এর জন্ম ৯২৮ খৃষ্টাব্দে। বিক্রমণিপুর বা বিক্রমপুরের, মতান্তরে বজ্রাসনের পুবে জাহোর বা সাহোরের রাজা কল্যাণশ্রী ও প্রভাবতীর মেজো ছেলে। ছেলেবেলার নাম চন্দ্রগর্ভ। অল্প বয়সে তিনি আচার্য জেতারির সংস্পর্শে আসেন। তাঁর সময়ে ভারতে বৌদ্ধদর্শনের মাধ্যমিক ও যোগাচার শাখার প্রতিপত্তি অম্লান ছিল, অন্যদিকে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা সূচিত

হয়েছিল। চন্দ্রগর্ভ কৃষ্ণগিরি বিহারে রাহুল গুপ্তের কাছে তান্ত্রিক তত্ত্ব শেখেন, তাঁর নাম হয় গুহ্যজ্ঞানবজ্র। কিন্তু তান্ত্রিক আচারে আবদ্ধ না থেকে তিনি হীনযান ও মহাযান ধারার এবং ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য ও যোগ দর্শনের পূর্ণ জ্ঞান আয়ত্ত করেন। ওদন্তপুরী বিহারের মহাসাংঘিক আচার্য তাঁর নাম দেন দীপংকরশ্রী জ্ঞান; কল্যাণশ্রীর নামের সাদৃশ্যে দীপংকরশ্রী নামই স্বাভাবিক, জ্ঞান সেকালের পণ্ডিতদের প্রচলিত উপাধি। মহিলা পণ্ডিতের উপাধি হত জ্ঞান-ডাকিনী। দীপংকরশ্রীর উদ্দেশে রচিত স্তোত্রে তাঁর প্রধান তিব্বতি শিষ্য হব্রোম্-স্তোন-পা (Hbrom-ston-pa) তাঁকে দীপংকরশ্রী নামেই উল্লেখ করেছেন (দ্র. *A-T,* pp. 371-76)। তিব্বতে এবং মঙ্গোলিয়ায় তাঁর অতিশ বা অতীশ নাম প্রচলিত। তিব্বতে বলা হয় জো-বো-র্জে (Jo-bo-rje)-অতিশ, মহাপ্রভু অতিশ। অতিশ সংস্কৃতমূলক শব্দ, সম্ভবত 'অতিশয়' অর্থে প্রযুক্ত। তিব্বতি প্রতিশব্দ ফুল-হব্যুঙ্, (phul-hbyun), তুরীয় দশাপ্রাপ্ত। ভারতে থাকতেই দীপংকরশ্রী অতিশ নামে পরিচিত ছিলেন। নগ্-ছো লো-চা-বা (Nag-tsho lo-tsa-ba) বিক্রমশীল মহাবিহারে ভিখারি বালকদের ভালা হো ও নাথ অতিশ' সম্বোধন শুনে তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন (দ্র. *I-P-L-S,* p 65)। অতিশ ১২ বৎসর বিক্রমশীল মহাবিহারে দ্বার-পণ্ডিত নারো-পার এবং ২ বৎসর বজ্রাসনে মহাবিনয়ধর শীল-রক্ষিতের ছাত্র ছিলেন। তারপরে সুবর্ণদ্বীপে (আধুনিক সুমাত্রা) যান সমকালীন বৌদ্ধজগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ধর্মকীর্তি বা ধর্মপালের কাছে পাঠ নিতে। মহাযান বৌদ্ধদর্শনের বিভিন্ন শাখায় গভীরতর জ্ঞান উপার্জন করে ১২ বৎসর পরে দেশে ফেরেন। তখন তাঁর বয়স ৪৪ বৎসর। দেশে ফেরার কিছুদিনের মধ্যে রাজা মহীপালের আহ্বানে ১০২৫/২৬ খৃস্টাব্দে বিক্রমশীল মহাবিহারে মহাচার্য পদে যোগ দেন। ধর্ম সংস্কারের জন্য তিব্বতের রাজা য়ে-শেস্হওদ্ (Ye-seshod)-এর প্রতিনিধি অতিশকে তিব্বতে নিয়ে যাবার চেষ্টায় ব্যর্থ হন। য়ে-শেস্-এর মৃত্যুর পরে তাঁর ভাইপো ব্যঙ্-ছুব্-হওদ্ (Byan-chub hod) রাজা হয়ে নগ্ ছো লো-চা-বা-কে পাঠালেন। তাঁর চেষ্টায় অতিশ তিব্বতে যেতে রাজি হলেন। অতিশ দেশ ছেড়ে যাবেন জেনে মহাবিহারের স্থবির রত্নাকরশান্তি বলেছিলেন, "ভারতীয়দের পক্ষে অতিশ চোখের মতো। সে চলে গেলে আমরা অন্ধ হয়ে যাব।" ১০৪০ খৃস্টাব্দে অতিশ নেপালের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন, তখন নয়-পালের রাজত্বকাল। এক বৎসর নেপালে থেকে ১০৪২য়ে তিব্বতে পৌঁছলেন। জীবনের শেষ ১৩ বৎসর কঠোর পরিশ্রম করে তিনি তিব্বতের ধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের পত্তন করেন। তিব্বতে তাঁর মূল কাজ 'বুদ্ধ-শিক্ষা' বা 'বকহ-গ্দমস্-পা (Bkah-gdams-pa) নামে নতুন ধর্ম-সম্প্রদায় গঠন এবং এই সম্প্রদায়ের শাস্ত্রগ্রন্থ 'বোধিপথ-প্রদীপ' রচনা। এই গ্রন্থে তিনি হীনযান', মহাযান ও তান্ত্রিক দর্শন এবং সাধন পদ্ধতির সমন্বয় সাধন করেন। "By systematizing the vital principles of all Buddhist Scriptures into a whole, by combining the ways of cultivation of the two main schools, the one known for its profundity (the school of the Noumenal) and the other for its extensiveness (the School of the Phenomenal), and by synthesizing the teachings of Nagarjuna, Asanga and Santideva, this *Sastra* provides a unique broad path for obtaining good births and emancipation; and it is the key to the essentials of all sutras and *Sastras."* (*E-B,* Vol, III, p. 216)। অতিশ এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ শিষ্যমণ্ডলীর প্রভাবে সমগ্র তিব্বতে ক্রমে শুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম গৃহীত হয় এবং তিনি পূজ্য দেবতার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন।

তেঙ্গুরের তালিকায় লেখক ও অনুবাদক রূপে একাধিক দীপংকরের নাম মিশে আছে। যেমন দীপংকর-ভদ্র, ইনি একজন তান্ত্রিক লেখক। দীপংকর-রাজ বা দীপংকর-চন্দ্রও ভিন্ন লেখকের নাম। অতিশের রচনা বলে চিহ্নিত করা যায় ১৯৪খানি বই। এর মধ্যে ৩৮খানিতে তাঁর নাম আছে শুধু লেখক রূপে, তিনি লিখেছেন এবং অনুবাদও করেছেন ৭৯খানি বই। আর অন্য লেখকের বই অনুবাদ করেছেন ৭৭খানি। ভারতে লুপ্ত হয়ে যাওয়া অনেক বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ তিনি তিব্বতে আবিষ্কার করেন। বৌদ্ধবিদ্যা-চর্চার ইতিহাসে এই সমন্বয়পন্থী মনীষীর মূল রচনা, অনুবাদ ও টীকা বিশিষ্ট সম্পদ।

১০৫৪ খৃষ্টাব্দে নবম চান্দ্র মাসের ১৮ তারিখে লাসার কাছে স্‌ঞে-থঙ্-এ (Snethan) তাঁর মৃত্যু হয়।

অতিশের উদ্দেশে নিবেদিত একটি তিব্বতি প্রশস্তি-শ্লোক—

মান্যবর আসেন নি যতদিন
তিব্বতের মানুষ বাস করত আঁধারে, দৃষ্টিহীনের মতো;
যে-ক্ষণে এলেন তিনি, সেই প্রজ্ঞাবান্ মহাজ্ঞানী,
জ্ঞানসূর্যের উদয় হল এদেশে।

১৪. এই বইয়ে "রত্নাকর শান্তি" প্রবন্ধ দ্র.

১৫. এই বইয়ের পৃ. ২৬১ পৃষ্ঠায় সূত্র ২০ দ্র.

১৬. আদি সিদ্ধাচার্য লুই বাংলা সাহিত্যের প্রথম কবি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আবিষ্কার চর্যাগীতির প্রথম পদ 'কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল' লুইয়ের রচনা। তাঁর লেখা আর-একটি পদ 'ভাব ন হোই অভাব ণ জাই' (২৯ সংখ্যক)। লুইপাদ, লূয়ীপাদ লূয়ীচরণ—এইভাবেও তাঁর উল্লেখ পাওয়া যায়। বাংলা দেশে মহাযান বৌদ্ধধর্মের বিবর্তিত শাখা সহজযানের সাধকদের মধ্যে লুইয়ের নাম অগ্রগণ্য, ইনি তিব্বতে আদি সিদ্ধাচার্যরূপে স্বীকৃত। এঁর জীবৎকাল সম্পর্কে মতান্তর আছে। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেন, সিদ্ধাচার্যদের আবির্ভাবকাল সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রবোধচন্দ্র বাগচীর মতে দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে। তিব্বতি ভাষায় অনূদিত লুইয়ের পাঁচখানি বইয়ের নাম পাওয়া যায় : ১. "বজ্রসত্ত্বসাধন', ২. 'বুদ্ধোদয়', ৩. 'ভগবদভিসময়', ৪. 'অভিসময়বিভঙ্গ', ৫. 'তত্ত্বস্বভাবদোহাকোষগীতিকাদৃষ্টি'। 'অভিসময়বিভঙ্গ' বইটির সহ-রচয়িতা এবং তিব্বতি ভাষায় অনুবাদক রূপে দীপংকরশ্রী জ্ঞানের নাম থাকায় লুইকে তাঁর বর্ষীয়ান্ সময়কালীন মনে করা যায়। দীপংকরশ্রীর জন্ম ৯৮২ খৃষ্টাব্দে। এই সূত্র অনুসারে লুই একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বর্তমান ছিলেন ধরে নেওয়া যায়। লুই নামটির তিব্বতি রূপান্তর মৎস্যান্ত্রাদ, মৎস্যোদর, মচ্ছন্দ্রনাথ, মচ্ছেন্দ্র। পূর্ণতর তথ্যের জন্য দ্র. *H-B-I* pp. 337-51; *O-R-C,* pp. 41-45, 444-45; *S-M-II,* pp. xxxviii-ix; *B-E,* p. 69; বা-ই, পৃ. ৭২০; চ-গী-প, ভূমিকা।

৮

বৌদ্ধধর্মের অধঃপাত

সহজযানের কথা গত মাসে বলিয়াছি। সহজযানের ফল যে অতি বিষময় হইয়াছিল তাহা বোধ হয় তাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। যে পঞ্চকামোপভোগ নিবারণের জন্য বুদ্ধদেব প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন, যে চরিত্র-বিশুদ্ধি বৌদ্ধধর্মের প্রাণ, যে চরিত্র-বিশুদ্ধির জন্য হীনযান হইতেও মহাযানের মহত্ত্ব, যে চরিত্র-বিশুদ্ধির জন্য আর্যদেব[১] 'চরিত্র-বিশুদ্ধি-প্রকরণ' নামে গ্রন্থই রচনা করিয়া গিয়াছেন, সহজযানে সেই চরিত্র-বিশুদ্ধি একেবারেই পরিত্যাগ করিয়া দিল। বৌদ্ধধর্ম সহজ করিতে গিয়া, নির্বাণ সহজ করিতে গিয়া, অদ্বয়বাদ সহজ করিতে গিয়া, সহজযানীরা যে মত প্রচার করিলেন, তাহাতে ব্যভিচারের স্রোত ভয়ানক বাড়িয়া উঠিল। ক্রমে বৌদ্ধধর্ম 'নেড়ানেড়ি'র দলে গিয়া দাঁড়াইল। সহজযানীরা সন্ধ্যাভাষায়[২] গান লিখিতে আরম্ভ করিলেন। সন্ধ্যাভাষার অর্থ আলোআঁধারি ভাষা। কানে শুনিবামাত্র একরকম অর্থ বোধ হয়, কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে তাহার গূঢ় অর্থ অতি ভয়ানক। তাঁহারা দেহতত্ত্বের গান লিখিতে আরম্ভ করিলেন। সমস্ত জগৎব্রহ্মাণ্ড এই দেহের মধ্যেই আছে, তাহাই দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। সুতরাং দেহে আকাশ, কামধাতু, রূপধাতু, অরূপধাতু, সুমেরু সবই রহিল। যে বোধিচিত্ত মহাযান মতে নির্বাণ পাইবার আশায় ক্রমেই আপনার উন্নতি করিতেছিলেন, দেহতত্ত্বের মধ্যে আসিয়া তাহার যে কী দশা হইল তাহা আর লিখিয়া জানাইব না। জানাইতে গেলে সভ্যতার সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। দেশের লোকে এই ইন্দ্রিয়াসক্ত বৌদ্ধদিগকে কী চক্ষে দেখিত তাহা যদি জানিবার ইচ্ছা থাকে, 'প্রবোধচন্দ্রোদয়ে'র[৩] তৃতীয় অঙ্কটি একবার মন দিয়া পড়িয়া দেখিবেন। ঐ নাটকখানি ১০৯০ হইতে ১১০০ খৃস্টাব্দের মধ্যে লেখা হয়। উহাতে বৌদ্ধ ও জৈন যতিদের যে 'কেচ্ছা' দেওয়া আছে, তাহা পড়িলে অবাক হইয়া যাইতে হয়। বৌদ্ধ-ভিক্ষুরা তখনো খুব বড়োমানুষ, কাষায় বস্ত্র অথবা ছোবানো কাপড় পরেন; কিন্তু সে রেশমের কাপড়। পুথি পড়েন—সে পুথির পাটায় সোনালি কাজ করা; যে কাপড়ে পুথি বাঁধা থাকে, তাহা রেশমের, তাহার উপর নানা রকম কাজ করা। ভিক্ষুরা তখনো খুব বাবু, বিলাসী ও তাহার উপর অত্যন্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত।

এই অধঃপাতের একটা দিক। আর-একটা দিক হইতে অধঃপাতের কারণ দেখাই। মহাযান-ধর্ম খুব উঁচু'ধর্ম—সেকথা পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু মহাযান বুঝিতে, আয়ত্ত করিতে ও মহাযানের মতো কর্ম করিতে বহুকাল লাগে, অনেক পরিশ্রম করিতে হয়—অনেক পড়িতে হয়—অনেক ভাবনাচিন্তা করিতে হয়। ততটা সকলে পারিয়া উঠিত না।

মহাযানের আচার্যেরা ইহার জন্য একটা সহজ পন্থা বাহির করিয়া দিয়াছিলেন—তাঁহারা বলিয়া দিয়াছিলেন, তোমরা 'ধারণী' মুখস্থ করো—'ধারণী' জপ করো—ধারণীর পুথি পূজা করো।[৪] তাহা হইলেই তোমাদের মহাযানের পাঠ, স্বাধ্যায়—যোগ—সকলের ফল হইবে। মনে করো 'প্রজ্ঞাপারমিতা' একখানি বৃহৎ গ্রন্থ—পড়িতে অনেক দিন লাগে—আয়ত্ত করিতে আরো দিন লাগে—তাহার মতো কাজ করিতে আরো দিন লাগে। আচার্য বলিয়া দিলেন, 'প্রজ্ঞাপারমিতা হৃদয়-ধারণী'—মুখস্থ করো—তাহা হইলেই তোমার প্রজ্ঞাপারমিতা পাঠের সমস্ত ফল হইবে। এইরূপ যদি '"ওঁ নমঃ সমস্তবুদ্ধানাং অপ্রতিহত-শাসনানাং, ওঁ কীলে কীলে তথাগতোহধ্যবসান্তে বরদে উত্তমোত্তম-তথাগতে ভব ক্রীং ফট্ স্বাহা"[৫]—এইটি কণ্ঠস্থ করো, তাহা হইলে 'গণ্ডব্যূহসূত্র'[৬] পাঠের ফল হইবে।

"ওঁ নমঃ সমস্তবুদ্ধানাং অপ্রতিহতশাসনানাং, ওঁ ধুণু ধুণু ক্রীং ফট্ স্বাহা"[৭]—এই ধারণী পাঠ করিলে 'সমাধিরাজসূত্র'[৮] পাঠের ফল হইবে।

"ওঁ নমঃ সমস্তবুদ্ধানাং অপ্রতিহতশাসনানাং, ওঁ মণিধরি বাজ্রণি মহাপ্রতিসরে ক্রীং ক্রীং ফট্ ফট্ স্বাহা"[৯]—এই মন্ত্র পাঠ করিলে 'মহাপ্রতিসরা'[১০] পাঠের ফল হইবে।

এইরূপে যে কত ধারণী তৈয়ার হইয়াছিল তাহার সংখ্যা করা যায় না। এক 'বৃহদ্ধারণী সংগ্রহে' আমরা চারি শত এগারোটি ধারণী পাইয়াছি। ক্রমে ধারণী মুখস্থ করাও কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। তখন এক অক্ষর—দুই অক্ষর—মন্ত্র হইতে লাগিল। মন্ত্রপাঠ, মন্ত্রজপ, বৌদ্ধধর্মের শেষ অবস্থা হইয়া দাঁড়াইল। তখন 'হুং' ফট্' 'ক্রীং' 'স্বাহা' এই-সকল শব্দের প্রচুর ব্যবহার হইতে লাগিল। বৌদ্ধেরা ইহাতেই আপনাদের কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। যে মহাযান-ধর্ম চিন্তাশক্তির চরম সীমায় উঠিয়াছিল মন্ত্রযানে তাহা ক্রমে 'হুং' 'ফট্' 'স্বাহা'য়—দাঁড়াইল। ইহা কি অধঃপাত নহে।

বৌদ্ধধর্মে দেবতার সংস্রব নাই— দেবতার পূজা-অর্চনা হীনযানে ছিলই না। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর কতদিন পরে বুদ্ধদেবের মূর্তি বিহারে প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল, তাহা লইয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের এখনো মতভেদ আছে—কেহ বলেন, চারি শত বৎসর পরে, কেহ বলেন, পাঁচ শত বৎসর পরে। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে গেলে গান্ধার-শিল্পের কুঠরিতে প্রথম বুদ্ধদেবের মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলি বুদ্ধের পাঁচ-ছয় শত বৎসর পরে নির্মিত হয়। মহাযানেও শাক্যসিংহর মূর্তি বিহারে বিহারে থাকিত। তাঁহারা উহাকে নির্বাণ লাভের উপায় বলিয়া মনে করিতেন। ক্রমে একটি-একটি করিয়া ধ্যানীবুদ্ধ[১১] আসিতে লাগিলেন। প্রথম 'অমিতাভ', তারপর 'অক্ষোভ্য', তারপর 'বৈরোচন', তারপর 'রত্ন-সম্ভব', তারপর 'অমোঘসিদ্ধি' আসিয়া জমিলেন। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের মগধ-কুঠরিতে অনেকগুলি চৈত্য বা স্তূপ আছে। তাহার চারি দিকে চারিটি 'তথাগতের' মূর্তি আছে। প্রথম তথাগত 'বৈরোচন' স্তূপের মধ্যেই থাকিতেন। তাঁহার জন্য স্তূপের গায়ে কুলুঙ্গি কাটা হইত না। ক্রমে তিনিও আসিয়া অগ্নিকোণে জমিলেন। শাক্যসিংহ তখন একেবারে উপায় হইয়া গিয়াছেন—স্তূপে তাঁহার স্থান নাই—তাঁহার স্থান বিহারের মধ্যস্থলে যে মন্দির—তাহাতে। তখনকার বৌদ্ধেরা বলিতেন, তিনি 'পঞ্চ তথাগতে'র অথবা পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের কলম মাত্র—তিনি পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের মত কলমবন্দি করিয়া গিয়াছেন। ক্রমে এই পঞ্চ তথাগতের পাঁচটি শক্তি দাঁড়াইল। শক্তিগণের নাম—'লোচনা',

'মামকী', 'তারা', 'পাণ্ডরা', 'আর্যতারিকা'। বহুকাল অবধি তাঁহারা যন্ত্রে[১২] থাকিতেন, তাঁহাদের মূর্তি ছিল না—ক্রমে তাঁহাদেরও মূর্তি হইল। পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের পঞ্চ শক্তিতে পাঁচ জন 'বোধিসত্ত্ব'[১৩] হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে 'মঞ্জুশ্রী' ও 'অবলোকিতেশ্বর' প্রধান। বর্তমান কল্পে অর্থাৎ ভদ্রকল্পে 'অমিতাভ' প্রধান ধ্যানীবুদ্ধ। তাঁহার বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর—প্রধান বোধিসত্ত্ব। অবলোকিতেশ্বর করুণার মূর্তি। তিনি মহোৎসাহে জীব উদ্ধার করিতেছেন, সুতরাং তাঁহার পূজা খুব আরম্ভ হইল। সেবকের উৎসাহ অনুসারে তাঁহার অনেক হস্ত হইতে লাগিল—অনেক পদ হইতে লাগিল—অনেক মস্তক, হইতে লাগিল; তাঁহার পূজা একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার হইয়া উঠিল। তারাদেবীও নানা রূপ ধারণ করিয়া বৌদ্ধদের পূজা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ইহার পর অনেক ডাকিনী, যোগিনী, পিশাচী, যক্ষিণী, ভৈরব, বুদ্ধগণের উপাস্য হইয়া দাঁড়াইল। এক 'অভিধ্যানাত্তর তন্ত্রে' 'সম্বরবজ্র' 'পীঠপর্ব' 'বজ্রসত্ত্ব' 'পীঠদেবতা' 'ভেরুক' [হেরুক?] 'যোগবীর' 'পীঠমালা' 'বজ্রবীর-=ষড়্‌যোগসম্বর' 'অমৃতসঞ্জীবনী' 'যোগিনী' 'কুলডাক' 'যোগিনী যোগ-হৃদয়' 'বুদ্ধকাপালিকযোগ' 'মঞ্জুবজ্র' 'নবাক্ষরালীডাক'। 'বজ্রডাক' 'চোমক' প্রভৃতি অনেক ভৈরব ও যোগিনীর পূজাপদ্ধতি আছে। বোধিসত্ত্ব ও যোগিনীগণের ধ্যানকে সাধন বলে। যে পুস্তকে অনেক ধ্যান লেখা আছে তাহাকে 'সাধনমালা'[১৪] বলে। একখানি 'সাধনমালা'য় দুই শত ছাপ্পান্নটি সাধন আছে। 'বজ্রবারাহী', 'বজ্রযোগিনী', 'কুরুকুল্লা', 'মহাপ্রতিসরা', 'মহামায়ূরী', 'মহাসাহস্র প্রমর্দ্দিনী' প্রভৃতি অনেক যোগিনীর ধ্যান ইহাতে আছে। এই-সকল সাধন লইয়া মূর্তি নির্মাণে বৌদ্ধকারিগরেরা এক সময়ে যথেষ্ট বাহাদুরি দেখাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু যখন যোগিনী, ডাকিনী ভৈরবীর পূজা লইয়া ও তাঁহাদের মূর্তি লইয়া বৌদ্ধধর্ম চলিতে লাগিল, তখন আর অধঃপতনের বাকি কী রহিল?

বৌদ্ধধর্মের মধ্যে 'গুহ্যপূজা' আরম্ভ হইল। লুকাইয়া লুকাইয়া পূজা করিব—কাহাকেও দেখিতে দিব না; এ পূজার অর্থ কী? অর্থ এই যে, সে-সকল দেবমূর্তি লোকের সম্মুখে বাহির করা যায় না। ঐ-সকল মূর্তির নাম—উহারা বলিত শম্বর। একে তো অশ্লীল মূর্তি—তাহাতে ভালো কারিগরের হাতের তৈয়ারি—তাহাতে অশ্লীলতার মাত্রা চড়িয়া গিয়াছে। সেই-সকল মূর্তি যখন বুদ্ধদের প্রধান উপাস্য হইয়া দাঁড়াইল—তখন আর অধঃপাতের বাকি রহিল কী? সে-সকল উপাসনার প্রকার আরো অশ্লীল—সভ্যসমাজে বর্ণনা করা যায় না। একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন, বৌদ্ধদের এই-সকল পুথি 'ঘোমটা দেওয়া কামশাস্ত্র'। আমি বলি, তিনি ইহা ঠিক বর্ণনা করিতে পারেন নাই। যেখানে কামশাস্ত্রের শেষ হয়, সেইখানে বুদ্ধদিগের গুহ্যপূজা আরম্ভ। অধিক পুথির নাম করিব না। 'গুহ্যসমাজ'[১৫] বা 'তথাগত গুহ্যক' নামে বৌদ্ধদের একখানি পুথি আছে। এই পুস্তক সম্বন্ধে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলিয়াছেন—

".. but in working it out, theories are indulged in, and practices enjoined which are at once the most revolting and horrible that human depravity could think of, and compared to which the worst specimens of Holiwell Street literature of the last Century would appear absolutely pure." [*S-B-I-M,* p. 261]

অর্থাৎ এই বড়ো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইঁহারা যে-সকল মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং যে-সকল ক্রিয়াকর্মের উপদেশ দিয়াছেন, যত জঘন্য স্বভাবেরই মানুষ হউক না কেন, তাহা অপেক্ষা ভয়ানক ও ঘৃণিত মত বা ক্রিয়াকর্মের কল্পনাও করিতে পারে না। ইহার সহিত তুলনা করিলে গত শতকে হোলিওয়েল স্ট্রিটে[১৬] যে-সকল পুথি-পাঁজি বাহির হইত তাহা অতি পবিত্র বলিয়া মনে হয়। বুদ্ধদেব প্রাণীহিংসার একান্ত বিরোধী ছিলেন, কিন্তু 'তথাগত গুহ্যকে' বলিতেছে—

"হস্তিমাংসং হয়মাংসং শ্বানমাংসং তথোত্তমম্।
ভক্ষয়েদাহারকৃত্যর্থন্ন চান্নন্তু বিভক্ষয়েৎ॥"
"অন্নং বা অথ বা পানং যৎকিঞ্চিৎ ভক্ষয়েৎ ব্রতী।
বিন্মূত্রমাংসযোগেন বিধিবৎ পরিকল্পয়েৎ॥"
"সময়চতুষ্টয়ং রক্ষ বুদ্ধজ্ঞানোদধিপ্রভোঃ।
'বিন্মূত্রং তু সদা ভক্ষ্যমিদং গুহ্যং মহাদ্ভূতং॥"[১৭]

এই তো গেল আহারের কথা। গুহ্যসিদ্ধি লাভ করিতে গেলে বিষ্ঠা, মূত্র নিশ্চয়ই খাওয়া চাই—নহিলে কিছুতেই সিদ্ধিলাভ হইবে না। অন্যকথা খুলিয়া বলিতে গেলে সভ্যতার সীমা অতিক্রম করা হয়, হয় তো পিনাল কোডের ধারায়ও পড়িতে হয়। তবে একটা কিছু না বলিলে নয়—তাই একটি নমুনা দিতেছি—

"দ্বাদশাব্দিকাং কন্যাং চণ্ডালস্য মহাত্মনঃ।
সেবয়েৎ সাধকো নিত্যং বিজনেষু বিশেষতঃ॥"[১৮]

মোটকথা এই যে—

"দুষ্কবৈর্নিয়মৈস্তীব্রৈঃ সেব্যমানো ন সিদ্ধতি।
সর্ব্বকামোপভোগৈশ্চ সেবয়ংশ্চাশু সিদ্ধতি॥"

অর্থাৎ দুষ্কর কঠোর নিয়ম করিয়া সেবা করিলে কিছুতেই সিদ্ধি লাভ হয় না—সর্বপ্রকার কামোপভোগ করিয়া যদি সেবা করো—তাহা হইলে নিশ্চয় শীঘ্র সিদ্ধি লাভ হইবে।

বুদ্ধদেবের শীলরক্ষা, উচ্চাসন ও মহাসন ত্যাগ, মালাগন্ধবিলেপনাদি ত্যাগ, নৃত্যগীতবাদিত্রাদি ত্যাগ, প্রভৃতি কঠোর নিয়ম কোনো কাজেরই নয়, কেবল যথেচ্ছাচার করো—যথেচ্ছাচার করো—যথেচ্ছাচার করো। অধঃপাতের আর বাকি কী?

'তথাগত গুহ্যকে'র ন্যায় আরো অনেক পুস্তক আছে। 'চণ্ড-মহারোষণ তন্ত্র', 'চক্রসম্বর তন্ত্র', 'চতুষ্পীঠ তন্ত্র', 'উড্ডীষ তন্ত্র', 'সেকোদ্দেশ', 'পরমাদিবুদ্ধোদ্ধৃত কালচক্র', 'কালচক্রগর্ভতন্ত্র', 'সর্ব্ববুদ্ধসমাযোগ ডাকিনী-জাল সম্বরতন্ত্র', 'হেবজ্রতন্ত্ররাজ', 'আর্য্যডাকিনীবজ্রপঞ্জরমহাতন্ত্ররাজকল্প', 'মহামুদ্রাতিলক', 'জ্ঞানগর্ভ', 'জ্ঞানতিলক' নামে 'যোগিনীতন্ত্ররাগপরম-মহাদ্ভুত', 'তত্ত্বপ্রদীপ', 'বজ্রডাক', 'ডাকার্ণব', 'মহাসম্বরোদয়', 'হেরুকাভ্যুদয়', 'যোগিনীসঞ্চার্য্য', 'সম্পুট-তন্ত্র', 'চতুর্যোগিনী সম্পুট', 'গুহ্যবজ্র', ইত্যাদি। আর কত নাম করিব—কত নাম করিয়া পাঠকদের ধৈর্যচ্যুতি করিব? এ-সকল তন্ত্র 'তথাগত গুহ্যক' হইতে একবিন্দুও ভালো নয়। যখন এইরূপ শত শত

পুস্তক আছে—সে-সকল পুস্তক পড়া হইত—সেইরূপ ক্রিয়াকর্ম হইতে—তখন আর অধঃপাতের বাকি কী?

এ-সকল গুহ্যতন্ত্র—মূলতন্ত্র—সংগীতি আকারে লেখা। সংগীতির গোড়াতে এইরূপ থাকে, "এবং ময়া শ্রুতমেকস্মিন সময়ে ভগবান শ্রাবস্ত্যাং জেতবনে বিহরতি স্ম, অথবা রাজগৃহে বেণুবন্যে, বিহরতি স্ম, অথবা এইরূপ আর কোনো স্থানে বিহরতি স্ম।" অর্থাৎ আমি শুনিয়াছি একদিন ভগবান্ শ্রাবস্তী নগরে অথবা রাজগৃহে বেণুবনে অথবা আরো এইরূপ কোথাও বেড়াইতেছেন। এই-সকল গুহ্য উপাসনার গ্রন্থগুলিও এই ভাবে লেখা, তবে শ্রাবস্ত্যাং বিহরতি স্ম নাই—তাহার বদলে যাহা আছে তাহা কলমের মুখে আসে না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে—এই-সকল গুহ্যবিদ্যার পুস্তকের আবার টীকা, টিপ্পনী, পঞ্জিকা, ব্যাখ্যা, বিবরণ, উহার প্রয়োগপদ্ধতিপ্রকরণ আছে। মূল যদি বিশখানি থাকে—টীকা-টিপ্পনীতে তাহা পাঁচ শত হইয়া দাঁড়ায়। একজন ইউরোপীয় লেখক বলিয়া গিয়াছেন—ভারতবর্ষের অধঃপতনের কারণ খুঁজিতে গেলে এই-সকল জঘন্য বই ঘাঁটিতে হইবে। ভবিষ্যতে কোন্ হতভাগ্য পণ্ডিতের অদৃষ্টে যে সে দুর্ভোগ আছে তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু সে দুর্ভোগ না ভুগিলেও এত বড়ো জাতিটা—এত বড়ো ধর্মটা—কেন যে অধঃপাতে গেল, তাহা তো বুঝা যায় না। তাই কাহাকেও-না-কাহাকে একদিন সে দুর্ভোগ ভুগিতেই হইবে। কিন্তু যে ভুগিবে সে সত্য সত্যই ভারতের একটা মহা-উপকার সাধন করিয়া যাইবে। সে অন্তত বলিবে—"বাপু! এ পথে আর আসিও না—এ পথে আসিলে অধঃপতন অবধারিত।"

বুদ্ধদেব দেবতা মানিতেন না। মানুষ আপনা হইতেই চরিত্রশুদ্ধি করিয়া ক্রমে লোকে যাহাদের দেবতা বলে তাহাদের অপেক্ষাও উচ্চ যে পরমপদ—যে পদে গেলে জন্ম-জরা-মরণের আর ভয় থাকিবে না—যে পদে গেলে সংসারের কোনো চিন্তা থাকে না—যে পদে গেলে মহাশান্তি লাভ করা যায়—সেই পদে উঠিতে পারিবে। তাঁহার শিষ্যেরা শেষ ডাক, ডাকিনী, যোগিনী, প্রেত, প্রেতিনী, পিশাচ, পিশাচিনী, কটপূতনা, কঙ্কালিনী, ভৈরব, ভৈরবী প্রভৃতির উপাসনা করিয়া আপনারাও অধঃপাতে গেল—সঙ্গে সঙ্গে দেশটাসুদ্ধ অধঃপাতে দিল।

বৌদ্ধধর্মে অনেক দিন হইতেই ঘুণ ধরিয়াছিল। বুদ্ধদেব নিজে যেদিন স্ত্রীলোকদিগকে দীক্ষা দিয়া ভিক্ষুণী করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন—সেইদিন হইতেই তাঁহাকে সংঘের বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য অনেক কঠোর নিয়ম করিতে হইয়াছিল। তিনি ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের এক বিহারে থাকিতে দিতেন না। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পাঁচ-ছয় শত বৎসর পর হইতে ভিক্ষুরা ক্রমে বিবাহ করিতে লাগিল—ক্রমে একদল গৃহস্থ ভিক্ষু হইল। এইখান হইতেই ঘুণ ধরা আরম্ভ হইল। সমাজে আসল ভিক্ষুদের খাতির অধিক ছিল। গৃহস্থ ভিক্ষুদের আদর তত ছিল না। কিন্তু গৃহস্থ ভিক্ষুদের নাম ছিল 'আর্য'। আসল ভিক্ষুরা আর্যদের নমস্কার করিতেন না, কিন্তু আর্যরা অনার্য হইলেও আসল ভিক্ষুদের নমস্কার করিতেন। এই গৃহস্থাশ্রমের ভিক্ষুরাই ক্রমে দলে পুরু হইতে লাগিল। কারণ তাহাদের সন্তান-সন্ততি হইত—তাহারা আপনা-আপনি ভিক্ষু হইয়া যাইত। একজন গৃহস্থ গৃহস্থাশ্রম ছাড়িয়া যদি ভিক্ষু হইতে যাইত—তাহাকে প্রথম 'ত্রিশরণ' গ্রহণ করিতে

হইত—তাহার পর 'পুণ্যানুমোদনা'[১৯] শিখিতে হইতে, 'পাপদেশনা'[২০] শিখিতে হইত, 'পঞ্চশীল' গ্রহণ করিতে হইত, 'অষ্টশীল' গ্রহণ করিতে হইত, 'দশশীল'[২১] গ্রহণ করিতে হইত, 'পোষধব্রত'[২২] ধারণ করিতে হইত—আরো কত কী করিতে হইত—অনেক সময় যাইত। কিন্তু গৃহস্থ ভিক্ষুর ছেলে—সে একেবারেই ভিক্ষু হইত। যে-সকল জিনিস অন্যকে বহুকালে শিখিতে হইত, সে সে-সকল বাড়িতেই শিখিত—তবে আমাদের যেমন এখন পইতা হয়—একটা সংস্কার মাত্র—উহাদেরও ঐ রকম 'ত্রিশরণ গমন' 'পঞ্চশীল গ্রহণ', এক-একটা সংস্কারের মতো হইয়া যাইত। আমাদের দেশে যেমন 'জাত-বৈষ্ণব' বলিয়া একটা জাতি হইয়াছে—সেকালেও তেমনি 'জাত-ভিক্ষু' বলিয়া একটি জাতির মতো হইয়াছিল। উহাদের যত দলপুষ্টি হইতে লাগিল, আসল ভিক্ষুদের অবস্থা তত হীন হইতে লাগিল। গৃহস্থ ভিক্ষুরা কারিগরি করিয়া জীবন নির্বাহ করিত—ভিক্ষাও করিত—কেহ বা রাজমজুর হইত, কেহ বা রাজমিস্ত্রি হইত, কেহ বা চিত্রকর হইত, কেহ বা ভাস্কর হইত, কেহ বা স্যাকরা হইত, কেহ বা ছুতার হইত—অথচ ভিক্ষাও করিত, ধর্মও করিত, পূজা-পাঠও করিত। বৌদ্ধধর্মের পৌরোহিত্যটা ক্রমে নামিয়া আসিয়া কারিগরদের হাতে পড়িল। যে কাজে পরিশ্রম কম—ঘরে বসিয়া করা যায় একটু হাত পাকিলে কাজও ভালো হয়—দু পয়সা আসেও বেশি, গৃহস্থ-ভিক্ষু সেই-সকল কাজ করিত। সুতরাং তাহাদের ধর্ম করিবার সময়ও থাকিত—বড়ো বড়ো উৎসবে দু-চার পয়সা খরচও করিতে পারিত। কিন্তু বেশি লেখাপড়া শেখা, ধ্যানধারণা করা, ভাবনাচিন্তা করার সময়ও থাকিত না—প্রবৃত্তিও থাকিত না। তাহা হইলেই মোট দাঁড়াইল এই যে, বৌদ্ধধর্মের পৌরোহিত্যটা মূর্খ কারিগরদের হাতে পড়িয়া গেল। আসল ভিক্ষুরা বিহারে থাকিতেন। বিহারের জমিজমার আয় হইতে কোনোরূপে দিন গুজরান করিতেন। ক্রমে রাজারা প্রায় বিধর্মী হইয়া উঠিল। বৌদ্ধ-পণ্ডিত হইলে যে রাজসম্মান পাইবেন তাহার উপায় রহিল না। রাজারাও ছোটো ছোটো রাজা—আপনাদের পণ্ডিত পোষণ করিয়া আবার যে বিধর্মী বৌদ্ধ-পণ্ডিত প্রতিপালন করিবেন, তাঁহাদের সে সাধ্য ছিল না—থাকিলেও তাঁহাদের পণ্ডিতেরা তাহা করিতে দিত না। সুতরাং আসল ভিক্ষুদের এবং তাহাদের বিহারের অবস্থা ক্রমে শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল। এমন সময়ে আফ্‌গানিস্তানের উপত্যকা হইতে পাঠানেরা মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইয়া এবং মুসলমান ধর্ম প্রচারের জন্য কোমর বাঁধিয়া অন্য ধর্মাবলম্বীদের কাফের বলিয়া তাহাদের উচ্ছেদ সাধনের জন্য বঙ্গ দেশে আসিয়া পড়িলেন। যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহাদের বংশধরেরা এখনো আসিতেছেন। ইঁহাদের পূর্বপুরুষেরা ইঁহাদের অপেক্ষা যে বেশি জ্ঞানী ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তখন বাংলায় তো সেনবংশ রাজা—কিছু বড়ো রাজা মাত্র। আশে পাশে চারি দিকে অনেক ছোটো ছোটো রাজা ছিলেন। তাঁহাদের কেহ কেহ বৌদ্ধও ছিলেন। বল্লালের সময় ব্রাহ্মণদের একটা আদমসুমারি লওয়া হয়। সে সময়ে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র আট শত ঘর ব্রাহ্মণ ছিল। আট শত ঘর ব্রাহ্মণে যতটুকু হিন্দু করিয়া লইতে পারে, দেশের ততটুকু হিন্দু ছিল—অবশিষ্ট সবই বৌদ্ধ। বৌদ্ধেরা পুতুল পূজা খুব করিত। সুতরাং মুসলমান আক্রমণের রোকটা বৌদ্ধদের উপরই পড়িয়া গেল। তাঁহারা বৌদ্ধদের বিহারগুলি সব ভাঙিয়া ফেলিলেন। এক ওদন্তপুরী[২৩] বিহারেই দুই হাজার আসল ভিক্ষু বধ হইল। বিহারটি

ভাঙিয়া ফেলা হইল; পাথরের মূর্তিগুলি ভাঙিয়া-চুরিয়া ফেলা হইল; সোনা রূপা তামা পিতল কাঁসার মূর্তিগুলি গালাইয়া ফেলা হইল; পুথিগুলি পোড়াইয়া দেওয়া হইল। বিক্রমশীল[২৪] বিহারেরও এই দশাই হইয়াছিল। নালন্দা[২৫] জগদ্দল[২৬] প্রভৃতি বড়ো বড়ো বিহারের এই দশা হইল। ওদন্তপুরী বিহারে ঢিবি খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে—নালন্দা বিহারেরও ঢিবি খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে। বিক্রমশীল ও জগদ্দলের এখনো কোনো খোঁজ হয় নাই। আসল ভিক্ষু এই সময় হইতেই একরূপ লোপ হইয়াছে। যাহারা পলাইয়াছিল তাহারা নেপাল, তিব্বত, মঙ্গোলিয়ায় চলিয়া গিয়াছিল, কতক বর্মায় ও সিংহলে গিয়াছিল। সুতরাং বাংলায় বৌদ্ধদের বিদ্যাবুদ্ধি, পুথি-পাঁজির এই পর্যন্ত শেষ।

এক-একবার মনে হয় তিন-চারি শত বৎসর ধরিয়া বৌদ্ধেরা ইন্দ্রিয়াসক্ত, কুকর্মান্বিত ও ভূতপ্রেতের উপাসক হইয়া যে নিজেও অধঃপাতে গিয়াছিল এবং দেশটাকে সুদ্ধ অধঃপাতে দিয়াছিল, মুসলমানদের আক্রমণ তাহারই প্রায়শ্চিত্ত। বিধাতা যেন তাহাদের পাপের ভরা সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাদিগকে সমূলে উচ্ছেদ করিবার জন্য মুসলমানদের এদেশে পাঠাইয়াছিলেন। তাহাদের সেই ঘৃণিত উপাসনা, বিষ্ঠামূত্র ভক্ষণ করিয়া সিদ্ধিলাভের চেষ্টা, ভূতপ্রেত পূজা করিয়া বুজরুক হইবার চেষ্টা এবং উৎকট ইন্দ্রিয়াসক্তিকেই ধর্ম বলিয়া মনে করা ও তাহাই শিখানো—এই-সকলের পরিণামে তাহাদিগকে বঙ্গ দেশ চিরকালের জন্য ছাড়িতে হইল।[২৭] দেশে রহিল—কারিগর পুরোহিত ও তাহাদেরই যজমান। লেখাপড়া বুদ্ধিবিদ্যার নামগন্ধ পর্যন্ত বৌদ্ধদের মধ্যে লোপ পাইল। ইহার পর কী হইল পরে বলা যাইবে।

'নারায়ণ'
আশ্বিন, ১৩২২ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. এই বইয়ের পৃ. ৩০-৩১ (প্রাসঙ্গিক তথ্য), সূত্র ৫ দ্র.

২. এই বইয়ের পৃ. ৯২ (প্রাসঙ্গিক তথ্য), সূত্র ১২ দ্র.

৩. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ প্রকাশিত *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ* ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮২ সূত্র ৮ দ্র.

৪. ধারণী দীর্ঘ মন্ত্র। ৫০ থেকে ১০০ অক্ষরে রচিত। হৃদয়-ধারণী এর চেয়ে দীর্ঘ মন্ত্র।

"Just at this point it is necessary... to explain what the ardent Maha-yanist philosopher did for the benefit of those who were either unable or incapable of so much study and meditation as is required to understand the subtle theories of Maha-yana. They invented *Dharanis* for them. They are rather long Mantras and a philosopher said to his disciples, 'Read, recite and repeat' this *Dharani* and you will get all the benefit of studying such and such work and practising such and such Dhyana. The Mantras will hold you fast to your creed

and so they are called *Dharanis*. The *Dharanis* generally range from fifty to hundred-syllable. In the fifth or sixth century A.D. all Indians, Hindus and Buddhists alike, had *Hrdaya Mantras* rather longish, certainly longer than *Dharanis,* giving the essence of certain creeds. Thus Prabhakara-Vardhana repeated the Aditya Hrdaya Mantra, his elder son, Rajya-Vardhana, repeated the Prajna-Paramita Hrdaya Mantra and his younger son, Harsa-Vardhana, repeated the Mahesvara Hrdaya Manatra. These Mantras are simply symbolic; they symbolised particular creeds, particular schools and particular works. If so, if it is all symbol, why not make the symbol as short as possible. So they began to take the initial letter as the symbol of the idea in the case of Buddhists, and of the deity in the case of the Hindus. But after a certain time they gave up taking the initial letter. They evolved out of the shapes of different characters of the alphabet, the form of different deities. Thus অ is visnu, আ written with a hook below is Ananta, the serpent God who often remains coiled Kundalita, ই used to be written with three dots and so that letter represented Tri-vikrama, and so on, to the end of the alphabet. These were called the Bijas and the Yogis used to evolve out of these Bijas the form of the deities whom they worshipped." Shastri, *Advayavajra-Samgraha,* G-O-S, No. XL, pp. xxviii-xxix.

৫. অনুবাদ : ওঁ নমস্কার সকল বুদ্ধকে যাঁদের ক্ষমতার সীমা নেই। ওঁ কীলে কীলে আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত তথাগত, বরদানকারী পরে পরে উত্তম তথাগত হও ক্রীং ফট্ স্বাহা।

৬. মহাযানের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নয়খানি শাস্ত্র গ্রন্থ 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা', 'সদ্ধর্মপুণ্ডরীক', 'ললিতবিস্তর', 'লঙ্কাবতার', 'সুবর্ণ-প্রভাস', 'গণ্ডব্যূহ', 'তথাগতগুহ্যক', 'সমাধিরাজ' এবং 'দশভূমীশ্বর'; এই ধর্ম-পর্যায়কে বলা হয় বৈপুল্য-সূত্র। এখানে 'ধর্ম' শব্দটির 'শাস্ত্র' অর্থে প্রযুক্ত।

'গণ্ডব্যূহ' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে বোধি লাভের জন্য সুধন নামে এক যুবকের আয়াসের বিবরণ। মঞ্জুশ্রী সুধনকে ভগবান বুদ্ধের অলৌকিক ক্ষমতার কথা শোনালে সে মঞ্জুশ্রীর প্রশস্তি করে এবং বোধি লাভের আকাঙ্ক্ষা জানায়। মঞ্জুশ্রী তাকে মেঘশ্রীর কাছে যেতে বলেন। মেঘশ্রী সাগরমেঘের কাছে যেতে বলেন। এমনি করে বহু জনের কাছে ঘুরে ঘুরে অতৃপ্ত সুধন বুদ্ধের স্ত্রী গোপা এবং মা মায়ার কাছে উপস্থিত হল। এঁদের কাছে আংশিক জ্ঞান অর্জন করে সে গেল সুরেন্দ্রাভার কাছে, সেখান থেকে কপিলবাস্তুর বিশ্বামিত্রর কাছে। প্রতিবার গুরু বদলের সঙ্গে সঙ্গে তার জ্ঞানও বাড়ল। মৈত্রেয় তাকে বললেন, মঞ্জুশ্রী ভিন্ন আর কেউ পূর্ণজ্ঞান অর্জনে সাহায্য করতে পারবেন না। শেষ পর্যন্ত সুধন আবার মঞ্জুশ্রীরই শরণ নিল এবং তাঁর আনুকূল্যে সমন্তভদ্রর কাছ থেকে পূর্ণজ্ঞান অর্জন করল। দ্র. *S-B-L-N,* p. 90; Daisetz Teitaro Suzuki and Hokei Idzumi ed. *The Gandavyuha Sutra,* Tokyo 1949.

৭. অনুবাদ : ওঁ নমস্কার সকল বুদ্ধকে যাঁদের ক্ষমতার সীমা নেই। ওঁ ধুনে ফেলো ধুনে ফেলো (সমস্ত কর্মফল) ক্রীং ফট্ স্বাহা।

৮. 'সমধিরাজ' গ্রন্থের বিষয় বিভিন্ন ধরনের সমাধির বিবরণ, যার মধ্যে সমাধির রাজা বা শ্রেষ্ঠ সমাধি হল সর্বধর্মস্বভাবসমতাবিপশ্চিত সমাধি। ৪২ পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ এই গ্রন্থে কোনো সাধক কিভাবে ধাপে ধাপে সাধনার পথে এগিয়ে চরম সিদ্ধি অর্জন করতে পারে তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। কথোপকথনের ঢঙে লেখা। চন্দ্রপ্রভ প্রশ্ন করছেন, উত্তর দিচ্ছেন বুদ্ধদেব। উত্তর দিতে গিয়ে বুদ্ধদেব নিজের পূর্ব পূর্ব জন্মের অভিজ্ঞতার কথা বলছেন। এই আলাপচারি অনুষ্ঠিত হচ্ছে রাজগিরের গৃধ্রকূট পাহাড়ে। দ্র. *S-B-L-N, p. 207.*

৯. অনুবাদ : ওঁ নমস্কার সকল বুদ্ধকে যাঁদের ক্ষমতার সীমা নেই। ওঁ মণি ধারণকারিণী, বজ্র ধারণকারিণী (=বজ্রেশ্বরী?) মহান্ রক্ষয়িত্রী ক্রীং ক্রীং ফট্ ফট্ স্বাহা।

১০. 'মহাপ্রতিসরা', 'মহাসহস্রপ্রমর্দিনী', 'মহামায়ূরী', 'মহারক্ষামন্ত্রানুসারিণী' এবং 'মহাশিতবর্তী' এই পাঁচখানি বই 'পঞ্চরক্ষা' নামে উল্লেখ করা হয়। 'পঞ্চরক্ষা' জাদুমন্ত্রের সংকলন। বলা হয়—গ্রহের ফের; হিংস্র প্রাণী, বিষাক্ত কীট ও রোগের আক্রমণ রোধের জন্য বুদ্ধদেব এইসব মন্ত্র প্রকাশ করেছিলেন। মহাপ্রতিসরা মন্ত্রটি এই রকম—"ওঁ বিপুল-গর্ভে বিপুল-বিমলে বিমল-গর্ভে বিপুল-বিমল-বিমল-গর্ভে বিমলে জয়-গর্ভে বজ্রজাল-গর্ভে গতিগহনে গগন-বিশোধনে সর্বপাপ-বিশোধনে।"—ইত্যাদি। এই মন্ত্র-শক্তির প্রমাণস্বরূপ অনেক গল্পের অবতারণা করা হয়েছে।

পঞ্চরক্ষার প্রতিটি বইয়ের পুথির প্রথম পাতায় এক-একটি দেবীরূপ আঁকা আছে। মহাপ্রতিসরার চার মুখ, আট হাত; দুটি সিংহের উপরে বসা মূর্তি। দেবীর এবং সিংহের গায়ের রঙ সাদা। কিন্তু মুখ চারটি চার রঙের—সবুজ, সাদা, লাল এবং হলুদ। এইসব দেবীর মূর্তি গড়ে পূজো করা হত। রাজসাহি চিত্রশালায় একটি মহাপ্রতিসরা মূর্তি আছে। এশিয়াটিক সোসাইটি সংগ্রহে পুথি সংখ্যা 4078 (বাংলা কুটিল অক্ষরে লেখা) এবং 9970 (নেওয়ারি অক্ষরে লেখা)। দ্র. *S-B-L-N,* p. 168.

১১. এই বইয়ের পৃ. ৭১ (প্রাসঙ্গিক তথ্য) সূত্র ১০ দ্র.

১২. যন্ত্র দেবতার প্রতীক। মূর্তি পূজার মতো যন্ত্র পূজার বিধান আছে। সোনা, রূপা, তামার পাতে কিংবা ভূর্জপাতায় যন্ত্র আঁকা হয়ে থাকে।

বজ্রযানের দেবতা বৈরোচন, রত্নসম্ভব, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধি, অক্ষোভ্য—এই পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের মূর্তির বাঁ পাশে একটি ত্রিকোণ যন্ত্রে এঁদের শক্তির প্রতীক আঁকা হত।

১৩. এই বইয়ের পৃ. ১৭-১৮ (প্রাসঙ্গিক তথ্য) সূত্র ১৪ দ্র.

১৪. Benoytosh Bhattacharya ed. *SADHANAMALA,* Vol. I and II, G-O-S 1968, pp. 26,41.

১৫. এই বইয়ের পৃ. ৯১ (প্রাসঙ্গিক তথ্য) সূত্র ৫ দ্র.

১৬. Holy Well street লন্ডনের বই পাড়া ছিল। এটি strand-এর সমান্তরাল রাস্তা। অনেক আগে এখানে কতগুলি ঝরনা ছিল, যার একটির নাম ছিল হোলি ওয়েল। সেই ঝরনার নামে রাস্তাটির নাম হয় হোলি ওয়েল স্ট্রিট। Charing Cross Road-এ নতুন বই পাড়া পত্তন হবার আগে লন্ডনবাসীরা হোলি ওয়েল স্ট্রিটকে Book Sellers' Row বলত। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এখান থেকে বইয়ের দোকান ক্রমে ওঠে যায়। হোলি

ওয়েল স্ট্রিট লিটারেচর বলতে সেকালে অশ্লীল সাহিত্য বোঝানো হত। এখন আর এ অর্থে কথাটির প্রচলন নেই।

১৭. অনুবাদ : হাতির মাংস, ঘোড়ার মাংস, কুকুরের মাংস সেই রকম উত্তম। (এ মাংস) ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যই খাওয়া উচিত। তা না হলে অন্নই ভক্ষণ করবে।

খাদ্যই হোক বা পেয়ই হোক অল্প মাত্রায় আহার করা উচিত ব্রতধারীর। বিষ্ঠা, মূত্র ও মাংস যোগ করে নিয়ম মতো তা প্রস্তুত করবে।

বুদ্ধ-জ্ঞান-সমুদ্রের যিনি প্রভু, তাঁর চারটি নিয়ম রক্ষা করো। বিষ্ঠা এবং মূত্র সর্বদাই গ্রহণ করতে হবে—এই হল অদ্ভুত গোপনীয় (গুহ্য) তত্ত্ব।

১৮. অনুবাদ : কোনো সদাশয় চণ্ডালের বারো বছরের কন্যাকে সাধক বিশেষভাবে প্রত্যহ নির্জনে সেবা (অর্থাৎ পরিচর্যা) করবে।

১৯. পাপ ও দুঃখ থেকে বিশ্রাম পাবার জন্য শুভ কাজ যাঁরা করেছেন, তাঁদের কাজ অনুমোদন করি। এখন যারা দুঃখ ভোগ করছে তারা সুখী হোক। সংসার ও দুঃখ থেকে যারা মুক্তি পেয়েছে আমি তাদের জন্য আহ্লাদ প্রকাশ করছি। সম্প্রতি যেসব তাপিত জীব বোধিসত্ত্বত্ব ও বুদ্ধত্ব লাভ করেছেন তাঁদের শান্তিতে আমি আনন্দ প্রকাশ করছি। সব জীবের সুখকর ও হিতকর বুদ্ধজ্ঞান বিতরণ করছেন যেসব ধর্ম-প্রচারক তাঁদের কাজে আমি আনন্দ প্রকাশ করছি। এইভাবে পুণ্য কাজ অনুমোদন করাকে পুণ্যানুমোদনা বলা হয়।

২০. আমি মহাপাপী ও দরিদ্র, পূজার উপকরণ আমার কিছুই নেই। একান্ত মনে আমার দেহ বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বদের উদ্দেশে অর্পণ করছি। আমি আপনাদের ভৃত্য। আপনারা আমাকে গ্রহণ করেছেন, তাই আমি নির্ভয়ে হিতকর কাজের ব্রত নিলাম। যা-কিছু পাপ করেছিলাম তা থেকে আমি উত্তীর্ণ হলাম। আর পাপ করব না।—এই প্রার্থনাকে পাপদেশনা বলা হয়।

২১. এই বইয়ের পৃ. ৫৪-৫৫ (প্রাসঙ্গিক তথ্য), সূত্র ২২ দ্র.

২২. পোষধব্রত, উপোসথ। 'বিনয় পিটকে'র অন্তর্গত 'মহাবগ্‌গ' গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে উপসোথ-বিধি বিবৃত হয়েছে। দুই পক্ষের অষ্টমী এবং পূর্ণিমা ও অমাবস্যা এই চারটি উপোসথ তিথি। এই তিথিতে অষ্টশীল বা দশশীল পালনীয়। উপোসথ-ব্রতী ভোগসুখের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করেন। প্রাণী হিংসা করেন না। মিথ্যা বলেন না। নাচ-গান-বাজনা, মালা, সুগন্ধ জিনিস বর্জন করেন। বিকালে আহার করেন না। উঁচু বিছানা ও দামি আসবাব ব্যবহার করেন না। উপোসথ ব্রত নেওয়া উপলক্ষে ভিক্ষুদের পাতিমোক্‌খ পাঠ করতে হয়। 'বিনয় পিটকে' ভিক্ষুদের জন্য ২২৭টি বিধিনিষেধের উল্লেখ আছে—এইগুলিকে পাতিমোক্‌খ বলে। পাতিমোক্‌খ সভায় ভিক্ষুদের উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক ছিল। প্রকৃতপক্ষে ভিক্ষুদের উপরে সংঘের নিয়ন্ত্রণ এবং শাসন উপোসথ তিথিতে অনুষ্ঠিত পাতিমোক্‌খ সভার মাধ্যমেই কার্যকর করা হত।

২৩. এই বইয়ের পৃ. ১৬ (প্রাসঙ্গিক তথ্য), সূত্র ৮ দ্র.

২৪. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ প্রকাশিত *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ* ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮৮ সূত্র ৬ দ্র.

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫ সূত্র ২ দ্র.

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬ সূত্র ২৩ দ্র.

২৭. বৌদ্ধধর্মের অধঃপাত সম্পর্কে শাস্ত্রীমশায়ের আর-একটি মন্তব্য—"The other discovery I have made is not so much from books and MSS. as from actual observation in Nepal. It was always a puzzle to me that the pure metaphysical religion of Buddha could be made the medium of practising immoral and obscene rites. The Buddhist Trinity Dharma (Religion) Buddha and Sangha (Buddhist monastic congregation) are merely abstract ideas personified. All the three words are in masculine gender. How can there be the introduction of female divinities and subsequent obscene rites? But on entering the Holiest of the Great places of Pilgrimage in Nepal, the Svayambhu Ksetra, I was struck with a female figure labelled or inscribed as *Namo dharmaya*. I at once enquired from the Residency Pandit, a Buddhist high-priest himself and the descendant of the most learned of Buddhist Pandits ever met with by the English in Nepal. He coolly said *Dharma* is nothing else but *Prajna*. I had often read in Buddhist works the phrase Prajnopayasvarupinim or svarupaya. I know that Buddha is never an object of worship. His image is kept in monasteries simply for the purpose of keeping his noble example always present before the aspirers to Nirvana, and so he is the Upaya or means to Nirvana. I also knew that Prajna or true knowledge is the great goal of those who aspire to Nirvana. But none ever suspected that Dharma and Prajna are identical. This identification introduced a female deity into the Buddhist Trinity and she at once became the mother of all Bodhisattvas, beings representing the Sangha or the Buddhist congregation. In a MS. in the Durbar library belonging to the Kalacakra School I subsequently saw illustrations of *Buddha* and *Prajna* in the unspeakable situation begetting Bodhisattvas. This information led to the explanation of many facts and symbolisms unexplained before. Buddhism subsequently became closely allied to Sakti worship and its latter development ran in parallel lines that of Sakti cult."—"Antiquities of the Tantras and the Introduction of Tantric rites in Buddhism". *Proceedings of Asiatic Society of Bengal,* August 1900, pp. 101-02.

৯

বৌদ্ধধর্ম কোথায় গেল?

মুসলমানের আক্রমণে বৌদ্ধধর্ম বাংলা হইতে লোপ হইয়াছে একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু যেখানে মুসলমান যাইতে পারেন নাই, সেখানে বৌদ্ধধর্ম কিছু কিছু ছিল। ইংরাজেরা যেরূপ সমস্ত দেশ একেবারে দখল করেন, মুসলমানেরা সেরূপ পারেন নাই। অনেক স্থানেই যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের ছোটো ছোটো রাজ্য দখল করিতে হইয়াছিল। গিয়াসুদ্দিন বোলবন্[১] যখন তুগ্রলের বিদ্রোহ দমনের জন্য বাংলায় আসিয়াছিলেন, তখন তিনি ১২৮০ খৃ. অব্দে সোনারগাঁওয়ের রাজার সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন। সকলেই জানেন নবদ্বীপ ও গৌড়জয়ের পর পূর্ব-বাংলা জয় করিতে মুসলমানদের প্রায় একশত কুড়ি বৎসর লাগে। সোনারগাঁওয়ের রাজারা যে সব হিন্দু ছিলেন এরূপ বোধ হয় না। কারণ পূর্ব-বাংলায় অনেক বৌদ্ধ ছিল। আমরা বাংলা অক্ষরে লেখা একখানি 'পঞ্চরক্ষা'র[২] পুথি পাইয়াছি। পুথিখানি ১২১১ শকাব্দায় বা ১২৮৯ খৃ. অব্দে লেখা। 'পঞ্চরক্ষা'র পুথিখানি বৌদ্ধ, উহাতে পাঁচখানি পুথি আছে। পাঁচখানিই আরম্ভ হয়—

"এবং ময়া শ্রুতমেকস্মিন সময়ে ভগবান্" ইত্যাদি। লেখক বলিতেছেন এ সময়ে পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমসৌগত মধুসেন[৩] আমাদের রাজা। মধুসেন যে পূর্ব-বাংলারই রাজা ছিলেন একথা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি না, তবে কুলগ্রন্থে বল্লালের পর মধুসেন বলিয়া একজন রাজার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। অন্য প্রমাণ না পাইলে আমরা মধুসেনকে বল্লালসেনের বংশধর বলিতে চাহি না। তবে ১২৮৯ খৃস্টাব্দে বাংলা দেশে একজন স্বাধীন বৌদ্ধরাজা ছিলেন একথা বেশ বলা যায়। এবং তাঁহার দেশে যে অনেক বৌদ্ধ বাস করিত সেকথাও বলা যায়।

মহামহোপাধ্যায় শূলপাণি[৪] চৌদ্দ শতকের শেষকালে তাঁহার প্রসিদ্ধ স্মৃতির গ্রন্থ-সকল রচনা করেন। এই-সকল গ্রন্থের মধ্যে 'প্রায়শ্চিত্ত-বিবেকঃ' খুব চলিত। তিনি একটি বচন তুলিয়াছেন যে নগ্ন দেখিলেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। নগ্ন শব্দের অর্থ করিয়াছেন—"নগ্নাঃ বৌদ্ধা-দয়ঃ"। বৌদ্ধ না থাকিলে তিনি এরূপ অর্থ করিতে পারিতেন না। আমি একখানি বাংলা অক্ষরে তালপাতায় লেখা 'বোধিচর্য্যাবতারে'র[৫] পুথি পাইয়াছি। সেখানি বিক্রয় সংবতের ১৪৯২ অব্দে লেখা অর্থাৎ ইংরেজি ১৪৩৬ সালে। 'বোধিচর্য্যাবতার'খানি মহাযানের পুথি—বৌদ্ধদিগের গভীর দর্শনের পুথি। পুথিখানি সোহিনচরী প্রদেশে বেণু-গ্রামে মহত্তর মাধবমিত্রের পুত্রের জন্য নকল করা হয়। একজন বৌদ্ধ-ভিক্ষু উহা লেখেন আর-একজন উহার পাঠ মিলাইয়া দেন। সুতরাং বাংলার অনেক কায়স্থ যে তখনো বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন একথা বেশ বোধ হয়। কেম্ব্রিজে একখানি বাংলা হাতে তালপাতায় লেখা বৌদ্ধ-ধর্মের পুথি আছে। সেখানি ইংরাজি ১৪৪৬ সালে লেখা। সেখানি মূল

কালচক্রতন্ত্রের পুথি। পুথিখানি শাক্যভিক্ষু জ্ঞানশ্রী কোনো বিহারে দান করিয়াছিলেন। লেখক মগধদেশীয় ঝাড়গ্রামনিবাসী করণকায়স্থ শ্রীজয়রাম দত্ত। উহাতে লেখা আছে "পরম ভট্টারক ইত্যাদি রাজাবলী পূর্ব্ববৎ" অর্থাৎ জয়রাম দত্ত পূর্বে আরো অনেক পুথি নকল করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ মিউজিয়মে ঐরূপ আর-একখানি তালপাতার পুথি আছে, সেখানি ১৪৭৯ বিক্রম সংবৎ বা ১৪২৩ খৃ. অব্দে লেখা। এখানি কাতন্ত্রের উণাদিবৃত্তি[৬]। বৌদ্ধ-স্থবির শ্রীবররত্ন মহাশয় আপনার পাঠের জন্য লিখাইয়াছিলেন। লিখিয়াছিলেন কপলিয়া গ্রামের কায়স্থ শ্রীবাগীশ্বর। ব্রিটিশ মিউজিয়মে শ্রীবররত্নের জন্য লেখা আরো অনেকগুলি কাতন্ত্র ব্যাকরণের পুথি আছে। তাহার মধ্যে দুই-একখানি বাংলা ভাষায়ও লেখা আছে। সুতরাং প্রমাণ হইতেছে তৎকালে বাংলা দেশে বৌদ্ধ-বিহার ছিল বৌদ্ধ-স্থবির ছিলেন। তাঁহারা ব্যাকরণশাস্ত্র বিশেষ যত্ন করিয়া পড়িতেন। শ্রীবররত্নের যে-সকল বিশ্লেষণ দেওয়া আছে তাহাতে তিনি যে মহাযানমতাবলম্বী ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। একটি বিশেষণ এই "শূনত্যসর্ব্বকারবরোপেত মহাকরুণী" "সর্ব্বালম্বনবিবর্জ্জিতা-দ্বয়বোধিচিত্তচিন্তামণিপ্রতিরূপক"। সুতরাং পনেরো শতকেও বাংলায় অনেক জায়গায় বৌদ্ধ ছিল এবং বৌদ্ধধর্মের পুথি-পাঁজিও লেখা হইত। এই শতকে রাঢ়ীশ্রেণী মহিন্তা গাঁই বৃহস্পতি[৭] নামে একজন বড়ো পণ্ডিত গৌড়ের সুলতান, রাজা গণেশও তাঁহার মুসলমান উত্তরাধিকারীগণের নিকট "রায়মুকুট" এই উপাধি পাইয়াছিলেন এবং তিনি একখানি স্মৃতি, অনেকগুলি কাব্যের টীকা ও 'অমরকোষে'র একখানি টীকা লিখিয়া বাংলা দেশে সংস্কৃতশিক্ষার বিশেষ উপকার করিয়া যান। তাঁহার 'অমরকোষে'র টীকা একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। তিনি ঐ টীকায় চৌদ্দ-পনেরোখানি বৌদ্ধ-পুস্তক হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার 'অমরকোষে'র টীকার তারিখ ইংরাজি ১৪৩১ সাল। তাহা হইলে তখনো বৌদ্ধ-শাস্ত্রের পঠন-পাঠন ছিল এবং ব্রাহ্মণেরাও অন্তত শব্দশাস্ত্রের প্রমাণ সংগ্রহের জন্য বৌদ্ধ পুথি পড়িতে বাধ্য হইতেন—একথা বেশ বুঝা যায়।

চৈতন্যদেবের তিরোভাব হয় ইংরাজি ১৫৩৩ সালে। তাহার পর তাঁহার অনেকগুলি জীবনচরিত্র লেখা হয়। চূড়ামণি দাস[৮] একখানি চৈতন্যচরিত লেখেন। তাহাতে লেখা আছে চৈতন্যের জন্ম হইলে সকলেই আনন্দিত হয়, তাহার মধ্যে বৌদ্ধেরাও আনন্দিত হয়। জয়ানন্দ[৯] আর-একখানি চৈতন্যচরিত লিখিয়াছেন। তিনি পুরীর জগন্নাথদেবকে বৌদ্ধমূর্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং ১৬ শতকেও বৌদ্ধেরা বাংলা হইতে একেবারে লোপ পায় নাই।

১৭ শতকে মঙ্গোলিয়া দেশে উর্গ নামক নগরে এক মহাবিহারে তারনাথ[১০] নামে একজন প্রসিদ্ধ লামা ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অবস্থা কিরূপ আছে জানিবার জন্য ১৬০৮ সালে বুদ্ধগুপ্ত নাথ[১১] নামে একজন লামাকে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি জগন্নাথ ও তৈলঙ্গ ঘুরিয়া বাংলা দেশে আসেন। তিনি কাশ্রমগ্রাম ও দেবীকোট, হরিভঞ্জ, ফুকবাদ, ফলগ্রু, প্রভৃতি নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। এই-সকল স্থানেই অনেক বৌদ্ধ-পণ্ডিত ছিলেন, অনেক বৌদ্ধ পুথি-পাঁজি ছিল, বৌদ্ধধর্মও খুব প্রবল ছিল। হরিভঞ্জ বিহারের ধর্ম পণ্ডিতের নিকট তিনি বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে নানারূপ শিক্ষালাভ করেন। হেতুগর্ভধন নামে একজন পণ্ডিত উপাসিকা তাঁহাকে নানারূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন। এইখানে তিনি অনেক সূত্রের মূলগ্রন্থ দেখিতে পাইয়াছিলেন। বাংলার বাহিরেও তিনি অনেক স্থানে বৌদ্ধধর্মের উন্নতি দেখিতে

পান। কিন্তু সে-সকল কথায় আমাদের কাজ নাই। তাঁহার সময়ে রাঢ়ে ও ত্রিপুরায় বৌদ্ধধর্ম প্রবল ছিল। তিনি বোধগায় মহাবোধি মন্দিরে ও বজ্রাসনের নিকটে অনেক বৎসর বাস করিয়াছিলেন। তিনি এই অঞ্চলে কোনো বিহারে জনকায় সিদ্ধনায়ক ডাক প্রভৃতি অনেক মণ্ডলের চিত্র দেখিয়াছিলেন। তিনি তৈলঙ্গ, বিদ্যানগর, কর্ণাট, প্রভৃতি অঞ্চলে অনেক ঘুরিয়াছিলেন। তিনি শান্তিগুপ্ত নামে একজন সিদ্ধের নিকট দীক্ষিত হইয়া "নাথ" উপাধি পাইয়াছিলেন। সেই অবধি তাঁহার নাম হইয়াছিল "বুদ্ধগুপ্ত নাথ"। যোগিনী দিনকরা ও মহাগুরু গম্ভীরমতির নিকট তিনি অনেক অলৌকিক ক্ষমতা পাইয়াছিলেন। তিনি মহোত্তর সুধীগর্ভের নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। রাজগৃহের গৃধ্রকূট গিরি-গুহায় ও প্রয়াগে অনেক বড়ো বড়ো তীর্থস্থান দেখিয়াছিলেন। তিনি খগেন্দিরি পাহাড়ের উপর যোগীদের থাকিবার জন্য এক প্রকাণ্ড বাড়ি নির্মাণ করিয়াছিলেন।

নেপালে ললিতপত্তন নামে এক নগর আছে। উহাকে এখন "পাটন" বলে। এখানকার একজন বজ্রাচার্য ১৬৬৫ খৃ. অব্দে তীর্থ করিতে আসিয়া কিছুদিন মহাবোধিমন্দিরের নিকট বাস করেন। তখন তাঁহাকে স্বপ্ন হয়, তিনি যেন মহাবোধি স্তূপের মতো একটি স্তূপ নিজের দেশে নির্মাণ করেন। তিনি তিন বৎসর মহাবোধিতে থাকিয়া উহার একটি চিত্র আঁকিয়া লইয়া যান এবং পাটনে মহাবোধি নামে এক বিহার নির্মাণ করেন। উহার ঠিক মধ্যস্থলে মহাবোধি স্তূপ নির্মাণ করেন। পাটনের সে বিহার ও সে স্তূপ আজও আছে। নিচের দিকে একটু একটু লোনা ধরিয়াছে কিন্তু উপরের অংশ ঠিক আছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বোধিগয়ার মন্দির ইংরাজেরা মেরামত করিয়া দিলে যেরূপ হইয়াছে সেটিও ঠিক সেইরূপ। মহাবোধি বিহারের বজ্রাচার্যেরা নেপালের বৌদ্ধদিগের মধ্যে আজিও অতি উচ্চস্থান লাভ করিয়া আসিতেছেন।

আঠারো শতকের প্রথমে কাশীতে নাথুরাম নামে একজন ব্রহ্মচারী ছিলেন। তাঁহাকে লোকে নথমল ব্রহ্মচারী বলিত। বদরিকাশ্রমের সহিত তাঁহার খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। তিনি নামে বৌদ্ধ ছিলেন কিন্তু বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বড়ো কিছু জানিতেন না। তাঁহার সংস্কার ছিল সংবৎ ১৭৫৫, ৮ই মাঘ বুদ্ধদেব বদরিকাশ্রমে অবতীর্ণ হইবেন। ৫ই মাঘ বিষ্ণু শিব গণপতি শক্তি এবং সূর্য নথমলের নিকট আসিয়া তাঁহাকে মুখভাষাগ্রন্থ লিখিতে বলেন। সেই গ্রন্থে বুদ্ধের অবতার হওয়া, বৌদ্ধধর্মের প্রভাব প্রভৃতি অনেক কথা লেখা থাকিবে। তিনিও সেইমতো কাশীর রামাপুরায় থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় চারি-পাঁচ জন বিদ্যার্থীর সাহায্যে সাড়ে-বারো লক্ষ শ্লোকে এক প্রকাণ্ড পুস্তক লেখেন। ঐ পুস্তকের খানিক খানিক কাশীর পুথিওয়ালাদের নিকট দেখিতে পাওয়া যায়। খানিকটা এশিয়াটিক সোসাইটিতেও আছে। কিন্তু সেটা মূল পুথি নয়—নকল করা। পুথির নাম এখন হইয়াছে 'বুদ্ধচরিত'। বুদ্ধদেব অবতীর্ণ হইয়া শূরসেন দেশে বুদ্ধনামক এক দৈত্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাস্ত করিলেন।

মুসলমানেরা যখন ভারতবর্ষ অধিকার করেন তখন ভারতবর্ষে যে একটা বৌদ্ধ বলিয়া প্রবল ধর্ম ছিল তাহা তাঁহারা জানিতেন না। তাঁহারা ভারতবাসী সভ্যজাতিমাত্রকেই হিন্দু বলিতেন। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম দুই-ই তাঁহাদের কাছে হিন্দুধর্ম ছিল। মিন্‌হাজ ওদন্তপুরী বিহার বিনাশের যে ইতিহাস দিয়াছেন তাহাতে তিনি বলেন যে, মুসলমানেরা দুই হাজার সব মাথা কামানো ব্রাহ্মণকে বধ করিয়াছিলেন। তাঁহারা

"ওদন্তপুরী" বিহারকে "ওদনন" বিহার বলিতেন। সব মাথা কামানো ব্রাহ্মণ হইতে পারে না একথা বোধ হয় বাঙালি পাঠককে বুঝাইতে হইবে না। সন্ন্যাসীরাই সব মাথা কামায়। বিহারের ভিক্ষুরা সব মাথা কামাইতেন যেহেতু তাঁহারাও সন্ন্যাসী ছিলেন। আকবরের সময় নানা দেশের ও নানা ধর্মের পণ্ডিতগণ তাঁহার সভায় উপস্থিত থাকিতেন, কিন্তু তাঁহার সভায় কোনো বৌদ্ধ-পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন না। ইংরাজেরা যখন প্রথম বাংলা হইতে আরম্ভ করিয়া একে একে সমস্ত ভারতবর্ষ অধিকার করেন, তখনো তাঁহারা ইংরাজ-অধিকৃত দেশে কোনো বৌদ্ধ দেখিতে পান নাই। কিরূপে বৌদ্ধদের নাম পর্যন্ত এদেশে লোপ হইয়া গেল, তাহা জানিতে হইলে প্রথম বৌদ্ধদের ইতিহাস জানা চাই। পূর্বে পূর্বে অনেকবার লেখা হইয়াছে যে, শেষ অবস্থায় বৌদ্ধেরা বড়ো কদাচারী হইয়াছিল—অত্যন্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়াছিল এবং তাহারা শেষ অবস্থায় ধর্মের যে ব্যাখ্যা করিয়াছিল সে অতি কদাকার। সেইজন্য ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকে প্রথম বিদ্রূপ করিতেন, পরে ঘৃণা করিতেন। বিদ্রূপের একটা উদাহরণ 'প্রবোধ-চন্দ্রোদয়' নাটকের তৃতীয় অঙ্কে দেখা যায়। হিন্দুরাজারাও বৌদ্ধদের বিরক্ত করিতে ত্রুটি করিতেন না। আমাদের শাস্ত্রে লেখা আছে যেখানে দেবোত্তর ভূমি আছে তাহার নিকটে ব্রাহ্মণকে 'ব্রহ্মোত্তর' দিবে না। কিন্তু সেন রাজাদের ব্রহ্মোত্তর দানে দেখা যায় যে উহার একসীমা "বুদ্ধ-বিহারী দেবমঠঃ"। কিন্তু বৌদ্ধদের প্রধান শত্রু রাজারাও ছিলেন না—ব্রাহ্মণরাও ছিলেন না—শৈব-যোগীরাই উহাদের প্রধান শত্রু ছিল। শেষ কালের বৌদ্ধগ্রন্থ-সকলে দেখিতে পাওয়া যায় শৈব-যোগীদের উপর উহাদের বড়োই রাগ। 'স্বয়ম্ভূপুরাণ'[১২] নেপালের রাজা যক্ষমল্লের সময়ে লেখা হয়। তিনি ইংরাজি চৌদ্দ শতকের শেষে রাজত্ব করিতেন। 'স্বয়ম্ভূপুরাণে'র শেষে শৈবদিগকে বিস্তর গালি দেওয়া আছে। বাংলাতেও বোধ হয় শৈব-যোগীরাই ক্রমে প্রবল হইয়া বৌদ্ধদের নাম পর্যন্ত লোপ করিয়াছে। চৈতন্যদেব অনেক নীচ অস্পৃশ্য জাতির উদ্ধার করিয়াছেন। অনেক সময় মনে হয়, এই-সকল নীচ অস্পৃশ্য জাতিরা পূর্বে বৌদ্ধ ছিল, এখন বৈষ্ণব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাতেও বৌদ্ধধর্মের নাম ক্রমে লোপ পাইয়াছে।

কিন্তু বাঙালির আশেপাশে বিশেষ উত্তর ও পূর্ব অঞ্চলে অনেক বৌদ্ধ ছিল। দার্জিলিং, শিলিগুড়ি প্রভৃতি স্থানে অনেক বৌদ্ধ বাস করিত; নেপালে অনেক বৌদ্ধ ছিল; চাটগাঁয়ে অনেক বৌদ্ধ ছিল। চাটগাঁ ও ত্রিপুরার পাহাড়ে বরাবরই বৌদ্ধ ছিল। ইহাদের মধ্যে নেপালি বৌদ্ধেরাই সেকালের ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধদের উত্তরাধিকারী। দার্জিলিঙের বৌদ্ধেরা প্রায়ই তিব্বত হইতে তাহাদের বৌদ্ধধর্ম লাভ করিয়াছে। সিকিম ও দার্জিলিঙে কিরূপে বৌদ্ধধর্ম প্রবেশ করে তাহার কতক ইতিহাস পাওয়া গিয়াছে। সেটা সমস্ত তিব্বত হইতে আসা। নেপালেও তিব্বতিরা আপনাদের প্রভাব কিছু কিছু বিস্তার করিয়াছে, কিন্তু নেপালের অধিকাংশ বৌদ্ধই পুরানো ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধ।

চট্টগ্রামে যে বৌদ্ধেরা আছেন তাঁহারা প্রাচীন ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধ নহেন। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বে তাঁহারা আরাকান হইতে বৌদ্ধধর্ম লাভ করেন, সে ধর্মও বর্মা ও সিংহল হইতে আসিয়াছে। রাঙামাটিতে যে-সকল বৌদ্ধ আছেন তাঁহারা যদিও এখন চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের শিষ্য, তথাপি তাঁহাদের মধ্যে এমন অনেক আচার-ব্যবহার আছে, তাহাতে বোধ হয় তাঁহারা প্রাচীন ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধ, কিন্তু নিকটবর্তী চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের সংস্রবে আসিয়া তাঁহারা অনেক পরিমাণে হীনযান মত গ্রহণ করিয়াছেন।

উড়িষ্যার জঙ্গলে বৌদ্ধধর্ম একেবারে লোপ পায় নাই। বোধ নামে যে একটি করদ মহল আছে, তাহার নামেই প্রকাশ যে, উহাতে এখনো বৌদ্ধধর্ম বর্তমান আছে। কয়েক বৎসর পূর্বে মহামান্য শ্রীযুক্ত সার এডওয়ার্ড গেট সাহেব [Edward Albert Gait] আমাকে কয়েকখানি উড়িয়া পুঁথি ও কতকগুলি কাগজপত্র দিয়াছিলেন। তাহাতে বেশ বোধ হয় যে, উড়িষ্যার সরাকি তাঁতিরা এখনো বৌদ্ধ। তাহাদের বিবাহের সময় বুদ্ধদেবের পূজা হইয়া থাকে। এই সরাকি তাঁতি যে কেবল জঙ্গল মহলেই আছে এমন নহে। পুরী জেলার দুই-একটি থানায় এবং কটকের কয়েকটি থানায় সরাকি তাঁতি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারাও স্পষ্ট বুদ্ধদেবের পূজা করিয়া থাকে। আমাদের বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলায়ও সরাকি তাঁতি আছে। তাহারা কিন্তু সম্পূর্ণরূপে হিন্দু হইয়া গিয়াছে। বৌদ্ধধর্মের সহিত তাহাদের কোনো সম্পর্ক নাই।[১৩]

কাজে বৌদ্ধ, নামেও বৌদ্ধ, এরূপ লোক অনেক খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। কিন্তু খাঁটি বৌদ্ধ আছে, অথচ নাম পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে, এরূপও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। কিরূপে এই-সকল বৌদ্ধকে খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে, তাহার বৃত্তান্ত আগামী বারে দেওয়া যাইবে।

'নারায়ণ'
পৌষ, ১৩২২ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ প্রকাশিত *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ* ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৫ সূত্র ১ দ্র.

২. এই বইয়ের পৃ. ১০৩ (প্রাসঙ্গিক তথ্য), সূত্র ১০ দ্র.

৩. "পরমেশ্বর পরমসৌগত পরমরাজাধিরাজ শ্রীমদ্ গৌড়েশ্বর মধুসেন-দেবকানাং প্রবর্দ্ধমানবিজয়রাজ্যে যত্রাঙ্কেনাপি শকনরপতে শকাব্দাঃ ১২১১ ভাদ্র দি ৩ ॥" 'পঞ্চরক্ষা'র পুথিতে এইভাবে মধুসেনের উল্লেখ আছে। নগেন্দ্রনাথ বসু বৈদ্য কুলগ্রন্থ থেকে লক্ষ্মণসেনের বংশধারার পরিচয় দিয়ে মধুসেনকেও এই বংশীয় এবং পূর্ববঙ্গের অধিপতি বলেছিলেন। কুলগ্রন্থের তথ্য নির্ভরযোগ্য নয়। বিশেষত ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গ মুসলমান অধিকারভুক্ত এবং পূর্ববঙ্গ দেববংশীয় রাজাদের অধিকারভুক্ত ছিল। এমন হতে পারে যে, এই মধুসেন দশরথদেব বা তাঁর কোনো উত্তরাধিকারীর কাছ থেকে পূর্ববঙ্গ ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। ইনি সেন পদবিধারী শেষ রাজা যিনি হয়তো একদা বিখ্যাত সেন রাজবংশের ঠাট বজায় রাখার চেষ্টা করেছিলেন দ্র. *H-B-I, p. 228.*

৪. বাংলা নব্য-স্মৃতির প্রবর্তক মহামহোপাধ্যায় শূলপাণির জন্ম যশোহর জেলায়, আনুমানিক ১৩৭৫-৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোনো সময়ে। বিবাহ সূত্রে নবদ্বীপে বসবাস করেন। তাঁর 'অনুসরণবিবেকঃ', 'একাদশীবিবেকঃ', 'কালবিবেকঃ', 'চতুরঙ্গদীপিকা', 'তিথিবিবেকঃ' 'তিথিদ্বৈতপ্রকরণম', 'শ্রদ্ধাবিবেকঃ', 'প্রায়শ্চিত্তবিবেকঃ' প্রভৃতি ২৩খানি মূল রচনা এবং ৪খানি টীকার নাম জানা যায়। এইসব বই লেখা হয়েছিল ১৪১৫-৬৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে।

এর মধ্যে 'শ্রাদ্ধবিবেকঃ' এবং 'প্রায়শ্চিত্ত বিবেকঃ' বই দুটির প্রভাব এবং চর্চা ধারাবাহিক ভাবে চলে এসেছে। শূলপাণি প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণির মাতামহ।

শাস্ত্রীমশায় শূলপাণি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "He belongs to Radhiya class of Brahmanas of Bengal, and belongs to Sahadi Gain and Baradvaja gotra. His works are extensively studied in Bengal. He has twelve works, with names ending with the word Viveka. His *Durgotsava-vivek* seems to be the earliest work on the subject." *Shastri-Cat,* Vol. III, pp. xxxiii-iv.

৫. শান্তিদেবের শ্রেষ্ঠ রচনা 'বোধিচর্যাবতার' সম্পূর্ণ শ্লোকে রচিত, দশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। তিব্বতি সূত্র অনুসারে শান্তিদেবের সময় খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী। বোধিচিত্ত-ভাবনার মহিমা বর্ণনায় শুরু, তারপরে অধ্যায়ে অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে প্রজ্ঞাপারমিতা অর্জনে বোধিসত্ত্বের সাধনার বিভিন্ন স্তর। নাগার্জুনের সময়ে (খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতক) মহাযান মতবাদ বিরুদ্ধবাদী দর্শনের সঙ্গে বিচার-বিতর্কে সীমিত ছিল। মহাসাংঘিকরা এই গণ্ডি পেরিয়ে মহাযানকে ব্যাপক জনজীবনে প্রতিষ্ঠিত করেন, একটা নতুন ধর্মান্দোলন জাগিয়ে তোলেন। এই আন্দোলনে 'বোধিচর্যাবতার' অন্যতম প্রধান শাস্ত্রগ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছিল। এশিয়াটিক সোসাইটি সংগ্রহে পুথি সংখ্যা 8067। দ্র. Shastri, "SANTIDEVA", *I-A,* Feb, 1913, pp. 49-52; *Shastri, Bodhicharya-vataram, J-B-T-S* 1894, pt. I; Vidhusekhar Bhatta-charyya ed. *Bodhicharyavatara of Santidev,* Asiatic Society, Calcutta 1960, সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'শান্তিদেবের বোধিচর্যাবতার', বিশ্বভারতী ১৩৫৪ ব.।

৬. সর্ব-বর্মা রচিত সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ কাতন্ত্র। 'উণ' দিয়ে শুরু হয় এমনসব কৃৎ প্রত্যয়কে 'উণাদি' বলা হয়। এই শ্রেণীর প্রত্যয় সংক্রান্ত সূত্রের ব্যাখ্যাকে বলা হয় উণাদিবৃত্তি।

"The Kalapa Vyakarana had its origin in Southern India in the 1st century A.D. One of the kings of the Sata-Vahana dynasty took a wife from Northern India; she spoke Sanskrit which he did not understand, and often made curious, and ludicrous mistakes. At last unable to bear the jeering of his wife, he made up his mind to study Sanskrit, and asked his Pandita Sarva-Varma to write a treatise on grammar, that would give him a workable knowledge of Sanskrit. Sarva-Varma produced a grammar which in six months gave the king what he wanted... The work is called *Katantra* or a short work. "It is in fact a Sanskrit grammar for beginners.' *Shastri-Cat.* Vol. VI, p. xxxviii.

৭. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ প্রকাশিত *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ* ৩য় খণ্ডের "বৃহস্পতি রায়মুকুট" প্রবন্ধ দ্র.

৮. নিত্যানন্দের অনুচর ধনঞ্জয় পণ্ডিতের শিষ্য চূড়ামণি দাসের চৈতন্যচরিত কাব্যের নাম 'গৌরাঙ্গবিজয়'। রচনাকাল আনুমানিক ১৫৪২-৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। এশিয়াটিক সোসাইটি সংগ্রহে পুথি সংখ্যা 3736,পৃ. ২৮-২৯এ চৈতন্যের জন্মে সাধারণ মানুষের উল্লাস বর্ণনা—

বৌদ্ধ তার্কিক মৈমাংসিক বৈদান্তিক।
সভাকার নাটে কহে ইবে দেখি ধিক ॥
সবলোক নাচে কান্দে করে কিবা কাজ।
ভাল লোক নাচে কান্দে না বাসএ লাজ ॥
হোর দেখ অধ্যাপক অদ্বৈত আচার্য্য।
নাচিয়া কাঁদিয়া ওবা সাধে কোন কার্য্য ॥
তর্কবাদীন্দ্র সিদ্ধানন্দঁ ভট্টাচার্য্য।
এ দিগবিজয়ী কবি পূজে সর্ব্বরাজ্য ॥

দ্র. সুকুমার সেন সম্পাদিত, 'গৌরাঙ্গবিজয়', এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা ১৯৫৭, পৃ. ১৪-১৫।

৯. মধ্য-রাঢ়ে আমাইপুরা গ্রামে জয়ানন্দের জন্ম। বাবা চৈতন্যভক্ত সুবুদ্ধি মিশ্র, মা রোদনী। জন্মকালে নাম রাখা হয়েছিল গুহিয়া, গুয়ে। চৈতন্যদেব তাঁর এই কুৎসিত নাম পরিবর্তন করে নাম দেন জয়ানন্দ। "জয়ানন্দ নাম হৈল চৈতন্য প্রসাদে।" এই বিবরণে মনে হয় জয়ানন্দ শৈশবে চৈতন্যের করুণাদৃষ্টি লাভ করেছিলেন। নিত্যানন্দের অনুচর অভিরামদাস এবং নিত্যানন্দের ছেলে বীরভদ্রের সঙ্গে জয়ানন্দের ঘনিষ্ঠতা ছিল। এঁদের প্রেরণায় এবং পণ্ডিত গদাধরের আজ্ঞায় তিনি 'চৈতন্য-মঙ্গল' রচনা করেন। রচনাকাল সম্ভবত ১৫৫০-৬০ খৃস্টাব্দের মধ্যে। 'চৈতন্যভাগবত' এবং 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র মতো সমাদৃত না হলেও তথ্যের বৈচিত্র্যে জয়ানন্দের বই মূল্যবান।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সংগ্রহের 'চৈতন্যমঙ্গল' পুথিতে (২০৩ সংখ্যক, প্রকাশ খণ্ড) আছে—

"তবে ত্রিজগৎনাথ বোদ্ধরূপ ধরি।
প্রবেশ করিল কৃষ্ণ দেউল ভিতরি ॥"৫৯

১০. তিব্বতি ভাষায় 'ভারতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস' 'গ্যাগার ছোন্‌জুঙ্' প্রণেতা তারনাথের জন্ম মঙ্গোলিয়ার ৎচাঙ্-এ, ১৫৭৫ খৃস্টাব্দে (মতান্তরে ১৫৭৩ খৃ.)। পারিবারিক নাম কুন্‌গা ঞিঙ্‌পো,আনন্দগর্ভ। বাবার নাম নামগ্যাল ফুন্‌ৎছোগ্। শিক্ষার জন্য সাক্যা-র উত্তরে অবস্থিত জোনাঙ্ মঠে প্রবেশের সময়ে তাঁর দীক্ষা-নাম হয় তারনাথ। ৪১ বৎসর বয়সে এই মঠের কাছে তাগ্‌তেন ফুনৎছোগ্ নামে নিজে একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। উত্তর জীবনে তারনাথ মঙ্গোলিয়ায় ফিরে যান এবং চীন সম্রাটের আনুকূল্যে অনেকগুলি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। মঙ্গোলিয়ায় তাঁকে দেবতার মর্যাদা দেওয়া হয়। লব্-নরের পুবে কাল্‌খা প্রদেশের উর্গায় তাঁর অনুগামী লামারা পরম্পরাক্রমে তারনাথের অবতার রূপে মান্যতা পেয়ে এসেছেন। তিব্বতি ঐতিহ্যে তাঁকে জেৎচুন তারনাথ—ভট্টারক তারনাথ বলে উল্লেখ করা হয়। তারনাথ 'ভারতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস' লেখেন ১৬০৮ খৃস্টাব্দে। এই বইয়ে অজাতশত্রুর সময় থেকে সেন রাজাদের আমল পর্যন্ত ভারতে বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও মতবাদের বিকাশ সম্পর্কে তথ্য সংকলন করা হয়েছে। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-পণ্ডিতদের সম্পর্কে বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে সমকালীন রাজাদের উল্লেখ থাকায় আধুনিক ঐতিহাসিকেরা বৌদ্ধধর্মের কালানুক্রমিক ইতিহাস রচনায় এই বইয়ের তথ্য ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন। অবশ্য সর্বত্র তারনাথের দেওয়া বিবরণ নির্ভরযোগ্য নয়। বইয়ের শেষ অধ্যায়ে তারনাথ সংক্ষেপে বৌদ্ধযুগের শিল্পকলার পরিচয় দিয়েছেন। এই বিবরণে বিম্বিসার,

ধীমান, বিটগালো, হসুরাজ, জয়, পরোজয়, বিজয়—ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের এইসব শিল্পীর নাম উল্লেখ করেছেন। সেন্ট পিটার্সবুর্গ থেকে ১৮৬৯ খৃস্টাব্দে তারনাথের বইয়ের জর্মান এবং রুশ অনুবাদ প্রকাশিত হয়। অনুবাদ করেন শিরেফ্নার এবং ভ্যাসিলিয়েভ। হরিনাথ দে-র করা আংশিক অনুবাদ ১৯১১ খৃস্টাব্দের জানুয়ারি সংখ্যা *The Herald* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এন্‌গা তেরামোতোর জাপানি অনুবাদ তোকিয়ো থেকে প্রকাশিত হয় ১৯২৮ খৃস্টাব্দে। দ্র. *H-B-I-I;* L. A Austine Waddell, *Buddhism and Lamaism of Tibet,* New Delhi 1974.

১১. তিব্বতে সাঙ্‌স্যে বেপা নামে পরিচিত ভারতীয় ভিক্ষু যুদ্ধগুপ্ত ষোড়শ শতাব্দীর মানুষ। ইনি তারনাথের শিক্ষক ছিলেন। দক্ষিণ ভারতে রামেশ্বরমের কাছে ইন্দ্রলিঙ্গয় কৃষ্ণ নামে এক বণিকের পরিবারে এঁর জন্ম। অল্প বয়সে বুদ্ধগুপ্ত তীর্থনাথ নামে একজন যোগীর কাছে যোগ শিক্ষা করেন এবং হটযোগে সিদ্ধ হয়ে ওঠেন। তীর্থনাথ রাজা রামরাজার সমসাময়িক। ইনি যদি বিজয়গড়ের রাজা হন তাহলে এঁর রাজত্বকাল ১৫৪২-৬৫ খৃস্টাব্দ। বুদ্ধগুপ্তর শিক্ষা ও সাধনা তান্ত্রিক ধারায়। দক্ষিণে সিংহল থেকে উত্তরে তিব্বত অবধি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বুদ্ধগুপ্ত ভ্রমণ করেন। তিব্বত ভ্রমণের সময়ে তারনাথ এঁর সংস্পর্শে আসেন এবং এই ভারতীয় গুরুর শিক্ষায় ভারতে মহাযান বৌদ্ধধর্মের বিবর্তনের ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত হন। তারনাথ 'ডুপ্‌ছেন বুদ্ধগুপ্তেহি' নামে গুরুর জীবনীর একটি খসড়া রচনা করেন। দ্র. Guiseppe Tucci, "The Sea and Land Travels of a Buddhist Sadhu in the Sixteenth Century', *I-H-Q,* Vol. VII, No. 4, Dec. 1931.

১২. Haraprasad Sastri ed., *BRHAT-SVAYAMBHU-PURANA*— Containing the traditions of the Svayambhu Ksetra in Nepal, Bibliotheca Indica, Asiatic Society, Calcutta 1894-1900.

১৩. শাস্ত্রীমশায়ের ধারণা ছিল 'সরাক' 'শ্রাবক' শব্দের অপভ্রংশ। 'শ্রাবক' থেকে 'সরাক' সিদ্ধ করা যায়, তবে ভাষাতত্ত্বের সহজ পন্থায় নয়। ভাষাতত্ত্বের নিয়ম মতো 'ক' লুপ্ত হয়ে যাবার কথা।

১৯১১ খৃস্টাব্দের আদমশুমার-প্রতিবেদনে বিহার, ওড়িশা এবং অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসী ১৮,৭০৭ জন সরাক জাতীয় মানুষের হিসাব আছে। এঁদের মধ্যে ১৬,৬৫৯ জন হিন্দু, ২১৫ জন জৈন এবং ১,৮৩৩ জন বৌদ্ধ। (E. A. Gait, *Census of India,* 1911, Vol. I, part II—Tables, p. 222)। ছোটোনাগপুর এবং মানভূমের সরাক বা সরাকদের সম্পর্কে রিজলি বলেন, এঁদের পূর্বপুরুষ জৈন ছিলেন, পরে হিন্দু সমাজভুক্ত হয়েছেন। জৈন ঐতিহ্যের স্মৃতি লালন করলেও এঁরা হিন্দু রীতিনীতি মানেন এবং ব্রাহ্মণ দিয়ে হিন্দু দেবদেবীর পুজো করান। লোহারদাগার সরাকদের প্রধান উপাস্য ২৩তম জৈন তীর্থংকর পার্শ্বনাথ, আবার এঁরা শ্যামচাঁদ, রাধামোহন ও জগন্নাথের পুজো করেন। সরাকরা প্রধানত কৃষিজীবী। (H. H. Risley, *The Tribes and Castes of Bengal,* Ethnographic *Glossary, Vol. II,* Calcutta 1891)। বীরভূমের সরকরা কৃষি এবং তাঁতের কাজ করেন। এঁরা জৈন। (স্মারকগ্রন্থ, পৃ. ১২০)।

১০

এখনো একটু আছে

পাঠানেরা তিন-চারি শত বৎসর ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা জানিতেন না যে, ভারতবর্ষে বৌদ্ধ বলিয়া একটা ধর্ম ছিল। মোগলেরা দুশো আড়াইশো বৎসর ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারাও জানিতেন না যে, ভারতবর্ষে বৌদ্ধ বলিয়া একটা ধর্ম ছিল। ইংরাজ রাজত্বের প্রথমেও সেকথা জানা ছিল না। ইউরোপীয়েরা জানিতেন যে, সিংহল, বর্মা, শ্যাম প্রভৃতি দেশেই বৌদ্ধধর্ম চলিত—সে ধর্মের ভাষা পালি, ধর্মযাজকেরা ভিক্ষু, বিবাহ করেন না—ইত্যাদি ইত্যাদি। ১৮১৬ সালে নেপালের সঙ্গে ইংরাজের সন্ধি হয়; সেই সন্ধির বলে ইংরাজরা নেপালের রাজধানীতে একজন রেসিডেন্ট রাখেন। হজ্‌সন[১] সাহেব বহুদিন সেই রেসিডেন্সির ডাক্তার থাকেন, পরে তিনি রেসিডেন্টও হন। তিনিই সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে এক নূতন রকমের বৌদ্ধধর্ম দেখিতে পান। ১৮২৬ সালে তাঁহার পণ্ডিত অমৃতাবন্দ[২] 'ধর্মকোষ সংগ্রহ' নামে একখানি বৌদ্ধ-গ্রন্থ সংস্কৃতে লিখিয়া হজ্‌সন সাহেবের হস্তে অর্পণ করেন। হজ্‌সন সাহেব বৌদ্ধধর্ম ও নেপাল সম্বন্ধে যে-সকল পুস্তক লিখিয়াছেন অনেক মালমসলা এই সংস্কৃত পুস্তক হইতে সংগ্রহ করা।

হজ্‌সনের পুস্তক পড়িয়া লোকের বিশ্বাস হয় যে, মহাযান নামে একপ্রকার বৌদ্ধধর্ম বহুকাল ধরিয়া ভারতবর্ষে চলিতেছিল এবং ভারতবর্ষ হইতেই সেই ধর্ম চীন, জাপান, কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দেশে ছড়াইয়া পড়ে—ক্রমে চীন ও তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত অনেক সংস্কৃত পুস্তকের তর্জমা দেখিতে পাওয়া যায়; তাহাতে লোকের আগ্রহ আরো বাড়িয়া ওঠে। হজ্‌সন সাহেব বৌদ্ধধর্মের অনেক সংস্কৃত পুথি নকল করাইয়া কলিকাতা, পারিস ও লণ্ডন নগরে পাঠাইয়া দেন। নেপাল রেসিডেন্সির আর-একজন ডাক্তার, রাইট সাহেব [Daniel Wrights] অনেকগুলি তালপাতার ও কাগজের বৌদ্ধ-পুথি সংগ্রহ করিয়া কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটিকে দেন।

হজ্‌সন সাহেব কলিকাতায় যে-সকল পুথি দেন, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৮৭৮ সালে তাহার ক্যাটালগ লিখিতে আরম্ভ করেন। এই সময় তাঁহার পীড়া হয়; তিনি আমাকে তাঁহার সাহায্য করিতে বলেন। আমিও সাধ্যানুসারে তাঁহার সাহায্য করিয়াছিলাম। ১৮৮২ সালে তাঁহার ক্যাটালগ বাহির হয়। উহার নাম *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* [১৮৮২ খৃ.]। ঠিক এই সময় বেন্ডল সাহেব [Cecil Bendall], রাইট সাহেব কেম্ব্রিজে যে পুথিগুলি দিয়াছিলেন, তাহার ক্যাটালগ করিতেছিলেন। তাঁহার ক্যাটালগ *[Catalogue of Buddhist Sanskrit Mss. in the University Library of Cambridge]* ১৮৮৩ সালে বাহির হয়। ক্যাটালগ বাহির করার পরই তিনি একবার ভারতবর্ষে আসেন এবং নেপাল বেড়াইয়া যান। তিনি কলিকাতা আসিলে আমার সহিত তাঁহার আলাপ হয়।

আমরা অনেক সময় আশ্চর্য হইয়া যাইতাম যে, এই যে এত বড়ো বৌদ্ধধর্ম, যাহা বাংলা বেহার হইতেই চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, বাংলায় তাহার কোনো চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি চলিয়া গেলে আমি মনে মনে স্থির করি, বৌদ্ধধর্ম বাংলায় কী রাখিয়া গিয়াছে খোঁজ করিতে হইবে। এমনি দেখিলে তো বোধ হয় কিছুই রাখিয়া যায় নাই। বেহারে তবু ভাঙা বাড়িগুলি আছে, বাংলায় তাও নাই। এই সময় 'বঙ্গবাসী'র যোগেনবাবু [যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু] ঘনরামের ধর্মমঙ্গল প্রকাশ করেন। সে বইখানা পড়িয়া মনে হয় যে, ধর্মপূজাই হয় তো বৌদ্ধধর্মের শেষ অবস্থা। ধর্মঠাকুর ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের উপর, তাঁর পুরোহিত ডোম, ব্রাহ্মণের সঙ্গে ধর্মমঙ্গলের সম্বন্ধ বড়ো বেশি নাই। তখন ধর্মঠাকুরের পূজা দেখিতে বড়ো ইচ্ছা হয়।

পাটুলির নিকট সূঁয়াগাছি গ্রামে এক ময়রার বাড়ি ধর্মঠাকুর আছেন শুনিয়া দেখিতে যাই। ঠাকুর খুব জাগ্রত, তাঁর কাছে মানত করিলে সব রকম পেটের অসুখ আরাম হয়। রথের মতন থাক্-থাক্ করা এক সিংহাসন, তাহার উপর ঠাকুর আছেন। ঠাকুর একখানি কালো পাথর বলিয়া মনে হইল, পাথরে যেন পিতলের paper-fastener বসানো আছে, সেগুলি ঠাকুরের চোখ। ভক্তিভাবে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া কিছু পূজা দিয়া ময়রাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাপু, তুমি কী মন্ত্রে ঠাকুর পূজা করিয়া থাক ও ঠাকুরের ধ্যান কী?" অনেক পীড়াপীড়ির পর সে ধ্যানের মন্ত্রটি বলিল; মন্ত্রটি এই—

যস্যান্তো নাদিমধ্যো নচ করচরণং নাস্তি কায়নিদানং
নাকারং নাদিরূপং নাস্তি জন্ম ঝ [চ] যস্য।
যোগীন্দ্রো জ্ঞানগম্যো সকলজনহিতং সর্ব্বলোকৈকনাথং
তত্ত্বং তঞ্চ নিরঞ্জনং [ম] মরবরদ পাতু বঃ শূন্যমূর্ত্তিঃ ॥[৩]

আবার শুনিলাম মুক্‌সিমপাড়ার কাছে জামালপুরে এক ধর্মঠাকুর আছেন। তিনি বড়ো জাগ্রত, যে যা মানত করে, সে তাহা পায়। ঠাকুর বড়ো রাগি, কোনোরূপ ত্রুটি হইলে হঠাৎ মন্দ করিয়া বসেন। তিনি চালাঘরে থাকিতে ভালোবাসেন, কেহ কোঠাঘর করিয়া দিতে চাহিলে তাহার সর্বনাশ হইয়া যায়। তিনি যেখানে বসিয়া আছেন, তাহার মাথার উপর চালে খড় কখনই থাকে না। বৈশাখ মাসে পূর্ণিমার দিন তাঁহার ওখানে মেলা হয়, সে মেলায় ১০০০/১২০০ পাঁঠা পড়ে, অনেক শুয়ার ও মুরগিও পড়ে। আগে সামনেই শুয়ার মুরগি বলি হইত, এখন মন্দিরের পিছন দিকে হয়। এই-সকল শুনিয়া জামালপুরের ধর্মঠাকুর দেখিবার জন্য বড়োই আগ্রহ হইল। জামালপুর গেলাম; গিয়া দেখি সামনে দাওয়ার চালে অসংখ্য ঢিল ঝুলিতেছে; ন্যাকরার ফালি, কাপড়ের পাড়, পাটের দড়ি, শণের দড়ি, নারিকেল দড়ি প্রভৃতিতে ঢিল ঝোলানো আছে। কেহ কিন্তু মানত করিলে, একটি ঢিল ঝুলাইয়া আসে এবং মনোরথ পূর্ণ হইলে ঢিলটি খুলিয়া লয়। আমি অনেকক্ষণ মন্দিরের চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইলাম; আমার বোধ হইল মন্দিরের পিছনে একটা স্তূপ ছিল—তাহার গোল তলাটা মাত্র পড়িয়া আছে। তলা একেবারে মাটির সমান। মন্দিরের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে একটা প্রকাণ্ড মনসাসিজের গাছ, গাছের দুটা ডালের মধ্যে একখানা একটু পালিশ করা পাথর। সিজগাছের দুটা ডালের মাঝখানে পাথরখানা অনেক দিন আগে রাখা হইয়াছিল—তার পর ডাল বাড়িয়া উঠিয়াছে—দু দিক হইতে পাথরখানাকে

চাপিয়া ধরিয়াছে। অনেক টানিয়া পাথরখানা বাহির করিলাম—দেখিলাম উহাতে একটি বড়ো কারিকুরি করা W লেখা আছে। এইরূপ W- ই প্রায় ১০০০ বৎসর পূর্বে বৌদ্ধ ত্রিরত্ন চিহ্ন ছিল। মন্দিরের দক্ষিণ-পূর্বে একটা প্রকাণ্ড গাছ, অশ্বত্থ কি বট মনে নাই—গাছের তলায় বিস্তর আস্‌শেওড়ার গাছ। আস্‌শেওড়ার বনের মধ্যে একখানা পাথর পড়িয়া আছে। পাথরখানা তুলিয়া লইয়া দেখিলাম উহাতে একটি নাগকন্যার মূর্তি। কন্যার মাথার উপরে কয়েকটি নাগ ফণা ধরিয়া রহিয়াছে। ইহাকে মনসার মূর্তি বলা যাইতে পারে।

আমি থাকিতে থাকিতেই একজন জীর্ণ শীর্ণ ব্রাহ্মণ আসিয়া মন্দিরের দ্বার খুলিলেন। আমি দেখিলাম একটি মাটির বেদির উপর একখানি পাথর বসানো। উল্কার পাথরের মতো উহা চক্‌চক্ করিতেছে। ব্রাহ্মণের অনুমতি লইয়া আমি ঠাকুরের কাছে কোষাকুষি লইয়া সন্ধ্যা করিতে বসিলাম এবং এই সুযোগে ঘরের সব জিনিস দেখিয়া লইলাম। ব্রাহ্মণ শিকা হইতে একটি বড়ো হাঁড়ি পাড়িলেন, তাহা হইতে প্রায় সেরখানেক চাল বাহির করিলেন এবং ধুইয়া একখানা বড়ো থালে রাখিলেন। এটি তাঁর নৈবেদ্য। নৈবেদ্যের চারি দিকে কিছু কিছু উপকরণ রাখিলেন। পরে আঙুল দিয়া নৈবেদ্যটি দুই ভাগ করিয়া কাটিলেন; এইরূপ কাটায় নৈবেদ্যের মাথাটিও দুই ভাগে কাটিয়া গেল—তখন তিনি সেই দুই মাথায় দুটি সন্দেশ বসাইলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়, ও কী করিলেন? নৈবেদ্য দু ভাগে কাটিলেন কেন?" ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, "ইনি ধর্মঠাকুরও বটেন শিবও বটেন। তাই এক নৈবেদ্য দুই করা হয়।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কী মন্ত্রে নৈবেদ্য উৎসর্গ করেন?" তিনি বলিলেন, "শিবায় ধর্মরাজায় নমঃ।" আমি তাঁহাকে ধর্মঠাকুরের ধ্যান পড়িতে বলিলে তিনি বলিলেন, "আমি জানি না, যাঁর ঠাকুর তিনি জানেন, তিনি এখন এখানে নাই, আমার উপর ভার দিয়া গিয়াছেন, আমি যাহা জানি তাহাতেই পূজা করি।"

শুনিলাম ঠাকুর একজন গোয়ালার ছিলেন। সেই পূজা-অর্চা করিত, কিন্তু ঠাকুর যখন খুব জাগ্রত হইয়া উঠিলেন তখন ব্রাহ্মণেরাও মানত করিতে লাগিল। চারি দিকেই বড়ো বড়ো ব্রাহ্মণের গ্রাম; ব্রাহ্মণেরা গোয়ালার হাতে ঠাকুরের পূজা দিতে ইতস্তত করে দেখিয়া, গোয়ালা একজন দুর্দশাপন্ন ব্রাহ্মণকে পূজারি নিযুক্ত করিলেন। সে প্রথম প্রথম ব্রাহ্মণেরই পূজা দিত, পরে অন্য জাতেরও পূজা দিতে লাগিল। কিন্তু শুয়ার ও মুরগি বলির সময় সে আসিত না, মানতওয়ালারা ছোটো জাতের পণ্ডিত লইয়া আসিত। ক্রমে গোয়ালার বংশ লোপ হইয়া গেল। ব্রাহ্মণেরা প্রবল হইয়া উঠিল, এখন ঠাকুর তাঁদেরই—তাঁহারা সব হিন্দুর আচার-ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছেন। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি উহা ইংরাজি [১৮] ৯৩ কি ৯৪ সালে। [১৮] ৯৮ কি ৯৯ সালে আমি আর-একবার যাই। সেবার দেখি ধর্মঠাকুর মাটির বেদিতে আর নাই। তাঁহর নিচে বেশ একটি পরিষ্কার বড়ো গৌরীপট্ট হইয়াছে।

ক্রমে অনুসন্ধান করিতে করিতে শুনিলাম কলিকাতা শহরের মধ্যেই অনেক স্থানে ধর্মঠাকুরের মন্দির আছে। তাহার মধ্যে ৪৫নং জানবাজার রোডের ধর্মঠাকুর খুব প্রবল। তাঁহার একটি একতলা মন্দির আছে,মন্দিরের সামনে বারান্দা আছে; বারান্দার নিচে উঠান আছে; উঠানের পর রেলিং আছে। সিংহাসনখানি অনেক থাকের উপর। ধর্মঠাকুরের আসন সকলের উপর। তাঁহার নিচের থাকে গণেশ ও পঞ্চানন্দ। গণেশ ও পঞ্চানন্দের নিচে তিনখানি পাথর, মাঝেরখানি একটু ছোটো,বোধ হয় ত্রিরত্নের মূর্তি। এই তিনখানির নিচের থাকে শীতলা ও ষষ্ঠী, আর ঘরের কোণে জ্বরাসুর—প্রকাণ্ড মূর্তি, ত্রিপদ ও ত্রিশির।

ধর্মঠাকুরের চোখ আছে, এবং সেই তিনখানি পাথরেরও চোখ আছে। ধর্মঠাকুরের মানত করিলে অনেকে পাঁঠাও দেয়, কিন্তু পাঁঠা বলির সময় ধর্মঠাকুরের সামনের কপাটখানি বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়, কারণ ধর্মঠাকুর পরম বৈষ্ণব, মাংস খানও না প্রাণী-হিংসাও চান না। কিন্তু পঞ্চানন্দ বড়ো মাংসাশী—তিনি যেমন মাংস খান তেমনি মদও খান। তালতলা লেন নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন দে এই ধর্মঠাকুরের মানত করিয়া আপন সংসারের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন। তিনিই ধর্মঠাকুরের মন্দিরের মেরামত করিয়া দিয়াছেন, সৌষ্ঠব করিয়া দিয়াছেন। পূজা আদির ব্যবস্থাও তিনিই করেন। ধর্মঠাকুরের পূজারি একজন বর্ণ-ব্রাহ্মণ। বসন্তের চিকিৎসা ও শীতলার পূজা করিয়া তিনি বেশ সঙ্গতিপন্ন হইয়াছেন। হরিমোহনবাবুই আমাকে তন্ন তন্ন করিয়া মন্দিরটি দেখাইয়াছিলেন। পঞ্চানন্দের মদ্য পান ও মাংস আহারের সম্বন্ধে তিনি বলিলেন, ধর্মঠাকুর যে কেন এ মাতালটিকে সঙ্গে রাখেন জানি না। ওটার কিন্তু ক্ষমতা খুব—যে যা ধরে সে তাই পায়। কিন্তু ওটা মাতালের একশেষ। একদিন একটু মদ কম দেওয়া হইয়াছিল। সেইদিন হতে আর ওকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। নিকটস্থ সকল স্থান তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজা গেল, কিছুতেই পাওয়া গেল না। অনেকে পঞ্চানন্দের পূজা না হওয়ায়, নিজের আহারাদি বন্ধ করিয়া দিল। শেষ একদিন একজনকে স্বপ্ন দিলেন, "আমি জানবাজারের চৌমাথায় শুঁড়ির দোকানের একটা মদের জালার ভিতরে পড়ে আছি।" তখন ঢাকঢোল বাজাইয়া জালার ভিতর হইতে তাঁহাকে বাহির করা হইল। মহাসমারোহে তাঁহাকে আবার ধর্ম মন্দিরে স্থান দেওয়া হইল। হরিমোহনবাবু গদ্‌গদ ভাবে বলিলেন, "সেইদিন হইতে মহাশয়, আমি ওঁর জন্য রোজ এক বোতল মদের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি, যেন আর না পালায়।" হরিমোহনবাবুর গদ্‌গদ ভাব দেখিয়া আমি বাস্তবিক বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলাম।

বলরাম দে-র স্ট্রিটেও একটি ধর্মঠাকুর আছেন। কিন্তু সেখানে শীতলাই প্রবল। একটু বিশেষ মন দিয়া না খুঁজিলে ধর্মঠাকুরকে দেখিতেই পাওয়া যায় না।

এইরূপ নানা জায়গায় ধর্মঠাকুরের নানা মন্দির দেখিয়া ধর্মঠাকুর যে বৌদ্ধধর্মেরই অবশেষ তাহা আমার বেশ বিশ্বাস হইল। কিন্তু আমার বিশ্বাস হইলে তো হয় না। অন্যকে তো বোঝানো চাই। সুতরাং আমি আমার সুযোগ্য ভ্রমণকারী পণ্ডিত রাখালচন্দ্র কাব্যতীর্থ ও বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ দুই জনকেই যে যে স্থানে ধর্মঠাকুরের বড়ো বড়ো মন্দির আছে, সেই সেই স্থানে পুথি খোঁজার জন্য পাঠাইয়া দিই। তাঁহাদিগকে বলিয়া দিই, "যদি 'হাকন্দ পুরাণ' পাও বা ময়ূরভট্টের 'ধর্মমঙ্গল' পাও, অতি অবশ্য করিয়া লইয়া আসিবে; এবং কোনো প্রসিদ্ধ মন্দির দেখিলে মন্দিরের ও মন্দিরের দেবতার বিবরণ লিখিয়া আনিবে।" রাখালচন্দ্র বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত শলপ নামক স্থানে গিয়া দেখেন যে, ধর্মের মন্দিরে রীতিমতো ধ্যানস্থ বুদ্ধের মূর্তি রহিয়াছে। বিনোদবিহারী ময়নায় যাইয়া খবর দেন যে, ধর্মের মন্দিরে পূর্বে তিনটি জিনিস ছিল। একখানি পাথর, একটি শঙ্খ ও ধর্মঠাকুর। পাথরটি আর পাওয়া যায় না, শঙ্খটিও আর দেখা যায় না—কেবল ধর্মঠাকুরই আছেন; ধর্মঠাকুর দেখিতে কচ্ছপের মতো। ইহার পর শ্রীযুক্ত রাখাল চন্দ্র একখানি পুথি সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসেন—উহার নাম ধর্মপূজাবিধি'। আমার এখনকার সুযোগ্য সহকারী শ্রীযুক্ত বাবু ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় এ পুস্তকখানি ছাপাইতেছেন। পুস্তকখানি পড়িলেই বেশ বুঝা যাইবে ধর্মঠাকুর শিবও নন, বিষ্ণুও নন, ব্রহ্মাও নয়, কারণ ইঁহারা সকলেই

ধর্মঠাকুরের আবরণ দেবতা। ইঁহাদের ধ্যান, পূজা ও নমস্কারাদির ব্যবস্থা স্বতন্ত্র আছে। ধর্মঠাকুর ইঁহাদের ছাড়া; ইঁহাদের চেয়ে বড়ো। ধর্মঠাকুরের শক্তির নাম কামিন্যা। বল্লুকানদীর তীরে ইঁহার প্রথম আবির্ভাব হয়। আমি বল্লুকানদীর তীরে বড়ওয়ান গ্রামে এই ধর্মঠাকুরের মন্দির দেখিতে গিয়াছিলাম। এককালে ধর্মঠাকুরের খুব বড়ো মন্দির ছিল। ভাঙা মন্দিরের চিহ্ন এখনো অনেক জায়গায় আছে। এখনকার মন্দিরটি একটি প্রকাণ্ড একতলা ঘর; সামনে একটি বড়ো নাটমন্দির। মন্দিরের অধিকারী একজন স্ত্রীলোক, মুখী পণ্ডিত, সাধুভাষায় নাম মোক্ষদা। তিনি জাতিতে ডোম—নিজেই পূজা করেন; তবে পাল-পার্বণে একজন ব্যাকরণ-জানা ডোমের পণ্ডিত লইয়া আসেন। তিনিও "যস্যান্তো নাদিমধ্যো" ইত্যাদি মন্ত্রে ধর্মঠাকুরের পূজা করিয়া থাকেন।

ধর্মঠাকুরের মূর্তি কচ্ছপের ন্যায়। এইটি বুঝিতে হইলে বৌদ্ধধর্মের অনেক কথা বুঝিতে হয়। বৌদ্ধদের তিনটি রত্ন ছিল। তিনটিই উপাসনার বস্তু—বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ। বুদ্ধ বলিতে শাক্যসিংহ বুঝাইত, ধর্ম বলিতে গ্রন্থাবলী বুঝাইত এবং সংঘ বলিতে ভিক্ষুমণ্ডলী বুঝাইত। কোনো কোনো সম্প্রদায় বুদ্ধকে প্রথম স্থান না দিয়া ধর্মকেই প্রথম স্থান দিতেন। তাঁহাদের মতে ত্রিরত্ন হইত "ধর্ম, বুদ্ধ ও সংঘ"। ক্রমে ধর্ম বলিতে স্তূপ বুঝাইত। পূর্ব পূর্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, মহাযান মতে শাক্যসিংহ কেবলমাত্র লেখক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন—ত্রিরত্নের মধ্যে তাঁহার স্থান নাই। সেখানে ধ্যানীবুদ্ধেরা[৪] আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এই-সকল ধ্যানীবুদ্ধ অনাদি ও অনন্ত। ধ্যানীবুদ্ধগণের মন্দির ক্রমে স্তূপের গায়েই আসিয়া উপস্থিত হইল। অর্থাৎ ধর্ম ও তথাগত এক হইয়া গেল। স্তূপের গায়ে কুলুঙ্গি কাটা হইতে লাগিল। পূর্বের কুলুঙ্গিতে অক্ষোভ্য বসিলেন, পশ্চিমে অমিতাভ, দক্ষিণে রত্নসম্ভব, এবং উত্তরে অমোঘসিদ্ধি। প্রথম ধ্যানীবুদ্ধ যে বৈরোচন তিনি স্তূপের ঠিক মধ্যস্থলে থাকিতেন। এইরূপ চারিটি কুলুঙ্গিওয়ালা স্তূপই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। কিছুকাল পরে প্রধান ধ্যানীবুদ্ধকে এরূপে লুকাইয়া রাখা লোকে পছন্দ করিল না। দক্ষিণ-পূর্ব কোণে আর-একটি কুলুঙ্গি করিয়া সেইখানে তাঁহার স্থান করিয়া দিল। পাঁচটি কুলুঙ্গিওয়ালা স্তূপ দেখিতে ঠিক কচ্ছপের মতো হইল। আমাদের ধর্মঠাকুর কচ্ছপাকৃতি। সুতরাং তিনি এই শেষকালের স্তূপেরই অনুকরণ। স্তূপ আবার ধর্মের প্রতিমূর্তি। সুতরাং স্তূপ, ধর্ম এবং কচ্ছপাকৃতি তিনই এক হইয়া গেল। ইহাতেই মনে হয় কচ্ছপাকৃতি ধর্মঠাকুর পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের মূর্তির সহিত ধর্মমূর্তির স্তূপ—আর-কেহ নহে।

এখন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে—সংঘ কোথায় গেল। মহাযানে সংঘ বোধিসত্ত্ব[৫] রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। অনেক বোধিসত্ত্বের স্বতন্ত্র পূজা হইত। এখন ভদ্রকল্প[৬] চলিতেছে। এ কল্পে অমিতাভের পালা। অমিতাভের বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর, তিনিই কর্তা, তিনিই জগৎ উদ্ধার করিতেছেন, তাঁর সহস্র সহস্র নাম, তাঁর সহস্র স্বতন্ত্র মন্দির আছে। স্তূপ হইতে তাঁহাকে এখন পৃথক করিয়া লওয়া হইয়াছে—ত্রিরত্ন এখন আর নাই। মাত্র ধর্মঠাকুর আছেন। ঐ যে বিনোদবিহারী বলিয়াছেন যে, ময়নায় পূর্বে একখানি পাথর, ধর্মঠাকুর ও শঙ্খ পাওয়া গিয়াছিল। পাথর লোপ পাইয়াছে অর্থাৎ ত্রিরত্নের বুদ্ধ লোপ পাইয়াছেন। শঙ্খও নাই অর্থাৎ সংঘও নাই। আছেন কেবল ধর্মঠাকুর—কচ্ছপাকৃতি।

নেপালে প্রত্যেক বিহারে ফটকের কাছে দেখিবে, এক-একটি হারীতির মন্দির। হারীতিই বসন্তের দেবতা, আমাদের দেশের শীতলা। বিহারবাসী বৌদ্ধ-ভিক্ষুরা

শীতলাকে বড়ো ভয় করিতেন, সেইজন্য তাঁহারা হারীতিকে পূজা না দিয়া, বিহারে প্রবেশ করিতেন না। আমাদের এখানেও ধর্মঠাকুরের সহিত শীতলার খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে ধর্মঠাকুরের মন্দির সেইখানেই প্রায় শীতলা।

গণেশ ও মহাকাল নেপালে বুদ্ধমন্দিরের দ্বার-দেবতা। যেখানে বুদ্ধের মন্দির, মন্দিরের মধ্যে ছোটো চৈত্যই থাকুক বা শাক্যসিংহের মূর্তিই থাকুক—দ্বারের একদিকে গণেশ, একদিকে মহাকাল। নেপালে দু জনেই মাংসাশী, দু জনেই মাতাল। বাংলায় মহাকালের জায়গায় পঞ্চানন্দ হইয়াছেন। বাংলায় গণেশ মাংস খান না, কিন্তু পঞ্চানন্দ বড়ো মাংসাশী। হরিমোহনবাবু পঞ্চানন্দের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা পূর্বেই বলিয়াছি।

তার পর ধর্মঠাকুরের চোখ। এখন তো লোকে Paper-fastener দিয়া ধর্মঠাকুর ও শীতলার চোখ তৈয়ার করিয়া থাকে। কিন্তু চোখ স্তূপের একটা অঙ্গ। স্তূপের গোল শেষ হইয়া গেলে তাহার উপর একটা চৌকা জিনিস থাকে। তাহার চারি দিকেই দুইটা করিয়া চোখ থাকে। তথাগত প্রাতঃকালে উঠিয়াই একবার চারিটি দিক অবলোকন করিতেন। তিনি চক্ষু হইতে শ্বেত, নীল, পীত, লোহিত প্রভৃতি নানা বর্ণের রশ্মি বাহির করিয়া ত্রিসাহস্র মহাসাহস্র লোকধাতুর[৭] অন্ত পর্যন্ত অবলোকন করিতেন। সেইজন্য এই ত্রিসাহস্র মহাসাহস্র লোকধাতুর নাম অবলোকিত। সুতরাং স্তূপের গোলার্ধের উপর চারি দিকে চার জোড়া চোখ থাকাই উচিত। এখনকার ধর্মঠাকুরেরও সেইজন্য অনেক চক্ষু। ইহাতেও ধর্মঠাকুরকে পুরানো বৌদ্ধধর্মের শেষ বলিয়া মনে হয়।

আমরা শাক্যসিংহের মতাবলম্বীদিগকে বৌদ্ধ বলিয়া থাকি, কিন্তু তাহারা আপনাদিগকে কী বলিত? তাহারা আপনাদিগকে সদ্ধর্মী বলিত এবং আপনাদের ধর্মকে সদ্ধর্ম বলিত। অনেক জায়গায় দ ও ধ-য়ের যে সংযুক্ত বর্ণ তাহার পরিবর্তে শুধু ধ বলিত। অশোকের শিলালিপিতে বৌদ্ধধর্মের নাম সধর্ম। অনেক সংস্কৃত পুস্তকেও উহার নাম সধর্ম। রামাই পণ্ডিত ধর্মঠাকুরের পূজার পদ্ধতি লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি নিরঞ্জনের উষ্মা নামে যে ছড়া লিখিয়াছেন তাহাতেও ধর্মঠাকুরের পূজকদিগকে সধর্মী বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং রামাই পণ্ডিতও মনে করিতেন যে, ধর্মঠাকুরের পূজা ও বৌদ্ধধর্ম এক। ছড়াটি পরে দেওয়া গেল। এ ছড়া পড়িলে আরো বোধ হইবে যে, ধর্মঠাকুরের পূজা বৌদ্ধধর্মের ন্যায় ব্রাহ্মণবিরোধী ধর্ম। কারণ ছড়ায় বলিতেছে, "ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত অত্যাচার করাতেই সধর্মীরা ধর্মঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করে—আপনি আমাদের আপদ উদ্ধার করুন। ধর্মঠাকুর অমনি মুসলমান মূর্তি ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে জব্দ করিয়া দিলেন।"

শ্রীনিরঞ্জনের উষ্মা।

জাজপুর পুরবাদি সোলসয় ঘর বেদি
বেদি লয় কর লয় দুন।
দক্ষিণা মাগিতে যায় যার ঘরে নাহি পায়
শাঁপ দিয়া পোড়ায় ভুবন ॥
মালদহে লাগে কর না চিনে আপন পর
জালের নাইর দিশ পাস।

বোলিষ্ঠ হইল বড় দশবিশ হইয়া জোড়
সধর্ম্মীকে করএ বিনাশ ॥
বেদে করে উচ্চারণ বেব্যায় অগ্নি ঘনে ঘন
দেখিয়া সভাই কম্পমান।
মনেতে পাইয়া মর্ম্ম সবে বলে রাখ ধর্ম্ম
তোমা বিনে কে করে পরিত্রাণ ॥
এইরূপে দ্বিজগণ করে ছিষ্টি সংহারণ
এ বড় হইল অবিচার।
বৈকুণ্ঠে থাকিয়া ধর্ম্ম মনেতে পাইয়া মর্ম্ম
মায়াতে হইল অন্ধকার ॥
ধর্ম্ম হইল যবনরূপী মাথায়েতে কাল টুপি
হাতে শোভে তীরুচ কামান।
চাপিয়া উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদার বলিয়া এক নাম ॥
নিরঞ্জন নিরাকার হইল্য ভেস্ত অবতার
মুখেতে বলেন দম্মাদার।
যতেক দেবতাগণ সবে হয়্যা একমন
আনন্দে পরিল ইজার ॥
ব্রহ্মা হইলা মহাম্মদ বিষ্ণু হইলা পেগাম্বর
আদম্ফ হইল শূলপাণি।
গণেশ হইল গাজি কার্ত্তিক হইল কাজী
ফকির হইল যত মুনি ॥
তেজিয়া আপন ভেক নারদা হইল্য সেক
পুরন্দর হইলা মৌলানা।
চন্দ্র সূর্য্য আদি দেবে পদাতিক হয়্যা সবে
সবে মেলি বাজায় বাজনা ॥
আপুনি চণ্ডিকাদেবী তিঁহ হইল্যা হায়া বিবি
পদ্মাবতী হইল বিবিনূর।
যতেক দেবতাগণ হয়্যা সবে একমন
প্রবেশ করিল জাজপুর ॥
দেউল দেহারা ভাঙ্গে কাড়া কিড়্যা খায় রঙ্গে
পাখড় পাখড় বলে বোল।
ধরিয়া ধর্ম্মের পায় রামাই পণ্ডিত গায়
ই বড় বিষম গণ্ডগোল ॥

'নারায়ণ'
মাঘ, ১৩২২ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য

এই প্রবন্ধে ধর্ম-পূজা বিষয়ে উল্লেখগুলি সম্পর্কে তথ্যের জন্য "রমাই পণ্ডিতের ধর্মমঙ্গল' প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক তথ্য অংশ দ্রষ্টব্য। পৃ. ২২২-৩২।

১. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ প্রকাশিত *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ* ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৯৯ সূত্র ৩ দ্র.

২. নেপালে রেসিডেন্সির হেড-পণ্ডিত অমৃতানন্দর সঙ্গে হজ্‌সনের প্রগাঢ় বন্ধুতার সম্পর্ক ছিল। তথ্য সংগ্রহে তিনিই ছিলেন হজ্‌সনের প্রধান সহায়। হজ্‌সনের জীবনী লেখক হান্টার অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী, বিনয়ী এবং মর্যাদাময় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অমৃতানন্দের কথা সশ্রদ্ধভাবে উল্লেখ করেছেন। হান্টার বলেন, বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন এবং বুদ্ধদেব সম্পর্কে হজ্‌সন অমৃতানন্দকে কিছু প্রশ্ন করেছিলেন। অমৃতানন্দ যে উত্তর দিয়েছিলেন তারই ভাষ্য রচনা করে হজ্‌সন গবেষণার এক অজ্ঞাত এলাকা পাশ্চাত্ত্য গবেষকদের গোচরে এনে দেন। অমৃতানন্দ সংকলিত ২৫ স্তবকে সম্পূর্ণ 'নৈপালীয়-দেবতা-কল্যাণ পঞ্চ-বিংশতিকা'য় নেপালে পূজিত বিভিন্ন বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব ও হিন্দু দেবতার এবং তীর্থ ও চৈত্যের বিবরণ পাওয়া যায়। অমৃতানন্দের অনুলিপির উপরে নির্ভর করে ই. বি. কাওয়েল অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' প্রকাশ করেন। 'বুদ্ধচরিত'-এর কোনো পূর্ণাঙ্গ পুথি না পাওয়ায় অমৃতানন্দ নিজেই অংশত রচনা করে দিয়েছিলেন। দ্র. William Wilson Hunter, *Life of Brian Houghton Hodgson,* London 1896; Shastri 'A new MS. of Buddha Carita', *J-A-S-B,* N.S., Vol. V. 1909, p. 47; *H-I-L,* Vol. II, p. 378; হ-র-সং-২, পৃ. ৪৭০।

৩. অনুবাদ : যাঁর অন্ত্য নেই, আদি নেই, মধ্য নেই, কর নেই, চরণ নেই, দেহ নেই, আকার নেই, আদি নেই, যার জন্মও নেই, যিনি যোগীশ্রেষ্ঠ—জ্ঞানে যাঁকে জানা যায়, সকলের যিনি হিতকারী, সকল লোকের একমাত্র প্রভু, যিনি তত্ত্বস্বরূপ নিরঞ্জন এবং দেবতাদেরও যিনি বর দান করেন, সেই শূন্যমূর্তি তোমাদের রক্ষা করুন।

৪. এই বইয়ের পৃ. ৭১ (প্রাসঙ্গিক তথ্য), সূত্র ১০ দ্র.

৫. এই বইয়ের পৃ. ১৭-১৮ (প্রাসঙ্গিক তথ্য), সূত্র ১৪ দ্র.

৬. কল্প, পালি কপ্‌প। কাল পরিধি। শূন্য-কল্প এবং অশূন্য-কল্প বা বুদ্ধ-কল্প কল্পের দুই প্রকারভেদ। শূন্য-কল্পে কোনো বুদ্ধ বর্তমান থাকেন না। অশূন্য বা বুদ্ধ-কল্পে এক বা একাধিক বুদ্ধ বর্তমান থাকেন। আবির্ভূত বুদ্ধের সংখ্যার হিসাব অনুযায়ী অশূন্য-কল্পের পাঁচ প্রকারভেদ কল্পনা করা হয়। সারকপ্‌পো-য় একজন বুদ্ধ আবির্ভূত হন। মণ্ডকপ্‌পো-য় দু জন, বরকপ্‌পো-য় তিন জন, সারমণ্ডকপ্‌পো-য় চার জন এবং ভদ্দকপ্‌প—ভদ্রকল্প বা মহাভদ্রকল্পে পাঁচ জন বুদ্ধ আবির্ভূত হন। বর্তমানে চলতি কল্পকে ভদ্রকল্প ধরা হয়। এই কল্পে ককুসন্ধ, কোণাগমন কস্‌সপ এবং গোতম—চার জন বুদ্ধ আবির্ভূত হয়েছেন। মেত্তেয়—মৈত্রেয় বুদ্ধ আবির্ভূত হবেন। বৌদ্ধধর্মে জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত। বিশেষত মহাযানে অগণিত বুদ্ধের অস্তিত্ব কল্পিত হয়েছে।

৭. লোকধাতু অর্থ চক্রবাল। মহাবিশ্বলোকের উপাদান। মহাবিশ্বলোক বহু লোকধাতুর সমবায়।

১১

উড়িষ্যার জঙ্গলে

বৌদ্ধধর্ম কোথায় গেল খুঁজিতে খুঁজিতে বাংলায় ধর্মপূজা বৌদ্ধধর্মের শেষ বলিয়া বোধ হইল, তখন উড়িষ্যার জঙ্গলে আবার খোঁজ আরম্ভ হইল; যদি সেখানে পাওয়া যায়। সেখানে যে বৌদ্ধধর্মের কিছু কিছু আছে এরূপ প্রত্যাশা করিবার একটা কারণ এই যে, উড়িষ্যার গড়জাত মহলের মধ্যে একটি মহলের নাম বোধ অর্থাৎ বৌদ্ধ। সেখানে এখনো বৌদ্ধধর্মের কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। আর-একটা কারণ এই যে, গড়জাত ও কিল্লাজাত মহলের অনেক জায়গায়—এমন-কি মোগলবন্দিতেও পুরী ও কটক জেলার অনেক থানায় সরাকি নামে এক জাত তাঁতি বাস করে। তাহাদের বিবাহাদি শুভকার্যে এখনো বুদ্ধদেবের পূজা হইয়া থাকে। সরাকি তাঁতি বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া জেলাতেও আছে, কিন্তু তাহারা একেবারে হিন্দু হইয়া গিয়াছে—তাহাদের ক্রিয়াকর্মে এখন বৌদ্ধধর্মের গন্ধও নাই। "সরাকি" শব্দের ব্যুৎপত্তি করিলে দেখা যায় যে, উহা "শ্রাবক" শব্দের অপভ্রংশ। সুতরাং সরাকিরা যে এককালে বৌদ্ধ ছিল ইহাতে আর সন্দেহ নাই। উড়িষ্যায় উহারা এখনো অনেকটা বৌদ্ধ।[১]

মুসলমানদের হাতে বাংলার বৌদ্ধধর্ম নষ্ট হয়। উড়িষ্যাতে তো সে সময় মুসলমানেরা যাইতে পারে নাই। উড়িয়ারা আর চারি শত বৎসর পর্যন্ত স্বাধীন ছিল। সুতরাং বাংলায় যেভাবে বৌদ্ধধর্ম লোপ হইয়াছিল উড়িষ্যায় সেভাবে হয় নাই। বিশেষ উড়িষ্যার জগন্নাথদেব নিজেই বুদ্ধমূর্তি। এখন তিনি নারায়ণের অবতার হইলেও নবম অবতার অর্থাৎ বুদ্ধ অবতার। চূড়ামণি দাস চৈতন্যচরিত লিখিতে গিয়া জগন্নাথদেবকে বুদ্ধ অবতারই বলিয়া গিয়াছেন।[২] কিন্তু উড়িষ্যার জঙ্গলে বৌদ্ধধর্ম বাহির করিয়াছেন শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু।[৩] তিনি দিনকতক বিনা বেতনে ময়ূরভঞ্জের আর্কিওলজিকেল সর্ভেয়র হইয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহাকে ময়ূরভঞ্জের জঙ্গলে অনেক ঘুরিতে হইয়াছিল, অনেক লোকের সহিত মিলিতে মিশিতে হইয়াছিল। তাহাতেই তিনি বুঝিতে পারেন যে, সেখানে এখনো বৌদ্ধধর্ম অনেক স্থানে চলে। তিনি এই ধর্মের অনেক উড়িয়া পুস্তকও সংগ্রহ করিয়াছেন। এ প্রবন্ধে আমরা তাহারই আলোচনা করিব।

কিন্তু নগেনবাবুর সব কথা বুঝিতে হইলে, উড়িষ্যায় বৌদ্ধধর্ম কতদিন হইতে চলিতেছিল ও ঐ ধর্ম সেখানে কিরূপ গোড়া গাড়িয়া বসিয়াছিল, তাহার কতক কতক জানা আবশ্যক। তাই আরো একটু পুরানো কথা আলোচনা করিব, পরে নগেন্দ্রবাবুর কথা বলিব।

অশোকেরও পূর্বে উড়িষ্যা দেশে বিশেষ ভুবনেশ্বরের চারি পাশে বৌদ্ধধর্ম বেশ প্রবল হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। স্পুনর [D.Brained Spooner] সাহেব একবার

আমাকে কয়েকখানি উড়িয়া লেখা তালপাতা দেখিতে দিয়াছিলেন, তাহা পড়িয়া এবং উদয়গিরির দু-একখানি লেখা পড়িয়া মনে হয় ঐর[৪] নামে একজন রাজা অশোকের অনেক পূর্বে মগধের হস্ত হইতে উড়িষ্যার উদ্ধার করিয়াছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্মের পক্ষপাতী ছিলেন এবং অনেক মঠ ও গুহা নির্মাণ করিয়াছিলেন। অশোকরাজা উড়িষ্যা জয় করেন এবং তথায় বৌদ্ধধর্মের খুব শ্রীবৃদ্ধি করেন। এখানে বলিয়া রাখি যে, উড়িষ্যা ও কলিঙ্গ প্রায় একই দেশ। কটক ও পুরী জেলা কলিঙ্গও বটে উড়িষ্যাও বটে। কিন্তু বালেশ্বরকে কখনো কলিঙ্গ বলে কিনা জানি না। অশোকের সময় কলিঙ্গর রাজধানী ছিল তোষলি। তোষলি জায়গাটা অনেক দিন খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই, কিন্তু এখন পাওয়া গিয়াছে—উহার এখনকার নাম ধৌলি, তোষলি শব্দেরই অপভ্রংশ। অশোকের তোষলি হইতে এখনকার ধৌলি এক মাইলের মধ্যে, দেখা যায়। অশোকের তোষলিতে একটি পাহাড়ের মাথা ছাঁটিয়া তথায় একটি হাতির মূর্তি বাহির করা হইয়াছে। হাতির মাথা আছে, শুঁড় আছে, সামনের দুটি পা আছে এবং ধড়ের অর্ধেকটা আছে। বাকিটা খুদিয়া বাহির করা হয় নাই। হাতির সামনে অনেকটা জায়গা বেশ খাঁজ কাটা আছে। বেশ করিয়া নিপুণ হইয়া সে খাঁজগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বোধ হয় পূর্বে সেখানে একটি কাঠের মন্দির ছিল। হাতিটি তাহার ভিতরে থাকিত। এই মন্দিরের নিচে পাহাড়ের গা বেশ পরিষ্কার করিয়া তাহাতে অশোকের একটি শিলালেখ আছে। অশোকের অন্যান্য শিলালেখেও যতগুলি আজ্ঞা (Edict) থাকে এখানেও সেইগুলি আছে। অধিকের মধ্যে একটি নূতন আজ্ঞা আছে—সেটি এই যে, শ্রাবণমাসের কোন্ কোন্ তিথিতে তোষলির লোকদিগকে এই আজ্ঞাগুলি শুনাইয়া দিতে হইবে। সুতরাং অশোকের সময় বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য যে বিশেষ যত্ন করা হইয়াছিল তাহা বেশ বুঝা যায়।[৫] অশোকের পরে উড়িষ্যায় বোধ হয় জৈনধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়। কারণ উদয়গিরির হাতিগুম্ফায় যে প্রকাণ্ড শিলালেখ পাওয়া যায় সেটি জৈনলেখ। খণ্ডগিরিতেও জৈনধর্মের অনেক চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাই বলিয়া বৌদ্ধধর্ম সেখানে লোপ হয় নাই। হিয়েন-সাং যখন নালন্দায় পড়িতেছিলেন তখন উড়িষ্যার হীনযানীরা মহাযানীদিগকে কাপালিক বলিয়া গালি দিয়াছিল। হর্ষবর্ধন ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া হিয়েন-সাংকে বিচার করিবার জন্য উড়িষ্যায় পাঠাইয়াছিলেন।

মহাযান ধর্মে যখন নানা দেবদেবীর উপাসনা আরম্ভ হইল—অর্থাৎ বজ্রযান ধর্ম যখন প্রবল হইয়া উঠিল—তখন উড়িষ্যা বজ্রযানের একটি প্রধান কেল্লা হইয়া দাঁড়াইল। উড়িষ্যার রাজা ইন্দ্রভূতি বজ্রবারাহীর পূজা প্রকাশ করেন, তিনি বজ্রযানের অনেক পুস্তক লিখিয়া যান। উড়িষ্যা, বাংলা, মগধ, নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি দেশে তাঁহার মতের খুব আদর ছিল। তাঁহার এক মেয়ে ছিলেন, নাম লক্ষ্মীঙ্করা।[৬] তিনিও বজ্রযান মতের অনেক পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। উড়িষ্যার তেলি, কায়স্থ প্রভৃতি জাতের লোকেও অনেক পুস্তক লিখিয়াছেন। এই-সকল পুস্তকেরই তিব্বতি ভাষায় তর্জমা আছে এবং তিব্বতি লোকে আদর করিয়া পড়ে।

ইন্দ্রভূতির পর সোমবংশ, কেশরীবংশ, গঙ্গবংশ, গজপতিবংশ ও সর্বশেষে তেলেঙ্গা মুকুন্দদেব উড়িষ্যায় রাজত্ব করেন।[৭] ইঁহাদের সময়ে উড়িষ্যায় বৌদ্ধও ছিল, হিন্দুও ছিল। ব্রাহ্মণেরও প্রতিপত্তি ছিল, বিহারবাসী ভিক্ষুদেরও প্রতিপত্তি ছিল; কিন্তু রাজা হিন্দু হওয়ায় এবং রাজসভায় ব্রাহ্মণদিগের প্রতিপত্তি অধিক হওয়ায়, এবং মুসলমান ইতিহাস লেখকেরা হিন্দু ও বৌদ্ধের ভেদ করিতে না পারায়, উড়িষ্যা হিন্দুর দেশ বলিয়াই পরিচিত হইত। মগধ ও বাংলার বৌদ্ধ-পণ্ডিতেরা লোপ হইয়া যাওয়ায় উড়িষ্যার বৌদ্ধেরা অতি হীন ভাবে বাস করিত। নগেন্দ্রবাবু যে-সকল পুস্তক আনিয়াছেন তাহা হইতে দেখা যায়, প্রতাপ রুদ্রের সময় ১৫০০ হইতে ১৫৩৩ পর্যন্ত বৌদ্ধদিগের উপর উড়িষ্যায় অত্যন্ত উৎপাত হইয়াছিল। বড়ো বড়ো বৌদ্ধগণ বাহিরে বৈষ্ণব সাজিয়া থাকিতেন কিন্তু তাঁহাদের মত চলিত বৈষ্ণবধর্ম হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাঁহারা শূন্যপুরুষ মানিতেন। শূন্যপুরুষকেই বিষ্ণু মনে করিয়া পূজা করিতেন। তাঁহারা অলেখ শব্দ সর্বদাই ব্যবহার করিতেন। অলেখ অর্থাৎ অরেখ অর্থাৎ কোনো দাগ নাই। নিরঞ্জন শব্দও এই অর্থে ব্যবহার হইয়া থাকে—

"জয় ধর্ম্ম শ্রী পুরুষোত্তম। অনাদি স্তুতি পরমব্রহ্ম ॥ ১
অব্যক্ত পুরুষ নিরাকার হরি। সর্ব্ব ঘটে অচ্ছু ব্রহ্মরূপ ধরি ॥২
নাহি রেখ রূপ তোর শ্রীবিজ্ঞপুরুষ। বিষ্ণুর গোচর হইছু প্রকাশ ॥৩
মন-নয়ন-চিত-চেতন নাহি তোর। কর্ম্ম ধর্ম্ম সর্ব্ব ঠারে সিদ্ধ ন কর ॥৪
মহামূল্য তোর নাম। ওঁকার শব্দ এ যে বেদান্ত আগম॥"

(Modern Buddhism—P. 41)
[বলরাম দাস, 'ব্রহ্মাণ্ড-ভূগোল-গীতা']

আবার—

"তোহর রূপ রেখ নাহী। শূন্য পুরুষ শূন্যদেহী ॥
বোইলে শূন্য তোর দেহো। আবর নাম থিব কাহোঁ ॥
শূন্য রে ব্রহ্মসিনা থাহি। সেঠারে নাম থিব রহি ॥"

(Modern Buddhism—P. 40)
[বলরাম দাস, 'বিরাট-গীতা']

শূন্যবাদ ও ব্রহ্মবাদের কেমন অদ্ভুত মিলন। যিনি শূন্য তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই পুরুষোত্তম।[৮]

অচ্যুতানন্দ দাস, বলরাম দাস, জগন্নাথ দাস, অনন্ত দাস, যশোবন্ত দাস ও চৈতন্য দাস—ইঁহারাই এই বৈষ্ণবধর্মের প্রধান কবি।[৯] অচ্যুতানন্দ দাস প্রতাপরুদ্রের সময় নীলাচলে বাস করিতেন। বলরাম দাস 'প্রণব গীতা' লেখেন এবং মুক্তিমণ্ডপে বসিয়া বেদান্তমতে 'প্রণব গীতা'র ব্যাখ্যা করেন—তাহাতে ব্রাহ্মণেরা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অনবরত গালি দিতে থাকে। মহারাজ প্রতাপরুদ্রও রাগান্বিত হইয়া বলেন, "তুই শূদ্র, প্রণব উচ্চারণে ও বেদের ব্যাখ্যায় তোর কী অধিকার আছে?" তাহাতে বলরাম হাসিয়া বলেন, "শ্রীপতি কাহারো নিজস্ব নন্। যে ভক্ত, যে ধার্মিক, তাঁরই তিনি। জগন্নাথে

কাহারো একঁচেটিয়া অধিকার নাই। ব্রাহ্মণেরা কেবল দাম্ভিকতা করিয়া বলিতেছেন জগন্নাথ তাঁহাদেরই। আমি বেদের বচন উদ্ধার করিয়া এ-সকল কথা প্রমাণ করিতে পারি।" ব্রাহ্মণেরা শুনিয়া আরো রাগিয়া উঠিলেন এবং চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "করুক্, করুক্, এখনই করুক্, এখনই করুক্।" রাজাও তাহাতে সায় দিলেন। স্থির হইল, সকলে পরদিন প্রভাতে বলরামের আখড়ায় যাইবে এবং তথায় বিচার হইবে। বলরাম সেদিন ভয়ে আর বাড়ি গেলেন না—বটমূলে আশ্রয় লইলেন। গভীর নিশায় নরহরি আসিয়া বলরামকে দেখা দিলেন এবং তাঁহাকে ভরসা দিয়া গেলেন। পরদিন রাজা আসিয়া উপস্থিত হইলে বলরাম বলিলেন, "আপনি নিজে শূদ্রের মুখে বেদের ব্যাখ্যা শুনিতে চাহিয়াছেন, তাই আমি ব্যাখ্যা করিতেছি। আমি জড়, মূঢ়মতি, এখানে ভিক্ষা করিয়া খাই। আমি বেদ ব্যাখ্যা করিলে আপনি রাগত হইবেন না।" ব্রাহ্মণেরা বলিল, "ও যদি বেদ ব্যাখ্যা করিতে পারে আমরা পরাজয় স্বীকার করিব।" বলরাম বলিলেন, "তবে শুনুন। নিত্য হইতে শূন্যের উৎপত্তি; শূন্য হইতে প্রণবের উৎপত্তি; প্রণব হইতে শব্দের উৎপত্তি; শব্দ হইতে বেদের উৎপত্তি; বেদ হইতে সমস্ত জগতের উৎপত্তি।" এই কথা শুনিয়া রাজা ও ব্রাহ্মণেরা সকলেই আশ্চর্য হইয়া গেলেন এবং বলরামের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

একবার প্রতাপরুদ্র রাজার বাড়িতে চুরি হইয়া গিয়াছিল। রাজা ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ-পণ্ডিতদিগকে আনাইয়া চুরির ঠিকানা করিতে বলিলেন। ব্রাহ্মণেরা পারিল না, বৌদ্ধেরা পারিল। সুতরাং রাজা বৌদ্ধদিগকে আশ্রয় দিলেন। কিন্তু রানী তাহাতে ভারি চটিয়া গেলেন। তখন ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধের মধ্যে কে বড়ো আবার পরীক্ষা হইল। একটা মুখঢাকা হাঁড়ি সভায় আনা হইল এবং জিজ্ঞাসা করা হইল এ হাঁড়িতে কী আছে? তাহার ভিতরে ছিল সাপ। ব্রাহ্মণেরা বলিল, "মাটি আছে।" ঢাকা খুলিলে মাটিই দেখা গেল। ব্রাহ্মণদের উপর রাজার ভক্তি বাড়িয়া গেল। তিনি বৌদ্ধদিগকে তাড়াইয়া দিলেন এবং তাহাদের উপর ঘোরতর অত্যাচার করিতে লাগিলেন। এই সময় বোধ হয় বলরাম দাসকেও পলাইয়া যাইতে হয়। প্রতাপরুদ্রের মৃত্যুর বাইশ বৎসর পরে তেলেঙ্গা মুকুন্দদেব রাজা হইলে বলরাম আবার ফিরিয়া আসিলেন—কারণ মুকুন্দদেব বৌদ্ধ ছিলেন এবং বৌদ্ধদিগকে যথেষ্ট আদর করিতেন। মঙ্গোলিয়ার অন্তর্গত উর্গা নগরের প্রধান লামা তারনাথ এই সময় ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অবস্থা জানিবার জন্য যে লোক পাঠাইয়াছিলেন[১০] তিনি বলিয়া গিয়াছেন, উড়িষ্যার রাজা তেলেঙ্গা মুকুন্দদেব বৌদ্ধ এবং তাঁহার রাজত্বে বৌদ্ধধর্মের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইল গড়জাত মহলে মহিমাধর্ম[১১] নামে এক নূতন ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে। এ ধর্ম নীচ জাতির মধ্যেই চলে। প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের সঙ্গের ইহার যথেষ্ট মিল আছে। এ ধর্মেও অলেখ পুরুষ, শূন্য পুরুষের পূজা আছে। ইহাতেও জাতিভেদ নাই। ইহাও সন্ন্যাসীর ধর্ম। এ ধর্মেও ভিক্ষা করিয়া খাইতে হয়। এ ধর্মের প্রধান গুরু ভীমভোই—ইঁহার পুরা নাম ভীমসেন ভোই অরক্ষিতদাস।[১২] ধেকানল রাজ্যে জুরন্দাগ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি জন্মান্ধ ছিলেন এবং অতি নীচ কন্ধ জাতিতে ইঁহার

জন্ম। ইতি ধান ভানিয়া খাইতেন। কিন্তু ভগবানের প্রতি ইঁহার অত্যন্ত ভক্তি ছিল। একুশ বৎসর বয়সে ইনি মনের দুঃখে ঘরবাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া যান, এবং আত্মহত্যা করিবার উদ্যোগে থাকেন। একদিন যাইতে যাইতে তিনি এক কুয়ার মধ্যে পড়িয়া যান। কুয়ার মধ্যে তিন দিন তিন রাত্রি কাটিয়া গেল। নিকটের লোকে তাঁহাকে উঠাইবার অনেক চেষ্টা করিল কিন্তু তিনি উঠিতে চাহিলেন না। তিন দিনের দিন রাত্রিশেষে ভগবান্ নিজ মূর্তি ধরিয়া কুয়ার উপর দাঁড়াইলেন এবং ভীমভোইকে ডাকিতে লাগিলেন, "ভীম, তুমি উপর দিকে চাহ—দেখ আমি আসিয়াছি।" ভীম অন্ধ ছিলেন, হঠাৎ তাঁহার চক্ষু খুলিয়া গেল। তিনি ভগবান্‌কে দেখিলেন। ভগবান্‌ও হাত বাড়াইয়া তাঁহাকে কুয়া হইতে উঠাইয়া দিলেন। বলিলেন, "যাও, অলেখ ধর্ম প্রচার করো।" ভগবান্ তাঁহাকে একখানি কৌপীন দিলেন এবং বলিয়া দিলেন, "রান্না ভাত ছাড়া তুমি আর-কোনো জিনিস ভিক্ষা করিও না, গ্রহণও করিও না।" কৌপীন পরিয়া ভীমভোই যখন ভিক্ষা করিতে গেলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "একটা পেটের মতো চার্‌টিখানি ভাত দাও," তখন গাঁয়ের লোক সব হাসিয়া উঠিল। কিন্তু ভীম যখন ভাত ছাড়া আর-কিছু লইবেন না জানিল, তখন "এ লোকটা আমাদের জাত খাইতে আসিয়াছে" এই বলিয়া তাঁহাকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিল। তিনিও কৌপীন ফেলিয়া কপিলাশের দিকে যাইতে লাগিলেন। কিছুদূর গেল শূন্য পুরুষ তাঁহাকে দেখা দিলেন এবং রাগত হইয়া বলিলেন, "তোমার এখনো সিদ্ধি হয় নাই। নহিলে তুমি মার খাইয়া পলাইয়া আসিবে কেন?" এই বলিয়া তিনি ভীমভোইর হাত পা বাঁধিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহাকে একটা মন্দিরের মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিলেন এবং সে মন্দিরের অন্ধি সন্ধি সব বুজাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, "আমি বাহিরে বসিয়া তিন বার হাততালি দিব, তোমার যদি সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে, তো, তুমি বাহিরে আসিতে পারিবে।" তিন তালির পর ভীম যখন বাহিরে আসিলেন, তখন ভগবান্ বলিলেন, "ভীম, তোমার সিদ্ধি হইয়াছে। তুমি জুরন্দাতেই থাকো। তোমায় আর কোথাও যাইতে হইবে না। তুমি এখানে বসিয়াই অলেখ ধর্মের কবিতা লেখো।" ইহার পর ভীমভোই ভগবানের আজ্ঞায় বিবাহ করিলেন। তাঁহার সন্তানাদিও হইল। দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার শিষ্য হইতে লাগিল। তিনি অনেক কবিতা লিখিলেন। তাঁহার প্রধান পুস্তকের নাম 'কলি ভাগবত'। তাঁহার বহুতর ভজন ও পদাবলী আছে। দশ-বারো বৎসর হইল তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। ভীমভোই একবার সদলবলে জগন্নাথের মন্দির দখল করিতে গিয়াছিলেন কিন্তু সেখানে মার খাইয়া পলাইয়া আসিয়াছিলেন। 'যশোমতী মালিকা' নামক গ্রন্থে এই ধর্মের সমস্ত ইতিহাস পাওয়া যায়।

তাঁহার মতে যে গৃহত্যাগ করিবে সে—

সুজাতি যে কুলধর্ম্ম সমস্ত ছাড়িবে।
হোমকর্ম্ম যাগক্রিয়া সকল ত্যজিবে॥
দারাসুত বিত্তব্রত ক্রিয়া ত্যাজ্য করি।
কুম্ভিপট পিন্ধি শিরে থিবে জটাধরি॥

জম্বুদ্বীপে মহিমাঙ্ক বীজ সে বুনিবে।
নিজ ব্রহ্ম গুরু পাই আনন্দ লভিবে ॥
অনাকার মহিমা নামকু করি শিক্ষা।
নব শূদ্র ঘরে মাগি খেলুথিবে ভিক্ষা।
তেলি তন্ত্রী ভাট কেরা রজক কুলারক।
ব্রহ্ম ক্ষেত্রী চণ্ডাল যে আবুরিলা পিক ॥
এহি নব জাতি ঘরে ভিক্ষা ন ঘেনিবে।
অশুদ্ধ এ মানে শাস্ত্রে লেখিয়াছি পূর্বে ॥
এ মানে অটন্তি অধা জন্মরু জাতকি।
তেনু করি নব শূদ্রে বাছি রখিছন্তি ॥
নব শূদ্র অটন্তি প্রভুঙ্ক নিজ দাস।
তাঙ্ক ঘরে অন্নভিক্ষা ন লগাই দোষ ॥
মহাব্রহ্মতেজরে যে হই যাই ভস্ম।
শূদ্র ঘরে ভিক্ষা কলে নাহি তাঙ্কু দুষ্য ॥
নব শূদ্র ঘরে অন্ন ভিক্ষাকু ভুজিবে।
নগর বাহারে কাল নিদ্রাকু কাটিবে ॥
দিবসরে নিদ্রা কলে কাল করে বাস।
রাত্রে অন্নভোজন আহারে হয় দোষ ॥
প্রভুঙ্কর ভক্ত যে দিবসে ভুঞ্জিবে।
রাত্রে উপবাস যমকালুকু জগিবে ॥
নিশি উজাগরে রহি ধুনিকি জগিবু।
পঞ্চিশ প্রকৃতি তেবে পশি করিবু ॥
জপ নাহি তপ নাহি উদাসী ভাবরে।
একা মহিমাকু নাম জপিবু হৃদরে ॥

বৌদ্ধ-ভিক্ষুদের বিনয়পিটকে'র নিয়মের সহিত এই-সকল নিয়মের অনেক মিল আছে। ভেকধারী বৈষ্ণবরা এ-সকল নিয়ম পালন করে না। বিশেষত বৈষ্ণবেরা নীচ জাতির অন্ন গ্রহণ করে না। নীচ জাতির অন্ন মহিমা-ধর্মীর পক্ষে শুদ্ধ। ইহারা কুশ্ত নামক গাছের বাকল পরে, নেই জন্য ইহাদিগকে কুশ্তপটিয়া বলে।

ইহাদের মতে বুদ্ধদেব অলেখ ব্রহ্মের উপাসনা প্রচারের জন্য এবং জগৎ উদ্ধারের জন্য বোধ মহলের গোলাসিংহা নামক স্থানে বাস করেন। জগন্নাথদেব লীলাচল ছাড়িয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি কাহার আজ্ঞায় এখানে আসিয়াছেন?" বুদ্ধদেব বলেন, "আমি অলেখের আজ্ঞায় আসিয়াছি। অলেখই পরাৎপর গুরু।" বুদ্ধদেব জগন্নাথকে সমাধিস্থ হইয়া কপিলাশে থাকিতে বলেন। তিনিও বারো বৎসর দুধ ও জল খাইয়া কপিলাশে থাকেন। সমাধির অন্তে জগন্নাথ ভীমভোইয়ের জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া দিয়া অন্তর্ধান হন।

ভীমভোই বুদ্ধস্বামীর উদ্দেশে এই গানটি লিখিয়াছিলেন—

অনাকার অরূপ ব্রহ্ম-মূরতি হে।
এবে বিজে করিছন্তি ধরিতী হে ॥ (পদ)
অরূপ পুরুষ রূপবন্ত হোইলে
ব্রহ্মাণ্ডকু আইলে,
ভকত হিতাকারী করুণা কৃপাধারী,
মায়াসিন্ধুসাগরু এবে উধার করি,
পিণ্ডপ্রাণকু দেই কর ভকতি হে ॥ ১
অগমিকা পুরুষ নামকু বহি,
রক্ষা নিমন্তে মহি
নির্ব্বেদরু প্রকাশ মহিমা দীক্ষা রস,
ভজি যেবে পারিব জীব পূর্ব্ব কল্মষ,
তেবে পাইব সদগতি মুকতি হে ॥ ২
অচিহ্ন পুরুষ সে যে চিহ্নিবা দেলে,
আপে অতিথি হেলে,
অলেখ পদ যেহু লেখি ন হোই সেহু,
গুরু পণে শকতা অটন্তি মহাবাহু,
একুইশ ভুবনে সেহু নৃপতি হে ॥ ৩
অকল্পন পুরুষ সে কল্পন কলে,
অঙ্গু সর্ব্বে জনমিলে,
আজ সে করতাঙ্ক নেত্র রে দেখু দেখু,
নিন্দিত করু অচ্ছ ভজুঅচ্ছ কাহাকু,
এবে মহিমা-ধর্ম্ম অচ্ছি পিরিথি হে ॥ ৪
অক্ষয় পুরুষ ক্ষয় হেবাকু নাহি,
একু নহি দুই ব্রহ্মাণ্ডে গুরুবীজে
শিষ্য নাহান্তি কেহি
বড়ুহি মা পণে সর্ব্বে দিন যাউছি হি,
গুরুদর্শনে খণ্ড কাল বিপতি হে ॥৫
দেহধারী হইছন্তি মহীমণ্ডলে,
এ ঘোর কলিকালে,
এবনা একাক্ষর বানাহি বীরবর
বচন সুধাধার মুক্তিদানী পয়র
ভণে ভীম অরক্ষিত করি বিনতি হে ॥৬

'নারায়ণ'
চৈত্র, ১৩২২ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. এই বইয়ের পৃ. ১১৩ (প্রাসঙ্গিক তথ্য), সূত্র ১৩ দ্র.

২. এই বইয়ের পৃ. ১১-১১২ (প্রাসঙ্গিক তথ্য), সূত্র ৭ এবং ৮ দ্র.

৩. নগেন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন—

"In November 1908, I was required to accompany the Feudatory Chief of Mayurabhanja on an Archaeological tour in the interior of his territories. We paid a visit to Khiching, which was once an important seat of the Bhanja Rajas. I mixed with the humble people of the neighbouring villages, and from this close contact with them observed some curious customs and manners amongst them which bear little affinity to those of the Hindus, At this stage a band of merry lads of the Pan caste entartained me with their songs, which were all upon the texts of the *Dharmagita.* The songs interested me very much, as in the texts I found distinct indications of the tenents of Mahayana Buddhism. Shortly after this I met some old men, who recited the songs of the Pala kings of Bengal. These also belong to the period of the Buddhistic ascendancy. I was now convinced that Buddhism was not altogether a lost religion in Orissa. My curiosity being thus roused, I hunted after and soon laid my hands upon some old Oriya MSS. which proved that Buddhism flourished in this part of the century so late as the 16th and 17th centuries. I now studied with care the sacred books of the Mahimadharmists and some other sects, who inhabit Khiching and various parts of Keonjhar, Dhenkanal and other gadajats, and found that these people unmistakably profess Buddhistic tenents inspite of their not being recognised as Buddhists by the people. In comparatively recent times there has been a revival of this school of Buddhism." *The Modern Buddhism and its followers in Orissa,* Calcutta 1911, Preface.

৪. ঐর নামে এক রাজা মগধের অধিকার থেকে উড়িষ্যা উদ্ধার করেছিলেন এই ধারণার কোনো ভিত্তি নেই। ভুবনেশ্বর থেকে ৬ কিলোমিটার পশ্চিমে উদয়গিরি পাহাড়ের ১৪ সংখ্যক গুহা হাথিগুম্ফায় মহামেঘবাহন বংশের তৃতীয় রাজা খারবেলের পরিচয় সূচক ১৭ পঙ্‌ক্তির একটি লেখ উৎকীর্ণ আছে। লেখটির অনুবাদ : "অর্হৎদের নমস্কার, সর্ব-সিদ্ধকে নমস্কার। ঐর, মহারাজ, গজপতি, চেদিরাজবংশবর্ধন, প্রশস্ত-শুভলক্ষণসম্পন্ন, চতুর্দিগাহৃতগুণসমূহযুক্ত, কলিঙ্গাধিপতি শ্রীখারবেল পনেরো বৎসর যাবৎ শ্রীকড়ার (কিশোর কৃষ্ণ?) শরীর ধারণ করে বালক্রীড়া করলেন। তারপর লেখ-রূপ-গণনা-ব্যবহারবিধি-বিশারদ এবং সর্ববিদ্যাভূষিত হয়ে নয় বৎসর ধরে যৌবরাজ্য শাসন করলেন।" ওড়িশা এবং অন্ধ্র প্রদেশের সমুদ্রের তীরবর্তী অঞ্চলে বৈতরণী থেকে

গোদাবরী, পরে কৃষ্ণা থেকে মহানদী পর্যন্ত ভূভাগ কলিঙ্গ নামে পরিচিত ছিল। খৃস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের প্রথম দিকে নন্দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা মহাপদ্ম নন্দ কলিঙ্গ জয় করেন। পরে খৃস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে অশোক (আ. খৃ. পূ. ২৭৩-২৩৬) তাঁর রাজত্বের নবম রাজ্যাঙ্কে কলিঙ্গ অধিকার করেন। মগধ সাম্রাজ্যের পতনের পরে খৃস্টপূর্ব প্রথম শতকে কলিঙ্গে চেদিকুলের একটি শাখা মহামেঘবাহন রাজবংশের অভ্যুদয় হয়। হাথিগুম্ফার লেখ থেকে জানা যায় এই বংশের রাজা খারবেল খৃস্টপূর্ব প্রথম শতকে কয়েকবার মগধ আক্রমণ করেছিলেন। নন্দরাজা একটি জিনমূর্তি কলিঙ্গ থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন, খারবেল সেটি ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। উদয়গিরি-খণ্ডগিরি একটি অতি প্রাচীন জৈন কেন্দ্র। খারবেল বৌদ্ধ নয়, জৈনধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষে তিনি কুমারী-পর্বতে (উদয়গিরি-খণ্ডগিরি) জৈন সন্ন্যাসীদের জন্য গুম্ফা তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন। ধর্মমতে জৈন হলেও খারবেল অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। খারবেল-লেখের ভাষা কতকটা দক্ষিণ-পশ্চিমার মতো। অশোকের গির্ণার অনুশাসনের, বিশেষ করে পালি ভাষার সঙ্গে এর মিল আছে। গুরুগম্ভীর সংস্কৃত গদ্যরীতির অনুকরণের চেষ্টা আছে—যা প্রাকৃতের উপরে সংস্কৃতের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের নিদর্শন। দ্র. দীনেশচন্দ্র সরকার, "ওড়িশা", "খারবেল", 'ভারতকোষ'; Debala Mitra, *UDAYAGIRI and KHANDAGIRI,* Archaeological Survey of India, New Delhi 1975.

৫. ধৌলি এবং জৌগড়ায় ১১, ১২, ১৩ সংখ্যক মুখ্য গিরিশাসনের পরিবর্তে দুটি নতুন গিরিশাসন পাওয়া গেছে। এ দুটিকে কলিঙ্গের স্বতন্ত্র গিরিশাসন বলা হয়ে থাকে। দীনেশচন্দ্র সরকার ১৫ এবং ১৬ সংখ্যক মুখ্য গিরিশাসন বলেন। এই অনুশাসন দুটির লক্ষ্য কলিঙ্গে নিযুক্ত রাজ কর্মচারী এবং কলিঙ্গবাসী ও সাম্রাজ্যের প্রত্যন্তবাসীদের উদ্দেশে সম্রাট অশোকের মনোভাব এবং প্রত্যাশা বিশেষভাবে জানানো। নবম রাজ্যাঙ্কে অশোক কলিঙ্গ জয় করেন। এই যুদ্ধের ভীষণতায় তাঁর মনে গ্লানি দেখা দেয়। ১৩ সংখ্যক অনুশাসনে তিনি যুদ্ধে নিহত, নির্বাসিত, বন্দি লক্ষ লক্ষ মানুষের কথা ভেবে অনুতাপ প্রকাশ করে জানান, যুদ্ধে বিজয় নয় 'ধর্মবিজয়ই' তাঁর কাম্য। ১৫ এবং ১৬ সংখ্যক অনুশাসনে তিনি জানিয়েছেন, "সব্বে মুনিস্‌সে পজা মম', সমস্ত মানুষই আমার সন্তান। নিজের সন্তানদের জন্য যেমন তিনি ইহলোক ও পরলোকে সব রকমের হিত ও সুখ কামনা করেন, সব মানুষ সম্পর্কেও তাঁর সেই একই কামনা। অবিজিত দেশের অধিবাসীরাও তাঁর এই মনোভাব জেনে যেন অনুদ্বিগ্ন আশ্বস্ত হয়। ১৬ সংখ্যক অনুশাসনে বিশেষভাবে ধৌলির নগর-ব্যবহারক—যাঁরা বিচারের কাজে নিযুক্ত—তাঁদের অপক্ষপাত বিচারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাঁদের শাসন যেন এমন হয় যাতে সম্রাট মানুষের প্রীতি অর্জন করতে পারবেন। বিচারকেরা ঈর্ষা, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা, ক্ষিপ্রতা, অনভ্যাস, আলস্য ও ক্লান্তি পরিহার করে পক্ষপাতহীন সুবিচার করবেন। সম্রাটের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা হচ্ছে কিনা দেখার জন্য পাঁচ বছর অন্তর পর্যবেক্ষক পাঠাবার কথা এই অনুশাসনে উল্লেখ করা হয়েছে। অস্ত্রের শক্তিতে যে দেশ জয় করেছেন, সেখানকার অধিবাসীদের মনের বিরূপতা দূর করে আনুগত্য জাগিয়ে তোলার জন্যই অশোক উদার, পক্ষপাতহীন সমদর্শী শাসননীতির কথা বিশেষভাবে ঘোষণা করেছিলেন বোঝা যায়। ঠিক বৌদ্ধধর্ম প্রচার এইসব আজ্ঞার উদ্দেশ্য নয় সম্ভবত।

১৫ সংখ্যক অনুশাসনে বলা হয়েছে, চাতুর্মাসীর দিনে এবং তিষ্য-নক্ষত্রে লিপিটি সকলকে শুনতে হবে। চাতুর্মাসী ও তিষ্যনক্ষত্রের মাঝে সুযোগ হলে একা-একাও শুনবে।

১৬ সংখ্যক অনুশাসনেও উল্লেখ করা হয়েছে, প্রতি তিষ্যনক্ষত্রে এই আজ্ঞা সকলকে শুনতে হবে এবং দুই তিষ্যনক্ষত্রযুক্ত দিনের মধ্যে সুযোগ হলে মাঝে মাঝে একা-একাও লিপিটি শুনবে। দ্র. দীনেশচন্দ্র সরকার, 'অশোকের বাণী', কলকাতা ১৯৮১; Romila Thapar, *Asoka And The Decline Of The Mauryas,* Delhi 1973, pp. 169-71.

৬. তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের অন্যতম উদ্ভবস্থান 'মহাযোগ পীঠ' উড্ডীয়ানের রাজা ইন্দ্রভূতি এবং তাঁর মেয়ে লক্ষ্মীঙ্করা। হরপ্রসাদের মতে উড্ডীয়ান ওড়িশার কোনো জায়গায়। ওয়াডেল বলেন, আফগানিস্তান ও কাশ্মীরের মাঝে স্বাত-উপত্যকায়। বিনয়তোষ বাংলা দেশে হওয়াও সম্ভব মনে করেন। ইন্দ্রভূতি ও লক্ষ্মীঙ্করা সম্ভবত অষ্টম (বিনয়তোষ) মতান্তরে নবম (Shendge) শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। তেঙ্গুরের তালিকায় ইন্দ্রভূতির লেখা 'সিদ্ধবজ্রযোগিনীসাধন', 'জ্ঞানসিদ্ধিনামসাধনোপায়িকা', 'সহজসিদ্ধি', প্রভৃতি ২৩ খানি বইয়ের নাম পাওয়া যায়। ইন্দ্রভূতি ও লক্ষ্মীঙ্করা বজ্রযোগিনী-সাধন প্রবর্তন বা প্রচার করেন। বজ্রযানসাধনার ধারায় অসংকোচে এক অভিনব মতবাদ প্রবর্তনের দিক থেকে লক্ষ্মীঙ্করার 'অদ্বয়সিদ্ধি' গুরুত্বপূর্ণ বই। উপবাস, ধর্মকর্ম, স্নান-শৌচ বর্জনীয়। কাঠ-পাথর-মাটির দেবতা বন্দনা করার প্রয়োজন নেই। নিত্য সমাহিত হয়ে দেহেরই পুজো করবে। লক্ষ্মীঙ্করার এই মতবাদ সম্পর্কে বিনয়তোষ বলেন, "... What Laksmimkara advocates was quite out of the way and strange, even though since her time this new teaching has gradually won for it many adherents who are styled Sahajayanists, and who are still to be met with among Nadha Nadhis of Bengal and especially among Bauls. *S-M-II,* p. lv.

Shendge লিখেছেন, "This short work ['অদ্বয়সিদ্ধি'] has one unique feature *i.e.,* it is written by a woman who practised and preached Tantraism. From this point of view I expected some unique doctrines but in reality all her teachings in no way differ from those preached by the male practicants of the doctrine *e.g.,* those preached by Indrabhuti or Anangavajra ['প্রজ্ঞোপায়বিনিশ্চয়সিদ্ধি', রচয়িতা ইন্দ্রভূতির গুরু]. So naturally the question poses itself—whether there can at all be any such difference in the Sadhana prescribed for man and for woman?" (Miss. Malati J. Shendge ed. *ADVAYASIDDHI,* Oriental Institute, Baroda, 1964, p. 11). দ্র. *B-L-T,* p.197; *S-M-II,* pp. xxxvii-xxxix, xlii.

৭. সোম বংশীয় রাজা তৃতীয় মহাশিবগুপ্ত যযাতি একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মেদিনীপুর থেকে গঞ্জাম অঞ্চলের শাসন কর্তৃত্ব অধিকার করেন। 'মাদলাপাঞ্জী'তে (জগন্নাথ মন্দিরে সংরক্ষিত মাদলের মতো দেখতে পুথি, রাজবৃত্তের এবং মন্দিরের পূজা-বিধির বিবরণ) ইনি যযাতি কেশরী নামে উল্লিখিত। ১১১২ খৃস্টাব্দের কিছু আগে গঙ্গবংশীয় অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গ (১০৭৮-১১৪৭ খৃ.) পুরী-কটক অঞ্চল অধিকার করেন এবং ভাগীরথী থেকে গোদাবরী পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। কুলধর্মে শৈব চোড়গঙ্গ পুরী অধিকার করার পরে ক্রমে জগন্নাথরূপী বিষ্ণুর ভক্ত হয়ে ওঠেন। পুরীর জগন্নাথ মন্দির নির্মাণ এঁর অন্যতম কীর্তি। গঙ্গবংশের শেষ রাজা চতুর্থ ভানুকে তাঁরই অমাত্য কপিলেশ্বর ১৪৩৫ খৃস্টাব্দে

ক্ষমতাচ্যুত করে রাজ্য অধিকার করেন। কপিলের বংশ গজপতিবংশ নামে পরিচিত। বিজয়নগর রাজ কৃষ্ণদেবরায়ের কাছে এই বংশের শেষ রাজা প্রতাপরুদ্রের (১৪৯৭-১৫৩৯ খৃ.) পরাজয়ে গজপতিবংশের শাসনের অবসান হয়। এর কিছু পরে অন্ধ্রদেশের মুকুন্দ হরিচন্দন (১৫৫৯-৬৮ খৃ.) ওড়িশা অধিকার করেন। ইনিই ওড়িশার শেষ স্বাধীন হিন্দু রাজা। দ্র. দীনেশচন্দ্র সরকার, 'সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ' দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা ১৩৮৯ ব., পৃ. ১৮-২৮ এবং 'ওড়িশা', 'ভারতকোষ'।

৮. ওড়িশার সংস্কৃতিতে বৌদ্ধ এবং হিন্দু ভাবনা, বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের বিমিশ্রিত প্রভাব সম্পর্কে গবেষকদের মধ্যে বিশেষ মতভেদ নেই। ওড়িশার মানুষের জীবনে পুরীর জগন্নাথদেবের প্রভাব অপরিসীম। 'স্কন্দপুরাণে'র উৎকল-খণ্ডের একটি কাহিনীর বিবরণে পুরুষোত্তমদেব-জগন্নাথকে আদিম শবরজাতীয় মানুষের দেবতা বলা হয়েছে। এই বিগ্রহ বিষ্ণুরূপে পূজিত কিন্তু, জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরামকে বৌদ্ধ ত্রিরত্ন—বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘের প্রতীক মনে করার কারণ আছে। ওড়িয়া লোকগীতিতে জগন্নাথ এবং বুদ্ধ অভিন্ন। কোনো কোনো মন্দিরে বিষ্ণুর নবম অবতাররূপে বুদ্ধের পরিবর্তে জগন্নাথ মূর্তি দেখা যায়। কানিংহাম এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্র জগন্নাথ-সুভদ্র-বলরামকে বৌদ্ধ ত্রিরত্নের প্রতীক বলেছিলেন। অনেকে মনে করেন, পুরীর জগন্নাথ মন্দির মূলত বৌদ্ধ-মঠ এবং মহাযান বৌদ্ধধর্মের একটি কেন্দ্র ছিল। ১২ বছর পর পর নিম কাঠে তৈরি জগন্নাথ মূর্তি যখন নতুন করে গড়া হয় সেই সময়ে একজন ব্রাহ্মণ চোখ বাঁধা অবস্থায় পুরানো মূর্তির ভিতর থেকে রেশমের কাপড়ে মোড়া কোনো বস্তু নতুন মূর্তিতে স্থানান্তর করেন। অনেকের ধারণা এই বস্তু বুদ্ধের কোনো প্রাচীন স্মারক। মূর্তি তিনটি প্রকৃতপক্ষে তিন খণ্ড কাঠ, কোনো রূপায়িত প্রতিমা নয়। ওড়িয়া ধর্মীয় সাহিত্যে প্রায়ই জগন্নাথ মূর্তিকে শূন্য এবং অলেখ অর্থাৎ অরূপ বলা হয়েছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি চৈতন্য দাস তাঁর 'নির্গুণ মাহাত্ম্য' বইয়ের ১৬ অধ্যায়ে বিষ্ণুর দুই অবতার কৃষ্ণ এবং বুদ্ধের চরিত্র তুলনা করে বুদ্ধকেই শ্রেষ্ঠ অবতার বলেছেন। হিন্দু বৌদ্ধ ভাবনার এই বিরোধ কালক্রমে নিশ্চয়ই একটা সামঞ্জস্যে পৌঁছেছিল। অনার্য ঐতিহ্যের জগন্নাথ, আর্য ঐতিহ্যের বিষ্ণু বা কৃষ্ণ এবং বুদ্ধ জগন্নাথদেবে সম্মিলিত হওয়ায় সমস্ত জনস্তরের সাধারণ দেবতার মর্যাদা পায়। এই দিক থেকে জগন্নাথদেব ওড়িশার সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের প্রতিভূ। মূল শবর দেবতাকে হিন্দু অথবা বৌদ্ধ কারা প্রথম গ্রহণ করেছিলেন, নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। প্রচলিত কাহিনীগুলিতে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এই দেবতাকে নিজের করে নেবার প্রতিযোগিতার এবং শেষ পর্যন্ত আপসে পৌঁছুবার আভাস পাওয়া যায়। পঞ্চদশ শতাব্দীর জনপ্রিয় কবি বিপ্র নীলাম্বর রচিত 'দেউল-তোলা-সুয়াঙ্গ' কাব্যের গল্পে এই সমন্বয়ের কথা রূপ পেয়েছিল।

রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নর নির্দেশে ব্রাহ্মণ বিদ্যাপতি পূর্ব-উপকূলের নিবিড় অরণ্যে শবর বিশ্ববসুর নীলমাধব বিগ্রহের সন্ধান পেল। বিশ্ববসু সুদর্শন বিদ্যাপতির সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিল। সেখানে কিছুদিন কাটিয়ে ফিরে গিয়ে বিদ্যাপতি রাজাকে বিগ্রহের খবর জানাল। সৈন্যসামন্ত নিয়ে গিয়েও রাজা কিন্তু বিগ্রহের সন্ধান পেল না। দৈববাণী হল, মন্দির তৈরি শেষ হলে রাজা নীলমাধব বিগ্রহের সন্ধান পাবে। ইন্দ্রদ্যুম্ন মন্দির তৈরি করিয়ে ব্রহ্মাকে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জন্যে আমন্ত্রণ জানাতে স্বর্গে গেল। এদিকে মন্দিরটি বালির মধ্যে তলিয়ে গেল। নীলমাধব নামে আর-এক রাজা সেই মন্দির উদ্ধার করল। ইন্দ্রদ্যুম্ন ফিরে এলে মন্দিরের স্বত্ব নিয়ে দুই রাজায় শুরু হল বিবাদ। শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রদ্যুম্নর

অধিকার প্রমাণ হল। দৈববাণী শোনা গেল, বিগ্রহ কাছের এক নদীর মুখে গাছের গুঁড়ি রূপে দেখা দেবে। রাজার গোটা সৈন্যবাহিনী সেই গুঁড়ি তুলতে পারল না। দৈববাণী অনুযায়ী সেই গুঁড়ি তুলে আনল শবর বিশ্ববসু এবং ব্রাহ্মণ বিদ্যাপতি। রানী গুণ্ডিচার ইচ্ছায় কাঠ থেকে মূর্তি গড়ার জন্য এক বুড়ো ছুতোরকে নিয়োগ করা হল। তার শর্ত ছিল, মূর্তি গড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ মন্দিরের দরজা খুলবে না। দিন কয়েক পর ছুতোরের সাড়া না পেয়ে দরজা খুলতে আধ-গড়া মূর্তি ফেলে ছুতোর কোথায় মিলিয়ে গেল। একটি নয়, মূর্তি গড়া হচ্ছিল তিনটি—কৃষ্ণ, বলরাম আর সুভদ্রা। ব্রহ্মা সেই আধ-গড়া বিগ্রহই প্রতিষ্ঠা করল। নতুন দেবতা জগন্নাথের ইচ্ছায় ব্যবস্থা হল শবর বিশ্ববসুর বংশধরেরাই মন্দিরের প্রধান পূজারি হবে, বিদ্যাপতির ব্রাহ্মণ স্ত্রীর সন্তানের বংশধরেরা পুরোহিত হবে, আর বিদ্যাপতির শবর স্ত্রীর সন্তানের বংশধরেরা হবে মন্দিরের পাচক।

আজও পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের তিন স্তরের সেবকেরা এই তিন বংশধারার মানুষ বলে নিজেদের পরিচয় দেন। পরে তিন বিগ্রহের সঙ্গে একটি ছোটো বিগ্রহ যুক্ত হয়েছে—নাম সুদর্শন চক্র। অনেকের ধারণা এটি বৌদ্ধ সদ্ধর্ম চক্রের প্রতীক বিগ্রহ। বিগ্রহের বিবর্তন, মন্দির নিয়ে দুই রাজার বিবাদ এবং বিগ্রহ সেবায় জাতপাতের বিচার না মানা—এইসব লোককথা ও বিধিব্যবস্থায় অনার্য, আর্য-ব্রাহ্মণ্য এবং বৌদ্ধ সংস্কৃতির সংঘাত ও সমন্বয়ের ইতিহাস প্রচ্ছন্ন আছে।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী অবধি জগন্নাথ সম্ভবত পুরীর স্থানীয় দেবতা ছিল, তারপরে কয়েক শতাব্দীর মধ্যে তার প্রভাব বিস্তৃত হয়। গঙ্গসম্রাট্ অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গের (১০৭৮-১১৪৭ খৃ.) প্রপৌত্র তৃতীয় অনঙ্গভীম (আ. ১২১৯-৩৯ খৃ.) জগন্নাথকে সর্বভারতীয় হিন্দু দেবতার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন।

৯. ষোড়শ শতাব্দীর ওড়িয়া সাহিত্যের প্রসিদ্ধ পাঁচ জন দার্শনিক-কবি বলরাম দাস, জগন্নাথ দাস, অচ্যুতানন্দ দাস, অনন্ত দাস, যশোবন্ত দাস পঞ্চসখা নামে পরিচিত। আধুনিক কবি নন্দকিশোর বল লিখেছেন—

উৎকল গরভুঁ কেতে সাধুভক্তসুত,
জনমি করিলে প্রিয় মাতৃকোল পূত।
পঞ্চসখা আদিভক্ত
ঘোষি 'ব্রহ্মজ্ঞান' কলে দেশ সুপবিত্র।

এই পাঁচ জন কবি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক এবং তাঁর সঙ্গে এঁদের ঘনিষ্ঠতা ছিল। চৈতন্যের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ওড়িশায় ভক্তি আন্দোলনের ব্যাপক প্রসার প্রত্যক্ষভাবে পঞ্চসখা কবিদের জনপ্রিয়তা বাড়িয়েছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু এঁদের রচনায় কোথাও কোথাও চৈতন্যের উল্লেখ থাকলেও তাঁর ধর্ম-দর্শন এঁরা গ্রহণ করেন নি। কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী বলে, "গৌড়ীয় শুদ্ধা-ভক্তি ইঁহারা মানিতেন না। যোগ ও জ্ঞানকে তাঁহারা ভক্তির সোপানরূপে অবলম্বন করিয়াছিলেন; অর্থাৎ তাঁহারা ছিলেন, জ্ঞান-মিশ্রা-ভক্তির প্রচারক।" ওড়িয়া সাহিত্য বিষয়ে আধুনিক গবেষণাতে পঞ্চসখার দার্শনিক মতবাদ ওড়িশার বিশিষ্ট বৌদ্ধবৈষ্ণবীয় মতবাদরূপে স্বীকৃত।

পঞ্চসখার মধ্যে বয়সে বড়ো বলরাম দাস। জন্ম ১৪৭২ খৃষ্টাব্দে। বাবা সোমনাথ মহাপাত্র, মা মনোমায়া। প্রায় মাঝ বয়সে চৈতন্যদেবের সঙ্গে এঁর পরিচয় হয়। তার আগেই বলরামের প্রধান রচনাগুলি লেখা হয়ে গিয়েছিল। 'বেদান্তসার গীতা', 'গুপ্ত গীতা',

'বিরাট গীতা', এবং 'সপ্তাঙ্গ যোগসার' গ্রন্থে বলরাম হঠযোগ, রাজযোগ এবং বেদান্ত-দর্শন ব্যাখ্যা করেছেন। সারলা দাস ওড়িয়া মহাভারত লিখেছিলেন, বলরাম লেখেন ওড়িয়া রামায়ণ। তাঁর রামায়ণের নাম 'জগমোহন রামায়ণ', 'নামান্তর 'দাণ্ডি রামায়ণ'। তরুণ বয়সে একবার রথযাত্রার সময়ে জগন্নাথের রথে উঠতে গিয়ে কবি লাঞ্ছিত হন। মনের দুঃখে বিজন সমুদ্রতীরে বসে 'ভাব-সমুদ্র' নামে ৭৫০ স্তবকের একটি দীর্ঘ গীতিকবিতা রচনা করেন। বলরামের আর-দুটি উল্লেখযোগ্য রচনা 'কমললোচন চউতিশা' এবং 'মৃগুণী স্তুতি'। বলরাম দাসের শ্রেষ্ঠ কীর্তি একলক্ষ পদে সম্পূর্ণ 'জগমোহন রামায়ণ'। ওড়িয়া জাতি-সত্তার আবহমান অবলম্বন তিন খানি গ্রন্থ, সারলা দাসের মহাভারত, বলরাম দাসের রামায়ণ এবং জগন্নাথ দাসের ভাগবত। এই মহাগ্রন্থ বলরাম রচনা করেন ৩২ বৎসর বয়সে। শেষ বয়সে সর্বদাই ইনি চৈতন্যদেবের মতো ভাবগ্রস্ত থাকতেন, তাই সকলে তাঁকে মত্ত বলরাম বলত।

পঞ্চসখার দ্বিতীয় প্রসিদ্ধ কবি, ওড়িয়া ভাগবত লেখক জগন্নাথ দাস বলরাম দাসের চেয়ে বয়সে অনেক ছোটো, চৈতন্যদেবের প্রায় সমবয়সী ছিলেন। বাড়ি ছিল পুরী জেলার কপিলেশ্বর শাসনে। ছোটো বেলায় সংস্কৃত শেখেন, ব্যাকরণ ও সাহিত্যে দখল আসার পরে ভাগবত পড়েন। ১৮/১৯ বছর বয়সে সংসার ছেড়ে বৈষ্ণব-দীক্ষা নেন এবং পুরীর ওড়িয়া মঠের মোহান্ত হন। পরে সমুদ্রের তীরে সাতলহরিতে বাস করেন। চৈতন্যদেব এঁকে প্রথম দেখেন পুরীর মন্দিরের কল্পবটের তলায়। জগন্নাথ সদ্য রচিত ভাগবত অশিক্ষিত গ্রামের লোকদের আবৃত্তি করে শোনাচ্ছিলেন। চৈতন্য জগন্নাথের কবিত্বে মুগ্ধ হন এবং তাঁকে অতিবাদী অর্থাৎ মহামহিম বলে সম্বোধন করেন। ক্রমে দু জনের মধ্যে গভীর বন্ধুতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। চৈতন্যের 'অতিবাদী' সম্বোধনটি জগন্নাথের জীবনে স্থায়ী হয়েছিল। তাঁর শিষ্য পরম্পরা অতিবাদী নামে পরিচিত। মায়ের ইচ্ছা পূরণ করতে জগন্নাথ ওড়িয়া ভাষায় ভাগবত লেখেন। বৃদ্ধা মা জানতেন না, তাঁর ছেলের এই রচনা ক্রমে লক্ষ লক্ষ ওড়িশাবাসীর ভাবগত সংহতির, নৈতিক জীবনের অবলম্বন হয়ে উঠবে। এই ভাগবত ওড়িশার গ্রামে-গ্রামান্তরে মাতৃভাষায় জনশিক্ষার উপায়রূপে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। প্রতি গ্রামেই একটি ভাগবত-ঘর থাকত, এই ভাগবত-ঘর একাধারে গ্রামের পাঠশালা, গ্রন্থাগার ও ধর্মচর্চার কেন্দ্র ছিল। প্রত্যেক পরিবারে জগন্নাথের ভাগবতের পুথি রাখার রীতি ছিল। ওড়িশার বাইরে যাঁরা বসবাস করতেন, তাঁরাও আপন জাতি-সত্তার প্রতীক হিসাবে এই ভাগবত কাছে রাখতেন। সাহিত্যের বিচারে জগন্নাথের ভাগবত কোনো মৌলিক, অসাধারণ সৃষ্টি নয়। কিন্তু সংস্কৃত শব্দ ও খাঁটি ওড়িয়া শব্দ ব্যবহারের নৈপুণ্যে সহজে মানুষের হৃদয় ছোঁয় এমন এক রচনা-শৈলী জগন্নাথ উদ্ভাবন করেছিলেন। এই রচনায় তিনি ৯ অক্ষরের লালিত্যময় এক নতুন ছন্দ ব্যবহার করেছেন, একে বলা হয় নবাক্ষরী বৃত্ত। জগন্নাথ মূল ভাগবতের আক্ষরিক অনুবাদ করেন নি। মূলের কোনো কোনো অংশের বদলে 'বিষ্ণুপুরাণ', 'পদ্মপুরাণ', 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ' প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে আকর্ষণীয় উপাদান ব্যবহার করেছেন। উল্লেখযোগ্য, রাস বর্ণনায় জগন্নাথ রাধার পরিবর্তে বৃন্দাবতীর কথা বলেছেন—

গোপীবৃন্দাবতী নামে।
থিলা সে কৃষ্ণসন্নিধানে ॥

জগন্নাথের অন্যান্য স্মরণীয় রচনা, 'অর্থ কোইলি', 'মৃগুণী স্তুতি', শুক-পরীক্ষিৎ সংবাদ রূপে রচিত 'শুদ্ধভাগবত' এবং হর-পার্বতী সংবাদ 'তূলাভিণা'।

অচ্যুতানন্দ দাস পঞ্চসখার মধ্যে বয়সে সবার ছোটো। বাবা দীনবন্ধু পদস্থ রাজ কর্মচারী ছিলেন। অচ্যুতানন্দ অল্প বয়সে সংসার ছেড়ে পুরীতে যান। চৈতন্যদেবের আজ্ঞায় তাঁর দীক্ষা হয়। পুরীর বাঁকি নদীর ধারের গোপাল-মঠ অচ্যুতানন্দ প্রতিষ্ঠিত। অচ্যুতানন্দ শূদ্র বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন, 'জাত হেলুঁ ওড্ররাষ্ট্রে শূদ্রকূলে পুনি।" সম্ভ্রান্ত করণ পরিবারে জন্ম হলেও নিম্নতর জাতির উন্নতির উদ্দেশ্যে তিনি মৎস্যজীবী কেউট এবং গৌড়দের মধ্যে জীবন কাটিয়েছেন। এঁদের বোধগম্যভাবে 'কৈবর্ত গীতা' এবং 'গোপালঙ্ক ওগালা' লিখেছেন। এই দুই জাতির মানুষ আজও তাঁকে মহাপুরুষ বলে শ্রদ্ধা করে। অচ্যুতানন্দের নামে আরো বহু রচনার সন্ধান পাওয়া যায়। সম্ভবত সব এই অচ্যুতানন্দের লেখা নয়। নিশ্চিতভাবে এঁর লেখা বলে জানা রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'শূন্যসংহিতা', 'অণাকার সংহিতা', 'ব্রহ্মশেঙ্কুলি', 'ব্যাল্লিশ চৌপদি', 'হরিবংশ' প্রভৃতি। চৈতন্যের ঘনিষ্ঠ শিষ্য হওয়া সত্ত্বেও অচ্যুতানন্দের রচনায় চৈতন্যের মতবাদের প্রভাব নেই। শূন্য ও অলেখ-এর উপাসনার কথাই তিনি বলেছেন, আর মানুষের নিজের মধ্যে জগৎগুরুকে খুঁজে নেবার উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর মতাদর্শে বৌদ্ধপ্রভাব অত্যন্ত প্রকট। দুই শতাব্দী পরে ওড়িশায় মহিমাধর্মের অভ্যুদয় হয়েছিল— যার সঙ্গে মহাযান বৌদ্ধধর্মের খুব মিল। আধুনিক গবেষকেরা এই মহিমাধর্মের পূর্বসূত্র নির্দেশ করেন অচ্যুতানন্দের রচনায়।

অনন্ত দাস, শিশু অনন্তদাস নামে পরিচিত। এঁরও জন্ম করণ পরিবারে। কিছু মালিকা বা ভবিষ্যদ্বাণী এঁর নামে প্রচলিত আছে।

যশোবন্ত দাসের জন্ম ক্ষত্রিয়কুলে। চুরির দায়ে তাঁর একবার শূলদণ্ড হয়। জগন্নাথের স্তব করে বিপদ থেকে উদ্ধার পান এবং ধর্মপথে আসেন। বাংলায় প্রচলিত নাথ সম্প্রদায়ের গোপীচন্দ্রের গান ইনি ওড়িয়া ভাষায় লিখেছেন। দ্র. কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী, "ওড়িয়া সাহিত্য", 'ভারতকোষ'; প্রিয়রঞ্জন সেন, 'ওড়িয়া সাহিত্য', বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ; Suniti Kumar Chatterjee, *Languages and Literature of Madern India,* Calcutta 1963; Mayadhar Mansinha, *History of Oriya Literature,* Sahitya Akademi, New Delhi 1962.

১০. এই বইয়ের পৃ. ১১১-১১২ (প্রাসঙ্গিক তথ্য), সূত্র ১০ এবং ১১ দ্র.

১১. এই বইয়ের পৃ. ১৫ (প্রাসঙ্গিক তথ্য), সূত্র ৪ দ্র.

১২. ভীমভোই এবং অরক্ষিত দাস দু জন পৃথক্ ব্যক্তি।

ভীম ভোই-এর জন্ম ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে, জন্ম দ্রাবিড় গোষ্ঠীর অন্তর্গত 'কুই' ভাষাভাষী কন্ধ উপজাতির কোনো পরিবারে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এই উপজাতির মধ্যে এঁদের ধরিত্রী দেবতা তাড়ু পেন্নুর উদ্দেশে নরবলি দেবার প্রথা ছিল। ধান এবং হলুদ চাষ প্রধান জীবিকা। ভীম ভোইয়ের সময়ে এই পাহাড়-জঙ্গলের অধিবাসীদের মধ্যে আধুনিকতার আলো-হাওয়া কিছুমাত্র প্রবেশ করে নি। অথচ ভীম ভোই যুক্তিবুদ্ধি পরিশীলিত আধুনিক রুচির পক্ষে সমাদরের যোগ্য ভজন রচনা করে ওড়িয়া বাঙ্ময়কে সমৃদ্ধ করে গেছেন। ভীম ভোই বসন্ত রোগের আক্রমণে ছেলেবেলায় অন্ধ হয়ে যান, সম্ভবত জন্মান্ধ ছিলেন না। নিরক্ষর ছিলেন এবং ভিক্ষা করে বেড়াতেন। মহিমা গোসাঁইয়ের সংস্পর্শে এসে ভীম ভোইয়ের আধ্যাত্মিক জীবনের এবং কবি জীবনের উদ্বোধন হয়। জাতপাত বিরোধী, মূর্তি পুজো বিরোধী ধর্ম প্রচারের জন্য ভীম ভোই জীবনে অনেক দুঃখ-লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন। তাঁর গানে অনেক জায়গায় এইসব

অভিজ্ঞতার ছায়া আছে। যেমন একটি ভজনে বলছেন, "প্রভু, আমি যখন তোমার মহিমার কথা বলি সবাই আমায় খৃস্টান বলে ঠাট্টা করে। বাতাস যেমন আবৃত করে রাখে তেমনি এরা পাপে আবৃত। কিন্তু আমি সত্যধর্মের কথা বললে আমায় ধিক্কার দেয়। আমি বলি সকল মানুষ সমান, আর এরা আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করে— যেন আমি এক কুকুর।" এমন দিন থাকবে না, পৃথিবীতে স্বর্গ নেমে আসবে— অনেক ভজনে ভীম ভোই এই আশা প্রকাশ করেছেন। মানুষের অমর্যাদা তাঁর অসহ্য মনে হত। মূর্তি পূজা অর্থহীন মনে করতেন। একটি ভজনে বলেছেন, "অজ্ঞানতার বশে মানুষ মূর্তির সামনে পুজো দিয়ে করুণা ভিক্ষা করে। জড় মূর্তি কী করে প্রার্থনা পূরণ করবে? মায়ার বিভ্রমে মানুষ একথা বুঝতে পারে না। দেহ এবং আত্মার স্রষ্টা যিনি, তাঁর কাছে নিজেকে সমর্পণ না করে কাঠের প্রতিমার কাছে পরিত্রাণ চায়।" নিরক্ষর, অন্ধ এই কবির রচনায় কোনো প্রাজ্ঞতার ভান নেই। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায় যা উপলব্ধি করেছেন, গুরুর কাছে যা উপদেশ পেয়েছেন, সহজ সরল ভাষায় তা-ই প্রকাশ করেছেন। ক্রমে বহু মানুষ তাঁর অনুগামী হন। পরিণত বয়সে মানুষের ভক্তি ভালোবাসায় তাঁর নির্যাতনময় জীবনের দুঃখ ঘোচে। ভীম ভোইয়ের গানের অলেখ ধর্ম যে মূলত মহাযান বৌদ্ধধর্মেরই সারবস্তু এ বিষয়ে খুব একটা মতভেদ নেই। 'স্তুতি-চিন্তামণি' (১৯৫০ খৃ.), 'অষ্টক-বিহারী গীতা' (১৯৩৩ খৃ.), 'ব্রহ্মনিরূপণ গীতা', 'চৌত্রিশা-মধুচক্র' (১৯৪৮ খৃ.) এবং 'শ্রুতি নিষেধ গীতা'য় তাঁর রচনা সংকলিত হয়েছে। ১৮৯৫ খৃস্টাব্দে ভীম ভোইয়ের মৃত্যু হয়।

অরক্ষিত দাস-ও ঊনবিংশ শতাব্দীর মানুষ। দক্ষিণ ওড়িশার গঞ্জাম জেলার এক রাজপরিবারে এঁর জন্ম। রাজ-ঐশ্বর্যের মধ্যে মানুষ হয়েও তাঁর মনে বৈরাগ্য দেখা দেয়। ১৮ বছর বয়সে ঘর ছেড়ে যান এবং ১৮ বছর ধরে বনে-পাহাড়ে গ্রামে-গ্রামে এবং নানা তীর্থে ঘুরে সত্যোপলব্ধির সাধনা করেন। শেষ পর্যন্ত প্রচলিত ধর্মের রীতিনীতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে মূর্তি পুজোর বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করেন। সমাজের নানা স্তরের মানুষের সঙ্গে মেশার অভিজ্ঞতায় অরক্ষিত দাস হিন্দু জাতিভেদ প্রথার অর্থহীনতা উপলব্ধি করেছিলেন। নারী-পুরুষের সমান মর্যাদা স্বীকার করতেন। তাঁর কথা, "সব রঙের গোরুর দুধই সাদা। সব মানুষেরই রক্ত লাল।" ১৮ বছর ভ্রাম্যমান সন্ন্যাসীর কঠোর জীবনের পর কটক জেলার ওলাসুনি পাহাড়ে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এখানেই ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধেক শেষ দিকে তাঁর মৃত্যু হয়। ভীম ভোই-এর সঙ্গে অরক্ষিত দাসের ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না, কিন্তু দু জনেই একই ধরনের ধর্মমত প্রচার করেছিলেন। 'মহিমগুল গীতা' অরক্ষিত দাসের রচনা। দ্র. Dr Mayadhar Mansinha. *History of Oriya Literature,* Sahitya Akademi, New Delhi 1962.

১২

জাতক ও অবদান

মানুষ যখন বুদ্ধ হন, যখন তাঁহার দিব্যজ্ঞান হয়, তখন তাঁহার অনেকগুলি অলৌকিক শক্তির উদয় হয়। তাহার মধ্যে পূর্বনিবাসের অনুস্মৃতি একটি। তিনি তখন দিব্যচক্ষে দেখিতে পান যে, সৃষ্টির প্রথম হইতে তিনি কতবার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কী কী কর্ম করিয়াছিলেন, এবং সেই-সকল কর্ম দ্বারা তিনি বুদ্ধ হইবার পথে কখন কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। আমাদের ভাষায় আমরা বলি তিনি জাতিস্মর হন। যাঁহারা পুনর্জন্ম মানেন না তাঁহাদের মতে জাতিস্মর হওয়ার কথাই উঠিতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা মানেন, তাঁহারা পূর্বজন্মে "কী ছিলাম, কী করিয়াছিলাম" জানিবার জন্য বড়োই ব্যগ্র হন। তাঁহারা মনে করেন, ধ্যান ধারণা যোগ প্রভৃতি উপায় দ্বারা তাঁহারা পূর্বজন্মের কথা জানিতে পারেন। কেহ এক জন্ম, কেহ দুই জন্ম, কেহ বা দশ জন্ম বিশ জন্ম পর্যন্ত স্মরণ করিতে পারেন। পুণ্য কর্ম, তীর্থ পর্যটন, যোগযাগ সৎকর্ম করিলে হিন্দুরা মনে করেন দশ জন্মার্জিত পাপক্ষয় হয়, কোটি জন্মার্জিত পাপক্ষয় হয়। তাই যাঁহারা পুনর্জন্ম মানেন তাঁহারা এই-সকল সৎকর্ম করার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠেন।

বুদ্ধ ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান তিনই দেখিতে পাইতেন। সুতরাং তিনি আপনার পূর্ব পূর্ব জন্ম যে স্মরণ করিতে পারিতেন, তাহা আশ্চর্য নহে। শাক্যসিংহ বুদ্ধ হইয়া অনেক উপদেশ দিয়াছেন; সেই-সকল উপদেশ লোকে যাহাতে সহজে বুঝিতে পারে, তাহার জন্য অনেক সময়ে তিনি আপনার পূর্ব পূর্ব জন্মের কথা দিয়া সেগুলি ব্যাখ্যা করিয়া দিতেন। এই যে পূর্ব পূর্ব জন্মের কথা, ইহার নাম জাতক।

জাতকের প্রাদুর্ভাব হীনযানে, পালি ভাষায়, অত্যন্ত অধিক। পালি ভাষার গ্রন্থে ৫৫৫টি জাতক আছে; অর্থাৎ বুদ্ধদেব আপনার ৫৫৫টি পূর্বজন্মের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। এই যে নম্বর ৫৫৫, ইহা কিন্তু সর্ববাদীসম্মত নহে; কেহ বলেন ৫৫০, কেহ বলেন ৫২৫, কেহ বলেন ৫৩৫, কেহ বলেন ৫১৫। ব্রহ্মদেশে ৫১৫ নম্বরই চলিত, তাহার মধ্যে ১০ খানি বড়ো— আর ৫০৫ খানি ছোটো। সংস্কৃতে একখানি 'জাতক-মালা' আছে। সেখানি আর্যশূরের প্রণীত; ইহাতে ৩৪টি মাত্র 'জাতক' আছে।[১] এই সংস্কৃত পুস্তক হীনযানের কি মহাযানের বলিতে পারা যায় না। কেন-না, হীনযানের লোকেও সংস্কৃতে লিখিত। বসুবন্ধু[২] যখন হীনযান ছিলেন, তখন তিনি 'অভিধর্ম্ম কোষ' নামে একখানি পুস্তক লিখেন, সেখানি সংস্কৃতে। প্রোফেসর কর্ণ অথবা ভট্টকর্ণ সংস্কৃত 'জাতকমালা' ছাপাইয়াছেন। এই-সকল জাতকের মধ্যে কোন্ কোন্‌টি পালির কোন্ কোন্ নম্বরে পাওয়া যায়, তাহাও তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন। ডেনমার্কের প্রোফেসর ফোস্‌বোল পালি জাতকগুলি ছাপাইয়াছেন। রায় শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষ সাহেব এই

পালি জাতকগুলি বাংলা করিতেছেন। বুদ্ধদেব কোন্ সময়ে, কোন্ শিষ্যের কথায়, কী উদ্দেশ্যে, এক-একটি জাতক বলিয়াছিলেন তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়া তাহার পর তিনি সেই জাতকটির বাংলা তর্জমা করিতেছেন।

বুদ্ধদেব যখন নিজে এই গল্পগুলি বলিতেছেন, তখন মনে করিতে হইবে, এই গল্পগুলি তাঁহার পূর্বেও প্রচলিত ছিল। তিনি গল্পগুলি আপনার পূর্বজন্মের গল্প বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং এগুলি ভারতবর্ষের অতি প্রাচীন সম্পত্তি, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। ইহা হইতে খৃ.পূ. ছয় শতকের পূর্বে ভারতবর্ষের রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার, মনের ভাব, ধর্মের ভাব, জানিতে পারা যায়।

মহাযানের লোকের কিন্তু, জাতকের উপর তত আস্থা ছিল বলিয়া মনে হয় না। কারণ, এক 'জাতকমালা' ছাড়িয়া দিলে, উহাদের আর জাতকের বই নাই। এই 'জাতকমালা' আবার যখন মহাযানীরা পড়ে, তখন উহার নাম হয় 'বোধিসত্ত্বাবদানমালা'। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় 'জাতকমালা'র বা 'বোধিসত্ত্বাবদানমালা'র যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা দেখিলে বোধ হয় যে, আর্যশূরের লেখা এই পুথিখানি মহাযানীরা সংগীতির ছাঁচে ঢালিয়া লইয়াছেন এবং মঙ্গলাচরণের পর উহাতে "এবং ময়া শ্রুতমেকাস্মিন্ সময়ে ভগবান্ শ্রাবস্ত্যাং বিজহার" বলিয়া মুখপাত করিয়াছেন; অর্থাৎ আর্যশূরের বহিখানিকে তাঁহারা বুদ্ধের বচন করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহারা প্রথমত একটি নূতন জাতক দিয়া আর্যশূরের ৩৪টি জাতকের স্থানে ৩৫টি করিয়া লইয়াছেন। আর্যশূরের বহির নাম 'জাতকমালা'; মহাযানের বহির নাম 'বোধিসত্ত্বাবদান', বা 'বোধিসত্ত্বাবদানমালা'। ইহা দেখিলেই বোধ হইবে যে, মহাযানীরা জাতক শব্দটা পছন্দ করিতেন না। উঁহারা জাতকের স্থানে অবদান শব্দ ব্যবহার করিতেন। উঁহাদেরও পূর্ববর্তী মহাসাংঘিকের দল, তাঁহারাও জাতকের পরিবর্তে অবদান বলিতেন। মহাসাংঘিক হইতেই যে মহাযানের উৎপত্তি হইয়াছে, একথা পূর্বেই বলিয়াছি, আরো অনেকেরই এই বিশ্বাস। মহাসাংঘিকের যে একখানিমাত্র পুস্তক পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে অনেকগুলি জাতকের গল্প আছে, কিন্তু সেগুলির নামও অবদান। অবদান শব্দে সংস্কৃত ভাষায় মহৎকার্য বুঝায়। মহাযানের অবদানে শুধু বুদ্ধদেবের পূর্বজন্মের কথা নয়, আরো অনেক মহাপুরুষেরই পূর্বজন্মের কথা আছে। যেমন, অশোকরাজা পূর্বজন্মে কোনো বুদ্ধকে একমুষ্টি ধুলা দিয়া তৃপ্ত করিয়াছেন, তাই আর-একজন্মে তিনি চক্রবর্তী রাজা হইয়াছিলেন। সুতরাং অবদান শব্দ যতটা ব্যাপক, জাতক শব্দ ততটা নয়। মহাযানে অবদানের অনেক পুস্তক আছে। আর্যশূরের 'অবদানশতকে' এইরূপ ১০০টি অবদান আছে। 'দিব্যাবদানমালা'য় ৩৭টি অবদান আছে। 'ভদ্রকল্পাবদানে' ৩৫টি জাতক আছে। 'অশোকাবদান' 'দিব্যাবদানমালা'র একটি অবদান, গদ্যে লেখা; কিন্তু 'অশোকাবদান' নামে পদ্যে লেখা আরো একটি বৃহৎ অবদান আছে। 'সুগতজন্মাবদান' নামে আমরা আরো একখানি অবদান পাইয়াছি। অবদানের শেষ এবং উৎকৃষ্ট পুস্তক 'বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা'— এখানি খৃ. ১১ শতকে কাশ্মীরে ক্ষেমেন্দ্রব্যাসদাস[৩] নামে একজন কবির লেখা। তিনি হিন্দু, ব্রাহ্মণ ও একজন উৎকৃষ্ট কবি ছিলেন। তাঁহার একজন ন্যক্ক নামে বৌদ্ধ বন্ধু ছিলেন। ক্ষেমেন্দ্র যখন 'রামায়ণ', 'মহাভারত', 'বৃহৎকথা' প্রভৃতি বড়ো বড়ো পুস্তকের বিষয় লইয়া 'রামায়ণমঞ্জরী', 'ভারতমঞ্জরী', 'বৃহৎকথামঞ্জরী' প্রভৃতি কাব্য লিখিয়া খুব

প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তখন ন্যক্ক একদিন আসিয়া বলিলেন, আমাদের অবদানগুলি বড়ো কট্‌মট ভাষায় লেখা, কতক গদ্য, কতক পদ্য, কোনোটাই সুবোধ নয়। তুমি যদি তোমার ভাষায় এইগুলি কাব্যাকারে লিখিয়া দাও, তবে আমাদের ধর্মের বড়ো উপকার হয়। তাই ক্ষেমেন্দ্র 'বোধিসত্ত্বাবদান' রচনা করেন। ইহাতে ১০৮টি অবদান আছে। ইহার পুরা পুথি বড়োই দুষ্প্রাপ্য। এশিয়াটিক সোসাইটির পুথিতে ৫১-১০৮ পর্যন্ত অবদান আছে; কেম্ব্রিজের পুথিতে ৪১-১০৮ অবদান আছে, শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয় তিব্বত হইতে একখানি পুথি আনাইয়াছেন, তাহাতে ১-৪৯টি অবদান আছে। তিনি পুথিখানি ছাপাইতেছেন, ডানপাতে সংস্কৃত বামপাতে ভুটিয়া ভাষায় তাহার তর্জমা। তিনি ইহার বাংলাও করিতেছেন।

আমরা একটি জাতক ও একটি অবদান পাঠকগণকে উপহার দিতেছি। ১. আর্যশূরের 'জাতকমালা'র প্রথম ব্যাঘ্রী জাতক। ২. 'মহাবস্তু অবদানে'র পুণ্যবন্ত ও তাঁহার বন্ধুদিগের অবদান।

১. এক সময়ে বুদ্ধদেব কোনো ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 'কল্পসূত্র' অনুসারে তাঁহার জাতকর্মাদি সংস্কার হইয়াছিল। তিনি অত্যন্ত মেধাবী, কৌতূহলী ও অনলস ছিলেন। সেইজন্য তিনি অল্পদিনের মধ্যেই অষ্টাদশ বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণেরা যেসব কলা শিক্ষা করিতে পারেন, সে-সকল কলাতেও তিনি ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার পসার প্রতিপত্তিও খুব ছিল। কিন্তু গার্হস্থ্যে তাঁহার মন উঠিল না। তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। তিনি সন্ন্যাসী হইয়াছেন শুনিয়া, যাঁহারা তাঁহাকে ভালোবাসিতেন, তাঁহারাও সন্ন্যাসী হইলেন। অজিত তাঁহার প্রধান শিষ্য হইল। তিনি পাহাড়পর্বত, বনজঙ্গলে ভ্রমণ করিতে বড়োই ভালোবাসিতেন; অজিত সর্বদাই তাঁহার সঙ্গে থাকিত। একদিন তিনি পর্বতের গুহায় এক বাঘিনি দেখিলেন। সে এইমাত্র সন্তান প্রসব করিয়াছে, অত্যন্ত দুর্বল, ক্ষুধায় কাতর, সতৃষ্ণ নয়নে বাচ্চার দিকে চাহিতেছে। ব্রাহ্মণপুত্র দেখিলেন বাঘিনি ক্ষুধায় এত কাতর যে, সে বাচ্চাটিও খাইতে চায়। করুণার সাগর সন্ন্যাসী শিষ্যকে বলিলেন, বাঘিনি দেখিতেছি ক্ষুধায় বাচ্চাটি খাইয়া ফেলিবে, তুমি অনুসন্ধান করিয়া যদি উহাকে কোনো খাবার আনিয়া দাও, তবে বড়োই ভালো হয়। শিষ্য চলিয়া গেলে, সন্ন্যাসী ভাবিলেন—আমার এ ছার দেহে কী কাজ? আমি ইহার আহার হই না কেন? এই ভাবিয়া তিনি এক উচা জায়গা হইতে বাঘিনির সম্মুখে পড়িয়া দেহত্যাগ করিলেন। বাঘিনিও আনন্দের সহিত তাঁহার দেহ ভক্ষণ করিতে লাগিল। শিষ্য আসিয়া দেখিল, তাঁহার গুরু বাঘিনির জন্য দেহত্যাগ করিয়াছেন। সে আর আর শিষ্যদের এই কথা বলিল। সকলেই মনে করিল, ইনি কোনো-না-কোনো জন্মে বুদ্ধ হইবেন।

২. কোনো জন্মে ভগবান বারাণসীর রাজা অঞ্জনের পুত্র হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইয়াছিল পুণ্যবন্ত। তাঁহার চারি জন বন্ধু ছিল। তাঁহাদের নাম বীর্যবন্ত, শিল্পবন্ত, রূপবন্ত ও প্রজ্ঞাবন্ত। তাঁহাদের কাহার কী গুণ ছিল, তাহা নামেই প্রকাশ। একবার পাঁচ বন্ধুতে মিলিয়া আপনাদের গুণ পরীক্ষার জন্য কাম্পিল্ল যাত্রা করিলেন। পথে তাঁহারা দেখিলেন, গঙ্গায় প্রকাণ্ড এক বাহাদুরি কাঠ ভাসিয়া যাইতেছে, দেখিয়াই বীর্যবন্ত জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন ও কাঠ ডাঙায় তুলিলেন। পরীক্ষায় জানিলেন এটা চন্দনের কাঠ— বিক্রয়

করিয়া অনেক টাকাকড়ি পাইলেন ও পাঁচ জনে টাকা ভাগ করিয়া লইয়া অনেক আমোদ আহ্লাদ করিলেন।

শিল্পবন্ত একদিন এক নগরের প্রান্তে বসিয়া বীণা বাজাইতেছিলেন। বীণায় সাতটি তন্ত্রী ছিল। বীণার ঝংকারে সমস্ত লোক মুগ্ধ হইয়া ঝাঁকিয়া পড়িল। এরূপ বীণা তাহারা আর-কখনো শুনে নাই। বাজাইতে বাজাইতে বীণার একটা তার ছিঁড়িয়া গেল। কিন্তু সে এমনি কলাবৎ, ছয় তারেই সাত তারের মতো বাজাইতে লাগিল। ক্রমে আরো একতার ছিঁড়িল। তাহাতেও বাজনার কোনো ব্যতিক্রম হইল না। ক্রমে চার তার, তিন তার, দুই তার, শেষে এক তারে দাঁড়াইল। তখনো সপ্ততন্ত্রী বীণার ঝংকার হইতেছে। নগরের লোক তাঁহাকে অনেক টাকা পুরস্কার ছিল।

রূপবন্তের রূপ দেখিয়া নগরের এক বেশ্যা মুগ্ধ হইয়া গেল এবং তাঁহার কথায় তাঁহার বন্ধুগণকে অনেক টাকাকড়ি দিল।

এইবার প্রজ্ঞাবন্তের পালা। তিনি একদিন বাজারে গিয়া দেখিলেন, এক শেঠের ছেলে এক বেশ্যার সহিত ঝগড়া করিতেছে। ঝগড়ার বিষয় একলক্ষ টাকা। শেঠের ছেলে বেশ্যাটিকে আগের রাত্রিতে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছিল ও একলক্ষ টাকা দিতে স্বীকার হইয়াছিল। বেশ্যার অন্য লোকের বাড়ি যাইবার কড়ার ছিল, সে সে-রাত্রিতে যাইতে পারিল না। সে পরদিন সকালে আসিয়া উপস্থিত হইল। শেঠ বলিল, তোমায় আমার আর কাজ নাই। রাত্রে স্বপ্নে আমি তোমায় পাইয়াছিলাম, আমার কাজ হইয়া গিয়াছে। সে বলিল, যদি স্বপ্নে আমায় পাইয়াছিলে, তবে আমার টাকাটি দাও। এ ঝগড়ার আর মীমাংসা হয় না। দুই দলেই লোক জুটিয়া গেল। শেষে প্রজ্ঞাবন্ত আসিয়া মধ্যস্থ হইলেন। শেঠকে বলিলেন, তুমি এখনই টাকা লইয়া আইস। সে টাকা আনিয়া সম্মুখে রাখিল। প্রজ্ঞাবন্ত বলিলেন, একখানি বড়ো আরশি লইয়া আইস। আরশি আনিলে, তিনি বেশ্যাকে বলিলেন, "তুমি ঐ আরশির ভিতর হইতে টাকা লও। শেঠজী স্বপ্নে তোমার ছায়ামাত্র পাইয়াছিলেন, তুমিও টাকার ছায়া লও, আসল টাকায় তুমি কী করিয়া হাত দিবে?" বেশ্যার মুখ চুন। মহানন্দে শেঠ সমস্ত টাকা প্রজ্ঞাবন্তকে পুরস্কার দিল। পাঁচ বন্ধুতে টাকা ভাগ করিয়া লইয়া খুব আমোদ-প্রমোদ করিলেন।

পুণ্যবন্ত এক রাজবাড়ির সম্মুখে একদিন বসিয়া আছেন। এমন সময় মন্ত্রীপুত্র সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি পুণ্যবন্তের পুণ্যজ্যোতিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে রাজবাড়ির ভিতর লইয়া গেলেন এবং উহারই এক অংশে তাঁহাকে থাকিতে দিলেন। রাত্রিতে পুণ্যবন্ত ঘুমাইয়া আছেন, রাজকন্যা আসিয়া তাঁহার সেবা করিতেছেন। এই ব্যাপার দেখিয়া রক্ষকগণ পুণ্যবন্তকে লইয়া রাজার নিকট উপস্থিত করিল। রাজা অনুসন্ধানে জানিলেন পুণ্যবন্তের কোনো দোষই নাই। তিনি কাশীরাজের পুত্র জানিয়া, রাজা মহাশয় তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন ও রাজ্যের উত্তরাধিকারী করিলেন।

এই পুণ্যবন্তই বুদ্ধদেব, বীর্যবন্ত তাঁহার শিষ্য শোনক, শিল্পবন্ত রাষ্ট্রপাল, রূপবন্ত সুরেন্দ্র ও প্রজ্ঞাবন্ত শারিপুত্র।

'নারায়ণ'
শ্রাবণ, ১৩২৩ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. উত্তর ভারতে কোনো ব্রাহ্মণ পরিবারে আর্যশূরের জন্ম হয়েছিল। পরে বৌদ্ধ হন। রচনার মধ্যে জন্মকাল এবং ব্যক্তিপরিচয় সম্পর্কে কোনো তথ্য না পাওয়ায় ইনি কোন্ সময়ের মানুষ ছিলেন নিশ্চিতভাবে জানা যায় নি। আর্যশূরের 'কর্মফলনির্দেশসূত্র' বইখানি ৪৩৪ খৃষ্টাব্দে চীনা ভাষায় অনূদিত হয়েছিল, এই সূত্র ধরে তিনি চতুর্থ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন অনুমান করা হয়। তারনাথ অনেকবার আর্যশূরের নাম উল্লেখ করেছেন এবং কাল-দুর্দর্শ, দুর্দর্শকাল, মাতৃচেট, পিতৃচেট, ধার্মিক-সুভূতি প্রভৃতি বিশেষণ ব্যবহার করেছেন। আর্যশূরের রচনাবলীর মধ্যে উৎকর্ষে এবং সমাদরের ব্যাপকতায় 'জাতকমালা' শ্রেষ্ঠ। এই গ্রন্থ 'বোধিসত্ত্ব-অবদান-মালা' নামেও উল্লিখিত হয়। 'জাতকমালা'র গল্পের সংখ্যা ৩৪টি। এর কোনো গল্পই আর্যশূরের উদ্ভাবন নয়, প্রচলিত কাহিনী তিনি নতুন করে বর্ণনা করেছেন, ধর্ম প্রচারের সহায়তার জন্যই তিনি কাহিনীগুলি বর্ণনা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর কবিত্বের গুণে 'জাতকমালা' সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির মর্যাদা পেয়ে এসেছে। বর্ণনার অসীম বিস্তার, পরিমার্জিত ভাষার সূক্ষ্ম সৌন্দর্য এবং বিশেষ করে করুণ রস নিবিড় করে তোলার দক্ষতায় আর্যশূর সংস্কৃত সাহিত্যের প্রসিদ্ধ কবিদের সঙ্গে তুলনীয় ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। বৌদ্ধ লেখক হলেও হিন্দু-বিদ্যার বিভিন্ন শাখায় তাঁর দখল ছিল, প্রয়োজনে এই জ্ঞান ব্যবহার করেছেন। বৌদ্ধধর্মের যেসব নীতি জনপ্রিয় হয়েছিল আর্যশূর সেই নীতিগুলি দৃষ্টান্ত দিয়ে বিশদ করে তুলতে চেয়েছেন মনে হয়। তাই মহাযান বা হীনযান—কোনো একটি দার্শনিক অবস্থান একান্তভাবে আশ্রয় করেন নি। অজন্তায় 'জাতকমালা'র কাহিনীর চিত্ররূপ এবং সঙ্গে 'জাতকমালা' থেকে উদ্ধৃতি তোলা আছে। লিপিকাল ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দ। 'জাতকমালা' ভিন্ন 'বোধিসত্ত্বজাতকস্য-ধর্মঘণ্টী', 'সুপথাদেশপরিকথা', 'সুভাষিতরত্ন-করণ্ডককথা', 'পারমিতাসমাস', 'প্রাতিমোক্ষসূত্রপদ্ধতি', 'কর্মফলনির্দেশসূত্র' বইগুলি আর্যশূরের রচনা বলে চলে। দ্র. Johann Hendrick Kasper Kern ed., *The Jataka Mala,* or *Bodhisattvavadana-Mala* by Arya-Cura, Boston 1891; Michael Vigo Fausboll ed., *The Jataka together with its Commentary,* 7 Vols., London 1877-97; ঈশানচন্দ্র ঘোষ, 'জাতক' প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা ১৩২৩, ১৩২৭ ব.।

২. প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ দার্শনিক বসুবন্ধুর জন্ম গান্ধারে, আধুনিক পেশোয়ারে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে হিউয়েন-ৎসাঙ এখানে বসুবন্ধুর নামে একটি স্মৃতি ফলক দেখেছিলেন। চারটি প্রধান বৌদ্ধ মতাদর্শের মধ্যে বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক মতকে হীনযান এবং মাধ্যমিক ও যোগাচারকে মহাযান বলা যায়। বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক মতের উদ্ভব প্রাচীনতর সর্বাস্তিবাদ থেকে। বসুবন্ধু প্রথম জীবনে বৈভাষিক মতে বিশ্বাসী ছিলেন, পরে বড়ো ভাই অসঙ্গের প্রভাবে যোগাচার মত অবলম্বন করেন। শাকল, কৌশাম্বী ও অযোধ্যায় বসুবন্ধু বহু বছর বসবাস করেছিলেন। ৮০ বছর বয়সে অযোধ্যায় তাঁর মৃত্যু হয়। বৈশেষিক শাস্ত্রের পণ্ডিত মনোরথের সঙ্গে বসুবন্ধুর ঘনিষ্ঠতা ছিল। বসুবন্ধু খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে 'অভিধর্ম্মকোষ' লেখেন। সংস্কৃতে লেখা মূল 'অভিধর্ম্মকোষ' পাওয়া যায় নি। পাওয়া গেছে 'অভিধর্ম্মকোষে'র চীনা এবং তিব্বতি অনুবাদ এবং 'অভিধর্ম্মকোষ ব্যাখ্যা' নামে যশোমিত্রের টীকা। 'অভিধর্ম্মকোষ' ৫৬৩-৬৭ খৃষ্টাব্দে চীনা ভাষায় প্রথম অনুবাদ করেন পরমার্থ, ৬৫১-৫৪ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় অনুবাদ করেন হিউয়েন-ৎসাঙ। 'অভিধর্ম্মকোষে'র কারিকা-সংখ্যা ৬০০, এর সঙ্গে আছে লেখকের নিজের ভাষ্য। হীনযানের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা হলেও বৌদ্ধ পরমার্থ তত্ত্বের আদিরূপ বিধৃত থাকায় 'অভিধর্ম্মকোষ' বৌদ্ধ ঐতিহ্যে সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমাদর পেয়ে এসেছে। এই বইয়ের পৃ. ৩৬৫ সূত্র ২ দ্র.

৩. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ প্রকাশিত *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ* ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৯৭ সূত্র ১ দ্র.

১৩

দলাদলি

ধর্ম হইলেই দলাদলি হয়। সভা হইলেই দলাদলি হয়। পাঁচ জনে মিলিয়া কাজ করিতে গেলে মতান্তর হয়ই হয়, আর মতান্তর হইলেই দলাদলি হয়। দলাদলিটা দোষের কথাও বটে, দোষের কথা নয়ও বটে। দলাদলিতে যখন মূল কাজ পণ্ড হয়, তখন দোষের। যখন মূল কাজের শ্রীবৃদ্ধি হয়, তখন গুণের। যখন দলাদলির মীমাংসা করিয়া দিবার লোক থাকে, তখন দলাদলিতে উপকার হয়। যখন মিটাইয়া দিবার লোক থাকে না, তখন উহাতে অপকার হয়। বৌদ্ধধর্মে যে দলাদলি হইয়াছিল তাহাতে ধর্মের উন্নতিই হইয়াছিল; দুই দলই ধর্মপ্রচারের জন্য কোমর বাঁধিয়া পৃথিবীর চারি দিকেই ঘুরিয়াছিলেন। একদল উত্তরে, একদল দক্ষিণে। তাঁহারা যেসব দেশে গিয়াছিলেন, তাহার অনেক দেশ এখনো বৌদ্ধ আছে। সুতরাং এত বড়ো একটা বড়ো দলাদলির ইতিহাসটা কিছু জানা চাই।

প্রথম কথা কী লইয়া দলাদলি হয়? অতি তুচ্ছ কথা! যাহা লইয়া দলাদলি হয়, পালিতে তাহাকে দশবত্থু বলে, সংস্কৃতে দশবস্তু। অর্থাৎ দশটি জিনিস লইয়া দলাদলির সূত্রপাত। যথা—

১. কপ্পতি, সিঙ্গিলোণ কপ্পো— অনেক ভিক্ষু শিংয়ের পাত্রে একটু লুন সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন। তাঁহারা তো ভিক্ষা করিয়া খাইতেন। সব সময়ে তো লুন দেওয়া ব্যঞ্জন পাইতেন না। আবার সেকালে সকলে সকলের লুন খাইতেন না। লুন না দিয়া ব্যঞ্জন রান্না হইত। তাই পরিবেশনও হইত। লোকে লুন মিশাইয়া খাইত। এখনো অনেক খাঁটি হিন্দুর বাড়িতে আলুনি ছক্কার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা বোধ হয় মনে করেন লুন দিলেই "এঁটো" হয়। তাই পরিবেশনের সময় আলুনিই পরিবেশন করেন। পাতে লুন থাকে, সেই লুন মিশাইয়া লোকে "এঁটো" করিয়া খায়। এইরূপ ব্যবহার বোধ হয় সেখালেও ছিল। লোকে ভিক্ষুদের রান্না জিনিস দিত, আলুনিই দিত। ভিক্ষুরা একটু লুন সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন— তাও রাখিতেন শিংয়ে অর্থাৎ যাহার দাম নাই, কুড়াইয়া যথেষ্ট পাওয়া যায়। তখন তো আর bone-mill-এর এত দরকার হয় নাই! এই যে সামান্য কথা ইহা লইয়াই ঘোর দলাদলি উপস্থিত হইল। যাঁহারা কড়া ভিক্ষু, তাঁহারা বলিলেন, ভিক্ষুর আবার সঞ্চয়? তাহা হইলে আর ভিক্ষু রহিল না, গৃহস্থ হইয়া গেল। যাঁহারা তত কড়া ভিক্ষু নন, তাঁহারা বলিলেন, একটু লুন সঞ্চয় করিলাম তাতে বহিয়া গেল কী? আমরা কি কিছুই সঞ্চয় করি না! আমাদের পাত্র আছে, চীবর আছে, শয়ন আসন এসব তো আমাদের থাকে, একটু লুন থাকিলেই সর্বনাশ হইয়া গেল? এই আপত্তির নাম সিঙ্গিলোণ কপ্পো।

২. কপ্পতি দ্বঙ্গুল কপ্পো— বুদ্ধদেব নিয়ম করিয়া গিয়াছিলেন, বেলা ঠিক দুই প্রহরের পর কোনো ভিক্ষু আহার করিতে পারিবে না। ১২টা বাজিবার পূর্বে সকলকেই আহার সারিয়া লইতে হইবে, ১২টা বাজিলে পর আর-কেহই আহার করিতে পারিবে না। তাহার পর যদি

খাইতে হয় তো জল ও ফলের রস খাইতে হইবে। কিন্তু ইহারা তো ভিক্ষু, ভিক্ষা করিয়া রান্না ভাত আনিয়া তো খাইতে হইবে? একালের মতো তো আর স্কুল, কালেজ, অফিস ছিল না, যে ৯টার মধ্যে ভাত চাই! সেকালের লোকে খাইত বেলায়, রাঁধিতও বেলায়। ভিক্ষুরা সেই বেলায় রান্না ভিক্ষা করিয়া আনিয়া খাইত। দুপুরের আগে খাইতে হইবে। দুপুরের পর এক গ্রাসও খাইবার হুকুম নাই। সুতরাং অনেকের খাওয়া হইত না, অনেকের আধ-পেটা হইত। তাই তারা মনে করিত, দুই প্রহরের সময় ছায়া যেরূপ থাকে, তাহা হইতে, দুই আঙুল ছায়া সরিয়া গেলেও খাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু কড়া ভিক্ষুরা বলিলেন, সে কখনো হতে পারে না। মহাপ্রভুর আজ্ঞা দু প্রহরের পূর্বে খাইতে হইবে, সে আজ্ঞা কি আমরা লঙ্ঘন করিতে পারি! সুতরাং মতান্তর হইল, দলাদলির একটা কারণ হইল।

৩. কপ্পতি গামান্তর কপ্পো—ভিক্ষুরা একই গ্রামে ভিক্ষা করিবে, একদিনে দুই গ্রামে যাইতে পারিবে না, নিয়ম ছিল। কোনো কোনো ভিক্ষু মনে করিতেন, যদি গ্রামান্তরে নিমন্ত্রণ হয়, আগে স্বগ্রামে ভিক্ষা কিছু খাইয়া গেলে দোষ কী? প্রথমত দুবার খাওয়া দোষ, দ্বিতীয় দোষ আগে স্বগ্রামে খাইয়া, গ্রামান্তরে নিমন্ত্রণ গেলে, যে বেচারা নিমন্ত্রণ করিয়াছে, তাহার রান্না অন্নব্যঞ্জন সব ফেলা যায়। কারণ ভিক্ষুরা তো একবার খাইয়া গিয়া আবার সব জিনিস খাইয়া উঠিতে পারেন না; সুতরাং বুদ্ধদেব নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন যে, গ্রামান্তরে নিমন্ত্রণ যাইলে ঘরে খাইয়া যাইতে পারিবে না। কড়া ভিক্ষুরা বলিলেন, এ নিয়ম ঠিক। অন্যে বলিলেন, গ্রামান্তরে যাইতে হইলে যদি পেটে কিছু না থাকে তাহা হইলে যাইতে বড়ো কষ্ট হয়। সুতরাং কিছু খাইয়া গেলে দোষ কী? এও একটা বিবাদের কারণ।

৪. কপ্পতি আবাসকপ্পো—এখানে আবাস শব্দের অর্থ লইয়া একটু গোলযোগ আছে। এক-এক মঠে অনেক ভিক্ষু বাস করিতেন। যাঁহারা এক ঘরে বাস করেন তাঁহাদের এক আবাস। আবাস শব্দের অর্থ ঘর। আবার কেহ কেহ মনে করেন যে, আবাস শব্দের অর্থ পরগনা বা ডিহি। বুদ্ধদেব নিয়ম করিয়াছিলেন যে, এক জায়গার যত ভিক্ষু থাকিবে, সব এক জায়গায় আসিয়া উপোষথ করিবে। উপোষথ শব্দের অর্থ উপবাস, বাংলায় যাহাকে উপোস বলে। সংস্কৃতে দুই-এক জায়গায় উপবসথ শব্দ পাওয়া যায়, তাহা হইতে উপোষথ হইয়াছে। বৌদ্ধশাস্ত্রে ক্রমে উ লোপ হইয়া পোষথ বা পোষধ হইয়াছে। জৈন ভাষায় আবার ষ, ধ, লোপ হইয়া শুধু পো হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের ধর্মে একটা পো-শালা আছে, সেখানে সকলে আসিয়া পোষধ ব্রত ধারণ করেন অর্থাৎ উপোস করিয়া ধর্মকথা শ্রবণ করেন। অষ্টমী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা এ কয়দিন পোষধের দিন। বুদ্ধদেব নিয়ম করিয়াছিলেন এক আবাসের লোক এক জায়গায় পোষধ করিবে। কিন্তু কেহ কেহ বলিলেন, এ নিয়ম বড়ো কড়া, যাহার যেখানে ইচ্ছা, সে সেখানে পোষধ করিবে। বৃদ্ধেরা বলিলেন, তাহা হইতে পারে না, তথাগতের আজ্ঞা মানিয়া চলিতেই হইবে। আর-সকলে বলিলেন, পৃথক্ পৃথক্ হইয়া পোষধ করিলে, উপাসকদিগের সুবিধা হয়, তাহাদের ধর্মকথা শুনাইবার সুবিধা হয় এবং তাহাতে ধর্মবৃদ্ধি হয়। বৃদ্ধেরা বলিলেন, সকলে একত্র বসিয়া উপবাস করিলে, লুকাইয়া খাইবার সুবিধা হয় না, পৃথক্ পৃথক্ উপবাস করিলে সেটা হওয়ার সুবিধা হয়। সেজন্য আবার ভিক্ষুদের দেখিবার দরকার হয়। সুতরাং ইহা একটা বিবাদের কারণ হইল।

৫. কপ্পতি অনুমতি কপ্পো— বৌদ্ধদের সকল কর্মই সংঘে নির্বাহিত হইত, অর্থাৎ এক বিবাহের যত ভিক্ষু সকলে একত্র বসিয়া (ভোট লইয়া) বিহারের কার্য নির্বাহ করিতেন।

সকল ভিক্ষু উপস্থিত না থাকিলে, কোনো কোনো বিহারের ভিক্ষুরা অনুপস্থিত ভিক্ষুদের অনুমতি পাওয়া যাইবে, এইরূপ মনে করিয়া কার্য নির্বাহ করিয়া লইতেন। এ বিষয়ে যে মতামতি হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। একদল বলিবেন, "অনুপস্থিতেরা যে তোমাদের হইয়া মত দিবেন একথা তোমরা কী করিয়া ভাব।" আর-একদল বলিবেন, "তাহারা তো উপস্থিত ছিলেন না, আমরা কী করি, কাজ তো ফেলিয়া রাখা যায় না।"

৬. কপ্পতি আচিণ্ণ কপ্পো— গুরু করিয়া গিয়াছেন আমিও করিব। পূর্বাপর চলিয়া আসিতেছে ইহাতে দোষ কী? বৃদ্ধেরা বলিবেন, তথাগতের যাহা উপদেশ তাহার তো ব্যতিক্রম হইবার জো নাই। তোমার গুরু কোথায় কী করিয়া গিয়াছেন, সেটা তো আর তথাগতের উপদেশের বিরুদ্ধে প্রমাণ হইবে না। অতএব তোমাকে সে কার্যটি ছাড়িতে হইবে। সে বলিল, বাঃ, বরাবর চলিয়া আসিতেছে, আমার গুরুও করিয়া গিয়াছেন, আমি করিলেই দোষ হইবে? সুতরাং ইহা লইয়া বিবাদের একটা কারণ হইল।

৭. কপ্পতি অমথিত কপ্পো—পূর্বেই বলা হইয়াছে দু প্রহরের পর ভিক্ষুরা জল ও ফলরস খাইতে পারিবে। ঘোলটাকে ভিক্ষুরা রস বলিয়াই মনে করিতেন। ঘোল খাওয়ায় তাঁহাদের দোষ ছিল না। দই মওয়া হইলে তবে তো ঘোল হয়! অনেক ভিক্ষু দইয়ে জল দিয়া পাতলা করিয়া তাহাকে ঘোল বলিয়া খাইতেন। এই যে "আমওয়া" দই এটা ভিক্ষুদের পক্ষে নিষিদ্ধ। অনেক ভিক্ষু বলিলেন, এ নিষেধের কোনো মানে নাই। এ জিনিসটা তো দইয়ে জল দিয়া তৈয়ারি হইয়াছে, ঘোলও জল দিয়া তৈয়ারি হয়। একটা "মওয়া", একটা "আমওয়া"। এতে আর এতই তফাত কী? বৃদ্ধেরা বলিলেন, বেশ তফাত আছে। একটাতে মাখনটা থাকিয়া যায়, আর-একটাতে থাকে না। মাখন তো ফলের রসও নয়, জলও নয়, সুতরাং সেটা তো খাওয়া উচিত নয়। সুতরাং মাখন খাওয়াও যা, "আমওয়া" দই খাওয়াও তা। এ কার্যটি একেবারেই করা উচিত নয়। সুতরাং এটা একটা বিবাদের কারণ।

৮. কপ্পতি জলোগি কপ্পো— মদ গাঁজিয়া উঠিবার পূর্বে জল বলিয়া সেইটাকে খাওয়া। অর্থাৎ তাড়ি হইবার পূর্বে ঝাঁঝওয়ালা রস খাওয়া। ইহা লইয়াও দলাদলি হইল। বৃদ্ধেরা বলিলেন, "ও তো মদ। মদ খাওয়া ভিক্ষুদের নিষেধ। সুতরাং মদ হওয়ার পূর্বে উহাকে খাইলে পেটে যাইয়া মদ হইবে।" অপরে বলিলেন, "আমরা তো মদ খাইলাম না, তথাগতের আদেশ তো পালন করিলাম, পেটে যাইয়া মদ হইলে আমরা কী করিব।"

৯. কপ্পতি অদসকং নিসীদনং— নিসীদন শব্দের অর্থ আসন। আর দশা শব্দের অর্থ কাপড়ের ছিলে। যে আসনের ছিলে না থাকে, বৌদ্ধদের তাহাতে বসিতে নাই। ছিলেগুলি কাটিয়া ছাঁটিয়া দেখিতে যে সুন্দর আসন হয়, তাহাতে বসা ভিক্ষুদের নিষেধ। ভিক্ষুরা অনেকে চান এইরূপ সুন্দর আসনে বসিতে। বৃদ্ধেরা বলেন, তাহাতে ভগবানের যে আজ্ঞা আছে "উচ্চাসনে বা মহাসনে বসিবে না", সে আজ্ঞা লঙ্ঘন হয়। অতএব ছিলাকাটা আসনে বসিতে নাই। বিরুদ্ধবাদীরা বলিলেন, ছিলা কাটিলাম আর না কাটিলাম তাহাতে কী আসিয়া গেল? আমরা উচ্চাসনেও বসিতেছি না, মহাসনেও বসিতেছি না। তবে আমরা ভগবানের আজ্ঞা কী করিয়া লঙ্ঘন করিলাম।

১০. কপ্পতি জাতরূপ রজতন্তি—সোনারূপা গ্রহণ করা বুদ্ধদেবের আদেশে ভিক্ষুদের নিষেধ। কিন্তু বৈশালীর ভিক্ষুরা ছলে ও কৌশলে সোনারূপা লইতেন। কিরূপে লইতেন তাহার উদাহরণ দেখুন। তাঁহারা উপোষথ-শালায় একটি জলপূর্ণ পাত্র রাখিতেন এবং

উপাসকদের বলিতেন, তোমরা এই জলে কার্ষাপণ কাহাপন বা কাহন ফেলিয়া দাও। তাহারা ফেলিয়া দিত, ভিক্ষুরা সোনারূপা ছুঁইতেন না, কিন্তু আপনাদের লোক দিয়া সেগুলি তুলিয়া লইয়া খরচ করিতেন। কার্ষাপণ বলিতে সেকালে চৌকা চৌকা তামার পয়সা বুঝাইত। বৃদ্ধেরা বলিলেন, ইহার দ্বারা বুদ্ধের আজ্ঞা লঙ্ঘন হইল। অন্য ভিক্ষুরা বলিলেন, আমরা তো ছুঁইলাম না, কী করিয়া বুদ্ধদেবের আজ্ঞা লঙ্ঘন হইল। সুতরাং এটিও বিবাদের কারণ হইল।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর ঠিক একশো বৎসর অতীত হইয়া গেলে, বৈশালীর ভিক্ষুরা বিশেষত যাহারা বজ্জি বংশে জন্মিয়াছিল, তাহারা এই দশবস্তু চালাইবার চেষ্টা করিতেছিল। এমন সময় যশ নামে একজন ভিক্ষু বৈশালীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাদিগের দশবস্তু চালাইবার চেষ্টা যে ধর্মবিরুদ্ধ এ বিষয়ে তাঁহার কোনো সন্দেহ রহিল না। তিনি প্রথমেই মহাবনবিহারে উপোষথ-শালায় দেখিলেন একটা ধাতুপাত্রে জল রহিয়াছে, উপাসকেরা তাহাতে কাহাপন দিতেছে। তিনি বলিলেন, এটা বড়ো দোষের কথা। তিনি উপাসকদিগকে বারণ করিয়া দিলেন, তোমরা দিও না। বৈশালীর ভিক্ষুরা খুব চটিয়া গেল। তাহারা নানারূপে তাঁহার উপর অত্যাচার করিতে লাগিল। তিনি পলাইয়া কৌশাম্বী গেলেন। এবং সেখান হতে পাবা ও অবন্তীতে ভিক্ষুদের নিকট লোক পাঠাইয়া দিলেন ও নিজে অহোগঙ্গ পর্বতে গমন করিলেন। সম্ভূত শোনবাসী অহোগঙ্গ পর্বতে বাস করিতেন। যশ তাঁহার নিকট সকল কথা বলিলেন। ক্রমে পাবা হইতে ৬০ জন ও অবন্তী হইতে ৮০ জন ভিক্ষু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির হইল যে, রেবত সকলের চেয়ে প্রাচীন ও সকলের চেয়ে বিদ্বান। তাঁহাকে একথা জানানো যাক। তিনি তক্ষশিলার নিকট বাস করিতেন। সহজাতি নামক স্থানে রেবতের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। রেবত শুনিয়া বলিলেন, এ দশটাই ধর্মবিরুদ্ধ এবং এই দশটাই উঠিয়া যাওয়া উচিত। বৈশালীর ভিক্ষুরা তাঁহাকে নানারূপ প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন এবং তাঁহার এক শিষ্যকে বশ করিয়া ফেলিলেন। রেবত তাঁহাদের কথা শুনিলেন না এবং শিষ্যটিকে বিদায় করিয়া দিলেন। বৈশালীর ভিক্ষুরা পাটলিপুত্রের রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন কিন্তু তাহাতেও তাঁহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইল না।

সহজাতিতে ১১৯০ হাজার ভিক্ষু আসিয়া উপস্থিত হইলেন; কিন্তু রেবত বলিলেন, যাহারা এ বিবাদ উপস্থিত করিয়াছে তাহাদের সম্মুখেই এ বিবাদের নিষ্পত্তি হওয়া উচিত। অতএব তোমরা বৈশালী চলো। সেখানে রেবত দেখিলেন যে, লোকে বাজে কথা কহিয়া সময় নষ্ট করিতেছে। সুতরাং তিনি প্রস্তাব করিলেন উব্বাহিকা করিয়া ইহার নিষ্পত্তি করো। অর্থাৎ আট জন লোককে বাছিয়া লইয়া তাহাদের হাতে নিষ্পত্তির ভার দাও। ৮ জন বড়ো বড়ো ভিক্ষু বাছিয়া লওয়া হইল। ইঁহাদের সকলেরই বয়স এক শতের উপর। ইঁহারা সকলেই তথাগতকে দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই দশবস্তুর বিরুদ্ধে মত দিলেন। ক্রমেই সে মত প্রচার হইল। যাঁহারা সে মত গ্রহণ করিলেন, তাঁহাদের নাম হইল স্থবিরবাদী অথবা থেরাবাদী। যাঁহারা গ্রহণ করিলেন না, তাঁহাদের নাম হইল মহাসাংঘিক। এইরূপে বুদ্ধদেবের মৃত্যুর একশত বৎসর পরে দশটি সামান্য কথা লইয়া ঝগড়া হইয়া বৌদ্ধধর্মের দুই দল হইয়া গেল।

'নারায়ণ'
কার্তিক, ১৩২৩ ॥

১৪

মহাসাংঘিক মত

বুদ্ধদেব কখন পরিনির্বৃত হন, তাহার দিন তারিখ ঠিক নাই। লঙ্কাবাসীরা বলেন, তিনি খৃ. পূ. ৫৪৩ সালে নির্বাণ লাভ করেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বরাবর বলিয়া আসিতেছিলেন যে, এই গণনায় ৬৬ বৎসরের ভুল আছে। তাহার পরে কান্টন নগরে চীন দেশে একখানি কাঠের পাটা পাওয়া যায়, উহাতে কতকগুলি ফোঁটা দেখা যায়। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর দিন হইতে বছর বছর ঐ পাটা সিন্দুকের ভিতর হইতে মহাসমারোহে বাহির করিয়া মঠের ভিক্ষুরা উহাতে একটি করিয়া ফোঁটা দিতেন; ফোঁটা গুণিয়া বৎসর ঠিক করিয়া লইতেন। যখন লেখার ব্যবহার অধিক হয় নাই, তখন অনেক লোকেই ফোঁটা দিয়া হিসাব রাখিতেন; আমরাও বালককালে দেখিয়াছি, পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা ফোঁটা দিয়া ধোপার হিসাব, গোয়ালার হিসাব রাখিত। কান্টন নগরে যে পাটা পাওয়া যায়, তাহাতে ৯৭৫টি ফোঁটা ছিল এবং ৪৮৯ খৃ. সালে শেষ ফোঁটা দেওয়া হয়। সুতরাং ৯৭৫—৪৮৯ = ৪৮৬ খৃ. পূ. সালে বুদ্ধদেব নির্বাণ প্রাপ্ত হন। অনেক বাদানুবাদের পর ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, ৪৮৩ খৃ. পূ. সালেই তাঁহার নির্বাণ হয়।

ইহার পর একশত বৎসর বৌদ্ধদের মধ্যে কোনোরূপ দলাদলি হয় নাই। কিন্তু বৌদ্ধগণ যে বড়ো আনন্দে ছিলেন, তাহা নহে। তাঁহাদের মধ্যে বিলক্ষণ গোলমাল ছিল। যেদিন বুদ্ধদেব মরেন, সেই দিনই সুভদ্দ নামে এক ভিক্ষু বলিয়া বসেন, "আঃ, বাঁচলাম, কঠোর শাসন হইতে আমাদের উদ্ধার হইল। এখন আমরা যা খুশি করিতে পারিব।" যাহা হউক, স্থবিরেরা একত্র হইয়া রাজগৃহের নিকট সপ্তপর্ণী গুহার সম্মুখে এক সংগীতি করিয়া সব গোলযোগ মিটাইয়া দেন ও বুদ্ধদেবের প্রধান শিষ্য মহাকাশ্যপকে[১] সংঘথের করিয়া ধর্মশাসনের বন্দোবস্ত করেন। তদবধি একজন করিয়া সংঘথের থাকিতেন; তিনিই বৌদ্ধদের আপিল-কোর্ট ছিলেন। কোনো গোলযোগ হইলে সকলে তাঁহার নিকট গিয়া পড়িতেন। তিনি যাহা বলিতেন, কাজ সেইরূপ হইত।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর একশত বৎসর পরে অর্থাৎ খৃষ্টের ৩৮৩ বৎসর পূর্বে, সর্বকামী সংঘথের ছিলেন। তাঁহার সময়ে "দশবস্তু" লইয়া বৈশালীর বজ্জিপুত্তদের সঙ্গে যে দলাদলি হয়, সেকথা পূর্বেই বলা হইয়াছে;' তক্ষশিলা হইতে রেবত আসিয়া "উব্বাহিকা" করিয়া যেরূপে দলাদলি মিটাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেকথাও বলা হইয়াছে। থেরাবাদীরা বলেন, তাঁহাদের দিকে ১১,৯০,০০০ ভিক্ষু ছিল; আর বৈশালীওয়ালাদের পক্ষে ১০,০০০ মাত্র। একথা ঠিক বিশ্বাস হয় না। কারণ, বৈশালীওয়ালারা নাম লইল "মহাসাংঘিক"। এত কম হইলে তাহারা কোন্ সাহসে এত

বড়ো নাম লইবে? আর অশোকের পূর্বে এগারো লক্ষ ভিক্ষু থাকাও বড়ো সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের বোধ হয়, সংখ্যায় বিরুদ্ধ দলই বড়ো ছিল; কিন্তু বয়স, বিজ্ঞতা, বিদ্যা, বুদ্ধি, পসার-প্রতিপত্তিতে থেরাবাদীরা বড়ো ছিল। থেরাবাদীদের ইতিহাস পালিগ্রন্থে পাওয়া যায়, কিন্তু মহাসাংঘিকদের ইতিহাস নাই বলিলেই হয়। চীনদেশে যে ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহা কনিষ্কের সময় হইতেই বিশ্বাসযোগ্য; কারণ, তাঁহার সময়ই চীনে বৌদ্ধধর্মের প্রথম প্রবেশ হয়। খৃ. পূ. ৩৮৩ হইতে খৃ. ৭৮ পর্যন্ত মহাসাংঘিকদের ইতিহাস অন্ধকার। অশোকের রাজত্বের ১৭ বৎসরে পাটলিপুত্রে যে সংগীতি হয়[২], মহাসাংঘিকেরা তাহার অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। কনিষ্কের সময় জলন্ধরে যে সংগীতি হয়[৩], থেরাবাদীরাও আবার তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। যাহা হউক, দ্বিতীয় সংগীতি ৩৮৩ হইতে অশোকের সংগীতি পর্যন্ত মহাসাংঘিকদের ছয়টা দল হয় ও থেরাবাদীদের ১২টা দল হয়। সর্বসুদ্ধ ১৮টা দল হইয়া বৌদ্ধেরা একপ্রকার লণ্ডভণ্ড হইয়া যায়। অশোকের অনুগ্রহ পাইয়া থেরাবাদীরা প্রবল হইয়া উঠিল। মহাসাংঘিকদের যে কী দশা হইল, তাহার কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। তাহারা বোধ হয় চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল।

ইহার পরই ৪০/৫০ বৎসরের মধ্যে মৌর্যরাজাদের বিশাল সাম্রাজ্য ভাঙিয়া গেল। যিনি ভাঙিলেন, তিনি শুঙ্গ গোত্রের একজন সামবেদী ব্রাহ্মণ। তাঁহার নাম পুষ্যমিত্র।[৪] প্রাচীন পুথিতে ষ্য ও ষ্প প্রায়ই সমান, সেইজন্য অনেকে মনে করেন যে, তাঁহার নাম পুষ্পমিত্র। তিনি বৌদ্ধদের উপর ঘোরতর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। তিন-চারি শত বৎসর পরে যেমন রোমান সাম্রাজ্যে খৃশ্চিয়ানদিগের উপর অত্যাচার হইত, পুষ্পমিত্র সেইরূপ আরম্ভ করিলেন; তিনি বিধর্মী ও সমাজদ্রোহী বলিয়া অনেক বৌদ্ধের প্রাণসংহার করিলেন। বৌদ্ধেরা তাঁহার নাম পর্যন্ত মুখে আনিত না, মুখে আসিলেও গালি দিত। এ অত্যাচার হইতে মহাসাংঘিক দল অনেকটা রক্ষা পাইয়াছিলেন। কারণ— যাহাদের কথায় অশোক যজ্ঞে পশুহত্যা নিষেধ করিয়া সকল ব্রাহ্মণের, বিশেষত সামবেদী ব্রাহ্মণের মনে দারুণ আঘাত দিয়াছিলেন, তাঁহার রাগটা তাহাদেরই উপর অধিক পড়িয়াছিল। এদিকে আবার থেরাবাদীদের নির্যাতনে মহাসাংঘিকেরা কতকটা হিন্দুদের দিকে ঢলিয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা বুদ্ধদেবকে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বলিয়া মনে করিতেন। বুদ্ধদেব আশি বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন, একথা তাঁহারা মনেও করিতে পারিতেন না। তাঁহারা বলিতেন, তিনি কোনো অনির্বচনীয়ভাবে আছেন। যত দূর দেখা যাইতেছে, তাঁহারাই প্রথমে বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ করিয়া বিহারে স্থাপিত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পুথি-পাঁজি সংস্কৃত-মিশ্রিত ভাষায় লেখা হইত। তাঁহারা বুদ্ধদেবকে "মহাবস্তু" বলিয়া মনে করিতেন। থেরাবাদীরা বিনয়ের কঠোর শাসনে বদ্ধ ছিলেন। ইঁহারা তো গোড়া হইতেই সে শাসনের কঠোরতা নিবারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইঁহারা দর্শনশাস্ত্রের দিকে অধিক ঢলিয়া পড়িলেন।

থেরাবাদীরা মনে করিতেন, বিনয়ের নিয়ম রক্ষা করিতে করিতে তাঁহাদিগের চরিত্র বিশুদ্ধ হইবে এবং চরিত্র বিশুদ্ধ হইলে তাঁহারা অনেক জন্মের পর এমন অবস্থায় আসিয়া পড়িবেন যে, মুক্তির পথ হইতে তাঁহাদিগকে আর ফিরিতে হইবে না। এইরূপ অবস্থাকে

তাঁহারা স্রোতাপত্তি বলিতেন অর্থাৎ স্রোতে পড়িলে যেমন মানুষ আর ফিরে না, ক্রমেই একদিকে ভাসিয়া যায়, সেইরূপ তাঁহারাও নির্বাণের দিকে ভাসিয়া যাইবেন। আরো কিছুদিন পরে তাঁহারা এমন অবস্থায় আসিয়া পড়িবেন যে, তাঁহাদিগকে আর একবার মাত্র জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। ইহাকে তাঁহারা সকৃদাগামী অবস্থা বলিতেন। আরো অগ্রসর হইলে তাঁহাদের আর জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না, ইহার নাম অনাগামী অবস্থা; ইহার পর তাঁহারা অর্হৎ[৫] হইবেন। কিন্তু তাঁহারা মুক্তি পাইবেন না, অর্হৎ হইয়া বসিয়া থাকিবেন। আবার নূতন বুদ্ধ আসিলে তাঁহারা সেই বুদ্ধের উপদেশ শুনিয়া নির্বাণ প্রাপ্ত হইবেন অর্থাৎ নিবিয়া যাইবেন। তাঁহারা আর জন্মগ্রহণ করিবেন না। তাঁহারা জন্ম-জরা-মরণের হাত হইতে একেবারে নিষ্কৃতি পাইবেন। তাঁহারা কর্মের দ্বারাই মুক্তি হয় ভাবিতেন। মহাসাংঘিকেরা মনে করিতেন, বিনয় প্রথম প্রথম কতকটা দরকার হয় বটে, কিন্তু যেমন পাটলিপুত্র হইতে কোনো বণিক যদি বাণিজ্য করিতে যায়, সে প্রথম ঘোড়া হাতি উটের পিঠে ও গাড়িতে মাল চাপাইয়া বরাবর গিয়া তাম্রলিপ্তিতে উপস্থিত হয়; সেখানে গিয়া দেখে যে, আর হাতি ঘোড়া উটও চলিবে না, গাড়িও চলিবে না, এখন নূতন যানবাহনের প্রয়োজন, এখন নৌকা চাই, দাঁড় চাই, হাল চাই, পাল চাই; তেমনি চরিত্রবলে কর্মবলে কতকদূর অগ্রসর হইয়া তাঁহারা এমন স্থানে উপস্থিত হন যে, কর্ম, চরিত্র, বিনয়ে তাঁহাদের কোনোই সাহায্য হয় না, তখন জ্ঞান চাই; সে জ্ঞানলাভের উপায় স্বতন্ত্র—উপকরণ স্বতন্ত্র।

গোড়ায় কথা উঠিয়াছিল, বুদ্ধদেব লৌকিক অপর মানুষের মতো, না অলৌকিক, কেমন দেবতা? থেরাবাদীরা বলিতেন, তিনি মানুষ, মহাসাংঘিকেরা বলিল, না। তিনি অলৌকিক শব্দ ব্যবহার করিতেন না। বলিতেন, লোকোত্তর, তাই মহাসাংঘিকদের আর-এক নাম হইল লোকোত্তরবাদী। 'মহাবস্তু'তে আছে, "অর্ঘ্যমহাসাঙ্ঘিকানাং লোকোত্তরবাদিনাং পাঠেন" ইত্যাদি। তাঁহারা বলিতেন, বুদ্ধদেবের কোনো আশ্রব ছিল না, অর্থাৎ কোনো দোষ ছিল না। অর্থাৎ তাঁহার অহংবুদ্ধি ছিল না, অজ্ঞান ছিল না, এবং জন্মমৃত্যুর তিনি অতীত ছিলেন। থেরাবাদীরা বলিত, প্রথম দুইটি কথা ঠিক হইতে পারে, কিন্তু শেষটি ঠিক হইল কেমন করিয়া? তাহা হইলে তিনি মরিবেন কেন? তিনি যখন মানুষ হইয়া জন্মিয়াছিলেন, তখন মানুষের মতো তাঁহার সবই ছিল। নহিলে তাঁহাকে দেখিয়া কাহারো রাগ হইত, কাহারো ঈর্ষা হইত, কাহারো দ্বেষ হইত কেন? সুতরাং তোমার আমার মতো তিনি মানুষ ছিলেন, তাঁহার আশ্রবও ছিল। মহাসাংঘিকেরা বলিতেন, বুদ্ধদেব কখনো একটি বৃথা কথা কহেন নাই, তিনি যাহাই বলিতেন, তাহাতেই উপদেশ পাওয়া যাইত। তিনি নিরন্তরই লোকের উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিতেন, লোকের উদ্ধার ছাড়া তাঁহার আর কাজই ছিল না। শোওয়া, বসা, দাঁড়ানো ও পাইচারি করা এই চারিটিকে ঈর্য্যাপথ বলে, বুদ্ধদেব যে কোনো ঈর্য্যাপথেই থাকুন, তাঁহার দ্বারা কেবল লোকের উপকারই হইত। থেরাবাদী বলিতেন, একথা আদৌ সত্য নহে, তিনি মানুষ ছিলেন, মানুষের মতো তাঁহাকে খাওয়া দাওয়া করিতে হইত, পাইচারি করিতে হইত, দাঁতন করিতে হইত, স্নান করিতে হইত; এই-সকলের জন্য লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা কহিতে হইত, হুকুম করিতে হইত। এ-সকলের দ্বারা লোক উদ্ধার হইবে কিরূপে? তিনি

অযথা কথা কহিতেন না, বাজে কথা কহিতেন না সত্য, কিন্তু তাঁহার সকল কথায়ই যে লোক উদ্ধার হইত, এটা বড়ো বেশি কথা। মহাসাংঘিকেরা বলিতেন, বুদ্ধদেবের ঘুম ছিল না, সুতরাং স্বপ্নও ছিল না। থেরাবাদীরা বলিতেন, স্বপ্ন ছিল কিনা জানি না, কিন্তু তিনি তো মানুষ, ঘুম ছিল না, সে কী কথা? মহাসাংঘিকেরা বলিতেন, বুদ্ধদেব নিরন্তরই সমাধিমগ্ন থাকিতেন; সুতরাং কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহাকে ভাবিতে হইত না। তিনি একেবারেই তাহার জবাব দিতে পারিতেন ও দিতেন। থেরাবাদীরা বলিতেন, তাঁহাকেও ভাবিয়া জবাব দিতে হইত।

থেরাবাদীরা বলিত, কই, বুদ্ধদেব তো নিজে কখনো বলেন নাই যে, তিনি লোকোত্তর, তবে তোমরা তাঁহাকে "লোকোত্তর" "লোকোত্তর" বলিয়া গোল করো কেন? তাঁহার মতে, যাহা পরমার্থ, তাহাই তিনি শিখাইতেন, তিনি তো কখনো বলেন নাই যে, তিনি অলৌকিক শক্তি লাভ করিয়া এই সকল সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতির ফলে পরমার্থ লাভ করিয়াছিলেন, শিষ্যদিগকেও তাহাই উপদেশ দিতেন। মহাসাংঘিকেরা বলিতেন, সত্য, কিন্তু পড়ো দেখি বুদ্ধের উপদেশ, পড়ো দেখি তাঁহার সূত্রান্ত, দেখো দেখি তাহাতে কত গভীর ভাব, কত গভীর উপদেশ, কত গূঢ় তত্ত্বকথা আছে। সাধারণ মানুষের সাধ্য কী সেসব কথা কয়, সেসব ভাব মনে ধারণা করে, সেসব গূঢ়তত্ত্ব আবিষ্কার করে। এই-সকল কথা লইয়া প্রথম দলাদলি হইতেই বৌদ্ধদের মধ্যে ঝগড়া হইত। শেষ এই-সকল কথা হইতেই মহাসাংঘিক ধর্মের উৎপত্তি হয়।

'নারায়ণ'
মাঘ, ১৩২৩ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ প্রকাশিত *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ* ৩য় খণ্ডে, পৃ. ১৮১ সূত্র ৪ দ্র.
২. এই বইয়ের পৃ. ৭৮ (প্রাসঙ্গিক তথ্য), সূত্র ৬ দ্র.
৩. এই বইয়ের পৃ. ৮০-৮১ (প্রাসঙ্গিক তথ্য), সূত্র ৮ দ্র.
৪. এই বইয়ের পৃ. ৭৮-৭৯ (প্রাসঙ্গিক তথ্য), সূত্র ৭ দ্র.
৫. এই বইয়ের পৃ. ৩০ (প্রাসঙ্গিক তথ্য), সূত্র ৪ দ্র.

১৫

থেরাবাদ ও মহাসাংঘিক

সংস্কৃতে নিদান শব্দের অর্থ আদিকারণ, মূলকারণ, একেবারে গোড়া। বৈদ্যেরা রোগের নিদান খোঁজেন অর্থাৎ মূল কারণ খোঁজেন, তাহার পরে চিকিৎসা করেন। আমরাও সংসার-যাত্রায় সকল ব্যাপারেরই আদি কী দেখিতে চাই। বৌদ্ধেরা যখন সংসারের মূল খুঁজিতে যান, তখন অবিদ্যা, সংস্কার-বিজ্ঞান, নাম-রূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি, জরা, মরণ, এই বারোটি সংসারের নিদান বলিয়া দেখেন। যখন বুদ্ধদেবের নিদান খুঁজিতে যান, তখন তিনি পূর্ব পূর্ব জন্মে বুদ্ধ হওয়ার জন্য কী কী করিয়াছিলেন, তাহাই খোঁজেন। এই বুদ্ধনিদান সম্বন্ধে থেরাবাদীদের ও মহাসাংঘিকদের বিশেষ মতান্তর। থেরাবাদীরা চব্বিশটি বৈ বুদ্ধ মানেন না, ইঁহাদিগের প্রথম হইতেছেন দীপংকর ও শেষ হইতেছেন কাশ্যপ। তাঁহাদিগের নামগুলি এই— ১. দীপংকর, ২. কৌণ্ডিন্য, ৩. মঙ্গল, ৪. সুমনস, ৫. রেবত, ৬. শোভিত, ৭. অনোমদর্শিন্, ৮. পদ্ম, ৯. নারদ, ১০. পদ্মোত্তর, ১১. সুমেধাঃ, ১২. সুজাত, ১৩. প্রিয়দর্শিন্, ১৪. অর্থদর্শিন্, ১৫. ধর্মদর্শিন্, ১৬. সিদ্ধার্থ, ১৭. তিষ্য, ১৮. পুষ্য, ১৯. বিপশ্যী, ২০. শিখী, ২১. বিশ্বভূ, ২২. ক্রকুচ্ছন্দ, ২৩. কনকমুনি, ২৪. কাশ্যপ। ইঁহাদিগের মধ্যে যিনি যিনি শাক্যমুনি বুদ্ধ হইবেন বলিয়া ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়া গিয়াছেন, তিনি তিনিই শাক্যমুনি বুদ্ধের নিদান।[১]

দীপংকর তাঁহার এক শিষ্য মেঘ নামে এক বামনের ছেলেকে বলিয়াছিলেন, অনাগত অধ্বা অর্থাৎ ভবিষ্যকালে তুমি শাক্যমুনি নামে বুদ্ধ হইবে, কপিলবাস্তু তোমার জন্মভূমি হইবে, শুদ্ধোদন তোমার পিতা হইবেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই চব্বিশ জনের মধ্যে আরো ২/৪ জন, শাক্যমুনি সম্বন্ধে ২/৪ কথা বলিয়া গিয়াছেন। চব্বিশ জনের শেষ বুদ্ধ কাশ্যপ বলিয়াছিলেন, হে শিষ্য জ্যোতিষ্পাল, আমার পরেই ভবিষ্যতে তুমি শাক্যমুনি বুদ্ধ হইবে।

এই হইল থেরাবাদ মতে শাক্যসিংহের নিদান। এ মতে বুদ্ধ চব্বিশ জন কেন হইলেন, বুঝিতে পারা যায় না। বোধ হয়, সেকালের লোকে, চব্বিশ সংখ্যাটা বড়ো ভালোবাসিত। থেরাবাদীদের তো চব্বিশ জন বুদ্ধ ছিলেন, জৈনদের চব্বিশ জন তীর্থংকর, সাংখ্যদের চব্বিশটি তত্ত্ব, কোনো কোনো পুরাণেও ভগবানের অবতার চব্বিশটি, আমরা যে-সকল মুনিদের মত লইয়া চলি, তাঁহাদেরও সংখ্যা চব্বিশ। 'চতুর্ব্বিংশতি-মুনিমতম্' নামে একখানি প্রাচীন স্মৃতি-সংগ্রহ আছে।

মহাসাংঘিকদের মতে বুদ্ধনিদান অন্যরূপ। তাঁহাদের মতে বোধিসত্ত্বগণের চারি প্রকার চর্যা অর্থাৎ আচার আছে। এক-এক চর্যায় কত শত জন্ম-জন্মান্তর চলিয়া যায়। থেরাবাদীরা যাহা বলিতেছেন, তাহা শেষ চর্যার শেষ অংশ মাত্র; পূর্ব তিনটি চর্যার নামও ইহাতে নাই। চর্যা চারিটি নাম— ১. প্রকৃতিচর্যা, ২. প্রণিধানচর্যা, ৩. অনুলোমচর্যা, ৪. অনিবর্তনচর্যা। প্রকৃতিচর্যায় বোধিসত্ত্ব মাতৃভক্ত, পিতৃভক্ত, শ্রমণ ও ব্রাহ্মণে ভক্তিমান্,

কুলজ্যেষ্ঠের প্রতি ভক্তিমান্, দশ কুশলকর্মপথের পথিক, লোককে সর্বদাই দান করিতে, পুণ্যকর্ম করিতে উপদেশ দেন, বুদ্ধদিগের পূজা করেন; কিন্তু তাঁহার মন এখনো বোধি লাভের জন্য লালায়িত নয়। ইহার পরে প্রণিধানচর্যা অর্থাৎ আমাকে বুদ্ধ হইতেই হইবে, ইহা বলিয়া প্রতিজ্ঞা করা। এই প্রণিধানচর্যায় পাঁচটি অংশ আছে, এক-একটির নাম প্রণিধি। প্রথম প্রণিধি— আমি বুদ্ধ হইব। দ্বিতীয় প্রণিধি— আমি বুদ্ধকে অনেক বস্তু দান করিলাম। তৃতীয় প্রণিধি— যত কালই যাউক, তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই, আমাকে বুদ্ধ হইতেই হইবে। চতুর্থ প্রণিধি— বুদ্ধ ও সংঘের জন্য অনেক গুহা, অনেক বিহার দান করা। পঞ্চম প্রণিধি— জগৎ অনিত্য এইটি বুঝিতেই হইবে।

ইহার পর তৃতীয়, অনুলোমচর্যা। প্রণিধানচর্যার অনুকূল যাহা-কিছু করিতে হয়, তাহা এই চর্যায়ই করিতে হয়। চতুর্থ, অনিবর্তনচর্যা, এই চর্যায় বোধিলাভের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চিত্ত আর অন্য দিকে ফিরিয়া আসিতে চাহে না, এই চর্যায়ই ব্যাকরণ। এই ব্যাকরণ শব্দের অর্থ গ্রামার নহে, ইহার নাম ব্যাখ্যা অথবা ভবিষ্যদ্‌বাণী। অর্থাৎ কোনো বুদ্ধ তাঁহার শিষ্য বোধিসত্ত্বকে বলিয়া দেন, তুমি ভবিষ্যতে কোনো-না-কোনো সময়ে বুদ্ধ হইবে। থেরাবাদীদের নিদান এই ব্যাকরণ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, উহা এক প্রকার শেষ চর্যার নিদান।

তবে মহাসাংঘিকদের নিদান কিরূপ? চারি চর্যায় অসংখ্য নিদান। শাক্যসিংহের প্রকৃতিচর্যার নিদান অপরিমিতধ্বজ বুদ্ধ। তখন আমাদের শাক্যমুনি একজন চক্রবর্তী রাজা ছিলেন। তিনি ভগবানের নিকটে উপস্থিত হইয়া দশ কুশলকর্মপথের পথিক হন, বৌদ্ধ ভাষায় দশ কুশলকর্মের গোড়া গাড়েন। প্রণিধানচর্যায় আমাদের শাক্যমুনি বুদ্ধের নিদান একজন অতীত শাক্যমুনি বুদ্ধ। আমাদের শাক্যমুনি তখন বণিকশ্রেষ্ঠী ছিলেন, তিনি বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমিও একদিন শাক্যমুনি নামে বুদ্ধ হইব, আমারো একদিন কপিলবাস্তু নামে নগর হইবে। অনুলোমচর্যায় শাক্যমুনির নিদান সমিতাবী বুদ্ধ। তখন শাক্যমুনি একজন চক্রবর্তী রাজা ছিলেন। অনিবর্তনচর্যায় শাক্যমুনির অনেক নিদান; তন্মধ্যে দীপংকর তাঁহার ব্যাকরণ করিয়াছিলেন। দীপংকরের পরে আরো অনেক বুদ্ধ সেই ব্যাকরণের অনুব্যাকরণ করিয়াছিলেন। সর্বাভিভু ভগবান বুদ্ধ অনু-ব্যাকরণ করিয়াছিলেন। বিপশ্যী, ক্রকুচ্ছন্দ, কাশ্যপ শাক্যমুনির ব্যাকরণ করিয়াছিলেন। কাশ্যপ আবার বলিয়াছিলেন, তোমায় আমি যৌবরাজ্যে অভিষেক করিলাম।

যৌবরাজ্যে অভিষেক থেরাবাদীদের নাই, চব্বিশ জনের অধিক বুদ্ধও নাই, কিন্তু মহাসাংঘিকদের মতে সহস্র সহস্র বুদ্ধ। 'মহাবস্তু অবদানে'র[২] আদিতেই "নিদাননমস্কারাণি সমাপ্তানি" বলিয়া একটি ছোট্ট প্যারাগ্রাফ আছে। প্যারাগ্রাফ বলি কেন? অধ্যায় বলিতে পারি না, অত বড়ো নয়। সেই প্যারাগ্রাফে যে কয়েকটি নিদানের নাম আছে, তাহাই আমরা পূর্বে দিয়াছি। কিন্তু বই পড়িতে পড়িতে অনেক বুদ্ধের নাম পাওয়া যায়। একটু উদাহরণ দিতেছি। মহাবস্তুর মূল গদ্যে, কিন্তু তাহার আবার মূল পদ্যে বা গাথায় আছে, তাহারই কয়েকটি তুলিয়া দিতেছি—

শাক্যমুনিনামকানামুপস্থিতাস্ত্রিংশ কোটিয়ো জিনানাং।
অষ্টশতসহস্রাণি দীপঙ্করনামধেয়ানাং ॥ ১ ॥
ষষ্টিং চ সহস্রাণি প্রদ্যোতনামধেয়ানাং ***।
তথ পুষ্পনামকানাং ত্রয়ো কোটিয়ো বাদিসিংহানাং ॥ ২ ॥

অষ্টাদশ সহস্রাণি মারধ্বজনামকানাং সুগতানাং।
যত্র চরে ব্রহ্মচর্য্যং সর্ব্বজ্ঞতামভিলাষায় ॥ ৩ ॥
পূজয়ি পঞ্চশতানি পদ্মোত্তরনামকানাং সুগতানাং।
কৌণ্ডিন্যনামকানামপরাণি দ্বি সহস্রাণি ॥ ৪ ॥
অপরিমিতাসংখ্যেয়া প্রত্যেকজিনান কোটিনযুতাং চ।
পূজয়ি বুদ্ধসহস্রং জম্বুধ্বজনামধেয়ানাং ॥ ৫ ॥
চতুরশীতি সহস্রাণি ইন্দ্রধ্বজনাম[কানাং] সুগতানাং।
নবতিং চ সহস্রাণি কাশ্যপসহনামধেয়ানাং ॥ ৬ ॥
পঞ্চদশ বুদ্ধসহস্রাণি প্রতাপনামকানাং সুগতানাং।
পঞ্চদশ চ সহস্রাণি আদিত্যনামধেয়ানাং ॥ ৭ ॥
দ্বাষষ্টিং চ শতানি সুগতানামন্যোন্যনামধেয়ানাং।
চতুঃষষ্টিং চ সহস্রাণি সমিতাবিনামধেয়ানাং ॥ ৮ ॥
এতে চ কোলিতশিরী অন্যে চ দশবলা অপরিমাণা।
সর্ব্বে অনিত্যতায় সমিতা শোকপ্রদ্যোতা ॥ ৯ ॥
যানি চ বলানি কোলিত তেষাং মহাপুরুষলক্ষবরাণাং।
সর্ব্বে অনিত্যতায় কালং ন উপেন্তি সংখ্যা চ ॥ ১০ ॥
জ্ঞাত্বানানিত্যবলং সুদারুণং সংকৃতস্য অনন্তরং।
বীর্ষারম্ভ যোজিতো অনিত্যবলস্য বিঘাতায় ॥ ১১ ॥[৩]

[শুদ্ধাবাসদেবনিকায়ে প্রস্থানং মৌদ্‌গল্যায়নস্য]

মহাসাংঘিকদের সংখ্যাটা খুব লম্বা লম্বা। কথায় কথায় তিন কোটি, চারি কোটি, নব্বই হাজার, বিশ হাজার, চৌরাশি হাজার বুদ্ধের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। গরিব থেরাবাদীদের অত লম্বা-চৌড়া ছিল না। এদিকে যেমন সংখ্যায় লম্বা-চৌড়া, কালের পরিমাণেও মহাসাংঘিকেরা সেইরূপ লম্বা-চৌড়া। নবনবতিকোটিকল্প মহাযানীরা কথায় কথায় বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের পূর্বপুরুষ মহাসাংঘিকেরাও বড়ো কম যান না। সমিতাবী নামে একজন বুদ্ধ দেখিলেন, আমি নির্বাণ প্রাপ্ত হইলে, এককল্প দু কল্প কোনো বুদ্ধ হইবেন না, সহস্র কল্পের পরে বুদ্ধ হইবেন। কিন্তু এত কাল ধরিয়া তো বুদ্ধ-কার্য হওয়া চাই। বুদ্ধ হইবে না; তো, কে করিবে? অতএব আমাকেই থাকিতে হইল। তিনি শত সহস্র কল্প রহিলেন। পূর্বে বলিয়াছিলেন, সহস্র কল্পের পর বুদ্ধ হইবেন, এখন শত সহস্র কল্প রহিয়া গেলেন! মাঝের ও শতটা যেন কিছুই নয়!

জাপানদেশী সুজুকি সাহেব যে লিখিয়াছেন, অল্পবয়স্ক ভিক্ষুরা বুদ্ধদেব আশি বৎসরে মরিয়া গেলেন বলিয়া বড়োই দুঃখিত হইয়াছিলেন, বুদ্ধদেব তো মনে করিলেই এককল্প দুই কল্প থাকিতে পারিতেন, থাকিলেন না কেন? থেরাবাদীরা বলিলেন, তিনি মরিয়াছেন। অনেক বিরুদ্ধবাদীরা বলিলেন, না, তিনি মরেন নাই, মরিবেনও না, তিনি মৃত্যুর ভান করিয়াছেন মাত্র। কোনো কোনো মহাযানের বইয়ে আছে, সমুদ্রের জলবিন্দু বরং গণিয়া উঠা যায়, সুমেরু গুঁড়াইয়া সরিষার মতো করিয়া ফেলিলে সে সরিষাও গণিয়া উঠা যায়, কিন্তু শাক্যমুনির বয়স গণিয়া উঠা যায় না।

যাহা হউক, বুদ্ধ-নিদান লইয়া এই দুই দলে যে মতান্তর ছিল, তাহার ব্যাখ্যা করা গেল। আরো অনেক জিনিস লইয়া মতান্তর আছে, পরে দেখা যাইবে। তবে একটা কথা এখানে বলিয়া রাখি, পালি জাতকে বুদ্ধদেবের নিদানের কথা চারি দিকে ছড়াইয়া আছে, 'মহাবস্তুতে' সেগুলি একত্র করিয়া একটা ধারা বাঁধিয়া লেখা আছে। ধারা এই যে, চারি চর্যায় যতগুলি নিদান আছে, চর্যাক্রমে সেগুলিকে সাজানো হইয়াছে। কালের পরিমাণ যতই লম্বা-চৌড়া হউক, সময়ানুসারে সেগুলিকে সাজানো হইয়াছে। থেরাবাদীরা "বুদ্ধায় নমঃ" বলিলেই যথেষ্ট মনে করেন, কিন্তু ইঁহারা গোড়ায়ই আরম্ভ করিলেন, "ওঁ নমঃ শ্রীমহাবুদ্ধায়াতীতানাগতপ্রত্যুৎপন্নেভ্যঃ সর্ব্ববুদ্ধেভ্যঃ", অর্থাৎ তাঁহারা এক বুদ্ধকে নমস্কার করিয়া সন্তুষ্ট নহেন, তাঁহারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কালে যত বুদ্ধ হইয়া গিয়াছেন, হইবেন ও হইতেছেন, সকল বুদ্ধকে নমস্কার করিতেছেন। থেরাবাদীরা চব্বিশ ও দুই (শাক্যসিংহ ও মৈত্রেয়) এই ছাব্বিশজনেই সন্তুষ্ট, কিন্তু মহাসাংঘিকেরা "ছাব্বিশকোটিনিযুতশতসহস্রে"ও সন্তুষ্ট নহেন!

নিদান-নমস্কারে প্রকৃতিচর্যায় ভগবান শাক্যসিংহ একজন মাত্র, অর্থাৎ অপরিমিতধ্বজ বুদ্ধের নিকটে ধর্মের গোড়া গাড়িয়াছিলেন, কিন্তু কেবল সংক্ষেপের জন্য সেখানে একজনের নাম করা হইয়াছে। বহুতর বুদ্ধের নিকটেই তিনি ধর্মের গোড়া গাড়িয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম বিস্তার করিয়া দেওয়া আছে। যথা—

"এবমুক্তে আয়ুষ্মান্ মহাকাশ্যপ আয়ুষ্মন্তং মহাকাত্যায়নমুবাচ। ভগবতা ভো জিনপুত্র সম্যক্‌সংবুদ্ধেন শাক্যমুনিনা প্রথমা দ্বিতীয়া তৃতীয়া চতুর্থী পঞ্চমা ষষ্ঠা সপ্তমাসু ভূমিষু বর্ত্তমানের যেষু সম্যক্-সংবুদ্ধেষু কুশলমবরোপিতং, তেষাং সম্যক্‌সংবুদ্ধানাং, কানি নামানীতি। এবমুক্তে আয়ুষ্মান্ মহাকাত্যায়ন আয়ুষ্মন্তং মহাকাশ্যপমুবাচ ॥ যেষু ভো ধৃতধর্ম্মধর সম্যক্‌সংবুদ্ধেষু ভগবতা শাক্যবংশপ্রসূতেন কুশলমূলবরোপিতং। তেষাং বিপুলবলবরকীর্ত্তিনাং নামানি শৃণু ॥[৪]

"প্রথমতঃ, সত্যধর্ম্মবিপুলকীর্ত্তিঃ, ততঃ সুকীর্ত্তিঃ, লোকাভরণঃ, বিদ্যুৎপ্রভঃ, ইন্দ্রতেজঃ, ব্রহ্মকীর্ত্তিঃ, বসুন্ধরঃ, সুপার্শ্বঃ, অনুপবদ্যঃ, সুজ্যেষ্ঠঃ, সৃষ্টরূপঃ, প্রশস্তগুণরাশিঃ, মেঘস্বরঃ, হেমবর্ণঃ, সুন্দরবর্ণঃ, মৃগরাজঘোষঃ, আশুকারী, ধৃতরাষ্ট্রগতিঃ, লোকাভিলাষিতঃ, জিতশত্রুঃ, সুপূজিতঃ, যশোরাশিঃ, অমিততেজঃ, সূর্য্যগুরুঃ, চন্দ্রভানুঃ, নিশ্চিতার্থঃ, কুসুমগুপ্তঃ, পদ্মাভঃ, প্রভংকরঃ, দীপ্ততেজঃ, সপ্তরাজাঃ, গজদেবঃ, কুঞ্জরগতিঃ, সুঘোষঃ, সমবুদ্ধিঃ, হেমবর্ণ-লম্বদামঃ, কুসুমদামঃ, রত্নদামঃ, অলংকৃতঃ, বিমুক্তঃ, ঋষভগামী, ঋষভঃ, দেবসিদ্ধিমাত্রঃ, সুপাত্রঃ, সর্ব্ববন্দ্যঃ, রত্নমকুটঃ, চিত্রমকুটঃ, সুমকুটঃ, বরমকুটঃ, চলমকুটঃ, বিমলমকুটঃ, লোকংধরঃ, বিপুলোজঃ, অপরিভিন্নঃ, পুণ্ডরীকনেত্রঃ, সর্ব্বসহঃ, ব্রহ্মগুপ্তঃ, সুব্রহ্ম, অমরদেবঃ, অরিমর্দ্দনঃ, চন্দ্রপদ্মঃ, চন্দ্রাভঃ, চন্দ্রতেজঃ, সুসোমঃ, সমুদ্রবুদ্ধিঃ, রতনশৃঙ্গঃ, সুচন্দ্রদৃষ্টিঃ, হেমক্রোড়ঃ, অভিন্নরাষ্ট্রঃ, অবিক্ষিপ্তাংশঃ, পুরন্দরঃ, পুণ্যদত্তঃ, হলধরঃ, ঋষভনেত্রঃ, বরবাহুঃ, যশোদত্তঃ, কমলাক্ষঃ, দৃষ্টিশক্তিঃ, নরপ্রবাহঃ, প্রণষ্টদুঃখ, সমদৃষ্টিঃ, দৃঢ়দেবঃ, যশকেতুঃ, চিত্রচ্ছদঃ, চারুচ্ছদঃ, লোকপরিত্রাতা, দুঃখমুক্তঃ, রাষ্ট্রদেবঃ, রুদ্রদেবঃ, ভদ্রগুপ্তঃ, উদাগতঃ, অস্মলিতপ্রবরাগ্রঃ, ধনুনাসং, ধর্ম্মগুপ্তঃ, দেবগুপ্তঃ, শুচিগাত্রঃ, প্রহেতিঃ, প্রথমশতমার্য্যপক্ষস্য ॥"

যেখানে একটি ছিল, সেখানে এই তো এক নিশ্বাসে সাতানব্বইটি নাম পাইলাম। গ্রন্থকার কিন্তু ইহাকেই একশত বলিয়াছেন, হয় তো লেখকের দোষে তিনটি নাম পড়িয়া

গিয়াছে। আর-এক নিশ্বাসে আর-একশত নাম আছে। আরো এক নিশ্বাসে প্রায় আর-একশত নাম আছে। ইহাতে তো "অষ্টমা ভূমি" শেষ হইল। আবার "নবমা ভূমি"তেও এইরূপ। সুতরাং লম্বা হাতে নাম বাড়াইতে মহাসাংঘিক মহাশয়েরা খুব মজবুত। ইঁহাদের সঙ্গে গরিব থেরাবাদীরা পারিবে কেন? কাজেই ক্রমে তাঁহাদিগকে ভারত ছাড়িতে হইয়াছে!

'নারায়ণ'
চৈত্র, ১৩২৩ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. এই বইয়ের পৃ. ৫২-৫৪ (প্রাসঙ্গিক তথ্য), সূত্র ১৯ দ্র.

২. রাজেন্দ্রলাল মিত্রের *The Sanskrit Buddhist Literature of Napal* (১৮৮২ খৃ.) গ্রন্থে 'মহাবস্তু অবদান' অধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর লেখা। এই অধ্যায়ের প্রথম বাক্যে শাস্ত্রীমশায় 'মহাবস্তু অবদান'কে বলেছিলেন, "A cyclopaedia of Buddhist legends and doctrines." বুদ্ধের জীবন-কথার সূত্রে 'মহাবস্তু অবদানে' গৌতম বুদ্ধের আগের বুদ্ধদের কথা, জাতক ও অন্যান্য অজস্র কাহিনী বিবৃত হয়েছে। এরই সঙ্গে মিশে রয়েছে বৌদ্ধশিক্ষার মূল সূত্র এবং বৌদ্ধ আচরণবিধির বিশদ বিবরণ। ফলে, 'মহাবস্তু অবদান' বৌদ্ধবিদ্যার একটি কোষগ্রন্থের রূপ পেয়েছে। এ কালের পাঠকের মনে হতে পারে গ্রন্থটির বস্তু বিন্যাসে কোনো নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেই। বিভিন্ন অংশ শিথিলবদ্ধ। প্রায়ই একই বিবরণ দু বার দেওয়া হয়েছে— গদ্যে এবং গাথায়। ভাষার দিক থেকেও গোটা 'মহাবস্তু'তে সমতা নেই। কোথাও কোথাও ভাষা সংস্কৃতের নিয়মে চলেছে, কোথাও নিয়ম লঙ্ঘন করেছে। শাস্ত্রীমশায় গ্রন্থটির বিন্যাসে শিথিলতার কারণ ভিন্ন দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করেছেন (নিচের উদ্ধৃতি দ্র.)। শাস্ত্রীমশায় মনে করতেন 'মহাবস্তু অবদান' তৃতীয়-দ্বিতীয় খৃস্টপূর্বাব্দের মধ্যে সংকলিত হয়েছিল। Maurice Winternitz বলেন, সম্ভবত দ্বিতীয় খৃস্টপূর্বাব্দেই সংকলনটির মূল কাঠামো প্রস্তুত হয়েছিল, চতুর্থ খৃস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত বা তার পরেও সেই কাঠামোয় নতুন নতুন বস্তু যোগ করা হয়।

বিমলাচরণ লাহার *A Study of the Mahavastu* (1930) বইটির সমালোচনা-নিবন্ধে শাস্ত্রীমশায় 'মহাবস্তু অবদান' সম্পর্কে লেখেন—

"Of the manuscripts presented by Hodgson to the Asiatic Society of Bengal the biggest one was the *Mahavastu Avadana* which occupies in Rajendra Lala's Nep, Bud. Lit. pp. 116-160. At the end of this abstract Rajendra Lala makes a note that Senart is preparing an edition of this work. That edition appeared in 1888 and in that year Senart came to Calcutta. I invited him to my place at Naihati but at the last moment his wife fell ill and he had to leave Calcutta without going to my place.

"When the edition appeared, it was found to be in a Sanskritic form of language the like of which is not to be found in any other work yet published. The language of the poetical pieces resembled that of the poetical pieces in *Lalitavistara* and also in *Saddharmapundarik.* But the prose of the *Mahavastu* is also in a

Sanskritic language but a bit different from that of the poetry. The language problem of the *Mahavastu* is therefore a very important one and it should be carefully studied and analysed and a systematic grammar written about it. Much has been done in this direction by Oldenberg whose judgment and scholarship is admired by all scholars, European and Indian, but much yet remains to be done.

"The poetical pieces are generally a bit more ancient and they are given in support of the prose narration immediately after them; for instance, in the early part of the work *Mahavastu,* there is a description of the hells in prose put into the mouth of Mahamaudgalayana who had the supernatural power of roaming all over the world from the lowest hell to the highest heaven of the Suddhavasa devas. After the short description in prose there is similar description in poetry but put into the mouth of the Buddha himself and the latter is quoted as a voucher of the former. This is one of the fruitful sources of repetition complained of by Berriedale Keith in the note in the form of a foreward to Dr. B. C. Law's study of the *Mahavastu.* But should we take it as a repetition? If the poetry is not repeated no one would believe the statements in prose. If these are tedious repetitions, they are not only to be tolarated but also welcomed as an honest attempt to give the tradition of the work. There are other repetitions, too, but a scholarly spirit should seek to justify them and not scare away students by decrying them.

"The name *Mahavastu,* means 'the great thing', 'the great subject' and the great subject is treated from the beginning to the end in a systematic order. The order is indicated in the Nidana or introductory summary, ...The great thing is the Buddha's spirit which gradually developed in cycles after cycles of years beginning with Aparajitadhvaja to the end of Buddha's ministry and the conversion of his disciples.

"In the Vedic literature especially in the *Yajurveda* the mantras are sometimes separated from the *Brahamanas* as in the white *Yajurveda.* But in the black *Yajurveda* they are so mixed up that some of the Sakhas are likened to a vomit. The *Mahavastu* when compared with other forms of Buddhist literature appeared to be so mixed up as to resemble a vomit. It has jatakas, sutras, vinaya narrations, udanas, all mixed up in one work while both in Sanskrit and in Pali they are different subjects and treated of in differend works. This mixed *Mahavastu* is rather a hard subject for study and though Senart's edition appeared in 1888, few have ventured to study in original Sanskrit.

"...I believe there is a fundamental misconception about the import of this work. The general idea is that it is the work of the Lokottaravadins or those who thought Buddha to be a superhuman and supernatural being, forming a branch of the Mahasanghikas.

Not one sect only of the Mahasanghikas thought him to be lokottara or superhuman but all the Mahasanghikas always thought him to be so. The construction of the sentence, 'Aryamahasanghikanam lokottaravadinam madhyadesikanam pathena vinayapitakasya mahavastue adi', does not justify us in thinking that Lokottaravadins are a branch of the Mahasanghikas. It rather leads us to think that all the Mahasanghikas were Lokottaravadins. There is a list of the 18 sects which arose shortly after the split in the 2nd century after Buddha in the *Mahavamsa* but the Lokottaravadins do not appear there. *The Kathavatthu* composed by monks assembled at the 3rd Buddhist Council at Pataliputta in the 17th year of the reign of Asoka contains the doctrines of all the various Buddhist sects which existed at that time but there is no mantion of any sect known at the Lokottaravadins. So Lokottaravadinam is not the name of a sect but it is an adjective of the Mahasanghikas. If this is true, the attempt of bringing the Mahavattu down to the 3rd century A.D. falls to the ground. The book was written at a period when supporting prose narations by ancient poetical pieces held its ground, i.e., at a time when books like the *Lalitavistara* the *Saddharmapundarika,* etc., were composed and the name of the Mahasanghikas shows that it is at least earlier than these works, because these are pronounced Mahayana works while the *Mahavastu* is not only not a Mahayana work but also a book of the Mahasanghikas, and if we are to believe in Suzuki, the Mahayana developed from the Mahasanghikas some centuries after their formation.

"The *Mahavastu* is a great work not only because it is the history of Buddha for several cycles of kalpas but also for the great ideas of creation, of the origin of government and of other topics of supreme importance in ancient India. In the matter of creation it commences with the Suddhavasa Devas who are self-illumination, self-mobilised, light, whose only food is priti or love and who do not require the help of the sun or the moon to exhist in the world. This self-illuminating being roamed all over space and all over time at their own will without any let or hindrance. How in several kalpas they became human beings is a wonderful development and those who want to know the steps of development are recommended to read the section commencing with the Rajavamsa. The Rajavamsa had its origin not in any divine right but in a pure convention. The cultivators chose the strongest man, appointed him to protect their harvest and compensated him with a sixth of their produce. He is often called Gana-dasa or the servant of the people. The first king is called Mahasammata or 'the Great Elected'; this is a theory of state built upon a pure convention not to be found in any other Indian literature. The descriptions of cities, gardens, palaces, processions, etc., are not only vivid and life-like but true so far as ancient India is concerned. Some of the scenes

are exceedingly beautiful. The scene of Rahula's conversion is pathetic in the extreme. The poor boy asked his mother, in the presence of the Buddha, 'Where is my father? Who is this monk in whom I am getting so much interested? Is he a relation of ours? Why is it that when I sit under his shadow I feel so comfortable?' Suddhodana had given orders that no one should reveal the relation of Buddha to Rahula on pain of death. The hesitation of Yasodhara to tell the truth is beautifully expressed; on the one side the son is pathetically appealing to her and on the other the order of her father-in-law is imperative; but she yields to the importunities of her son and the son at once goes to his father and asks for inheritance and that inheritance in given by handing over the little boy to Sariputta, the chief disciple, for ordination." (*The Calcutta Review,* Sept. 1930. pp. 439-43.)

৩. অনুবাদ : উপস্থিত তিরিশ কোটি শাক্যমুনি (বলে পরিচিত) জিনেদের মধ্যে আট লক্ষ (হলেন) দীপংকর নামধারী ॥ ১ ॥

ষাট হাজার প্রদ্যোত নামধারী। তেমনি তিন কোটি (হল) পুষ্প নামক শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ম উপদেশকারীর সংখ্যা (তর্কে যিনি সিংহ সদৃশ) ॥ ২ ॥

আঠারো হাজার (হল) মারধ্বজ নামধেয়ের। সর্বজ্ঞতা পাবার ইচ্ছা থাকলে যাঁর অধীনে ব্রহ্মচর্য পালন করতে হয় ॥ ৩ ॥

পূজা করেছিল পাঁচ শো (শাক্যমুনি) পদ্মোত্তর নামক বুদ্ধকে। কৌণ্ডিন্য নামকের (আছে) আর দু হাজার ॥ ৪ ॥

অপরিমিত-সংখ্যক, কোটি কোটি ও অযুত অযুত, প্রত্যেক বুদ্ধ পূজা করেছিলেন। পূজা করেছিলেন হাজার জম্বুধ্বজ নামক বুদ্ধকে ॥ ৫ ॥

ইন্দ্রধ্বজ নামক বুদ্ধের সংখ্যা চুরাশি হাজার। কাশ্যপ এই সমান নামধারী (বুদ্ধের সংখ্যা) নব্বুই হাজার ॥ ৬ ॥

প্রতাপ নামক বুদ্ধের সংখ্যা পনেরো হাজার। আদিত্য নামক (বুদ্ধের সংখ্যা) পনেরো হাজার ॥ ৭ ॥

অন্যান্য নামধারী বুদ্ধের সংখ্যা ছ হাজার দুশো। সমিতাবি নামক বুদ্ধের সংখ্যা চৌষট্টি হাজার ॥ ৮ ॥

এইগুলি হল কোলিতশ্রী (রাজোচিত?)। অপর বুদ্ধের সংখ্যা অপরিমিত। সকলে অনিত্যতায় সমবেত, (সকলেই) দশবল এবং লোকউজ্জ্বলকারী ॥ ৯ ॥

যে-সেকল ক্ষমতা 'কৌলিত' (রাজোচিত?)— সেই শ্রেষ্ঠ লক্ষসংখ্যক মহাপুরুষদের, তাঁরা সকলে অনিত্যতার জন্য কালে এবং সংখ্যায় জ্ঞাত নন ॥ ১০ ॥

অনিত্যতার বল জেনে নিয়ে, সৎকর্মের পর, অনিত্যবলের ধ্বংসের জন্য বীর্য অবলম্বন আরম্ভ হয় ॥ ১১ ॥

৪. এই রকম বলা হলে পর আয়ুষ্মান্ মহাকাশ্যপ আয়ুষ্মন্ত মহাকাত্যায়নকে বললেন— হে জিনপুত্র, ভগবান্ সম্যক-সংবুদ্ধ শাক্যমুনি প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম ভূমি অবধি বর্তমান থেকে যেসব সম্যক্-সংবুদ্ধের তত্ত্বাবধানে (জগতে) কুশল নামিয়ে এনেছিলেন সেসব সম্যক্-সংবুদ্ধের নাম কী কী ছিল। এই রকম উক্ত হলে আয়ুষ্মান্ মহাকাত্যায়ন আয়ুষ্মন্ত মহাকাশ্যপকে বললেন— হে পবিত্র ধর্মধর, যেসব সম্যক-সংবুদ্ধের তত্ত্বাবধানে শাক্যবংশ প্রসূত ভগবান্ (জগতে) কুশল নামিয়ে এনেছিলেন সেসব বিপুল-বলবিশিষ্ট শ্রেষ্ঠ কীর্তিসম্পন্ন (সম্যক্ সম্বুদ্ধদের) নামগুলি শোনো।

১৬

মানুষ ও রাজা

পৃথিবীর সকল দেশেই, পৃথিবীর উৎপত্তি কিরূপে হইল, মানুষ কিরূপে জন্মাইল, এই দুইটি কথা লইয়া অনেক বাদানুবাদ হইয়া থাকে। খৃস্টানেরা বলেন, গোড়ায় এক পরমেশ্বর ছিলেন। তিনি বলিলেন, "আলো হউক" অমনি আলো হইল। তিনি দেখিলেন, আলো উত্তম হইয়াছে। অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছায়ই সৃষ্টি হইয়াছে। একথা লইয়াও আবার গোলমাল আছে। কেহ কেহ বলেন, যাহা ছিল না, তাহাই হইল— অর্থাৎ পরমেশ্বরের ইচ্ছায় পরমাণু হইতে জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ড সবই সৃষ্টি হইল। কেহ কেহ বা বলেন, পরমাণু ছিল, ঈশ্বর তাহাই ভাঙিয়া গড়িয়া জগৎ সৃষ্টি করিলেন। আমাদের কোনো কোনো শাস্ত্রে লিখে— ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেন, আমি বহু হইব। অমনি তিনি বহু হইয়া গেলেন। কোনো কোনো শাস্ত্রে বলে— সমস্ত জগৎ "অপ্রজ্ঞাত", "অলক্ষণ" ছিল। বিধাতাপুরুষ তাহাতে বীজ নিক্ষেপ করিলেন। সেই বীজ হইতে এক প্রকাণ্ড অণ্ড উৎপন্ন হইল। অণ্ড দুই ভাগ হইল, এক ভাগে পৃথিবী ও আর-এক ভাগে অন্তরীক্ষ হইল। দার্শনিকদের মধ্যেও কেহ কেহ বলেন এক হইতেই সব হইয়াছে; কেহ বা বলেন, দুই-ই ছিল, দুই হইতেই সৃষ্টি হইয়াছে।

বুদ্ধদেবকে সৃষ্টির কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, তোমার সে কথায় কাজ কী? তুমি আপন চরকায় তেল দাও। তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? কোথায় যাইবে? এই কথাই ভাবো। আকাশ কোথা হইতে হইল, পৃথিবী কোথা হইতে হইল, তাহা ভাবিয়া তোমার দরকার কী? এমন-কি, মানুষ কোথা হইতে আসিল, তাহাও তিনি কোথাও স্পষ্ট করিয়া বলিয়া যান নাই। মহাসাংঘিকেরা কিন্তু মানুষের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটা বিশেষ মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। পরে পালিভাষায়ও সে মত প্রচার হইয়াছিল। কিন্তু মহাসাংঘিকদের মত যে অতি পুরানো, তাহা আমরা পরে দেখাইব। মহাসাংঘিকেরা বলেন, অনাদিকাল হইতেই "সম্বর্ত" (প্রলয়) ও "বির্বত" (সৃষ্টি) চলিতেছে। প্রলয় হইয়া গেলে সমস্ত সত্ত্ব (জীব) "আভাস্বর" নামে এক স্বর্গে উৎপন্ন হয়। আবার যখন সৃষ্টি হয়, লোকের থাকিবার স্থান হয়, কতকগুলি "সত্ত্ব" "আভাস্বর" হইতে নামিয়া পৃথিবীতে উৎপন্ন হন। তখন তাঁহারা "স্বয়ংপ্রভ", "অন্তরীক্ষচর", "মনোময়", "প্রীতিভক্ষ", "সুখস্থায়ী" ও "কামচর" থাকেন। তাঁহাদের নিজের শরীরপ্রভায় দিগন্ত আলোকিত হয়, চন্দ্রসূর্যের প্রয়োজন থাকে না, নক্ষত্রতারার প্রয়োজন থাকে না, আকাশের দরকার হয় না, দিন থাকে না, রাত্রি থাকে না, পক্ষ থাকে না, মাস থাকে না, ঋতু থাকে না, অয়ন থাকে না, বৎসরও থাকে না। তাঁহারা, যখন সেখানে ইচ্ছা, অন্তরীক্ষে ঘুরিয়া বেড়ান। তাঁহাদের আহার প্রীতি এবং বাড়িঘর সুখ। সুখনিবাসে থাকিয়া তাঁহারা প্রীতি ভক্ষণ করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন। তাঁহারা যাহা করেন, সবই ধর্ম।

তাহার পর পৃথিবী উদয় হইল— যেন একটি হ্রদ, জলে পরিপূর্ণ। সে জলের কী রঙ! কী আস্বাদ! মিষ্ট যেন মধু, যেন ক্ষীরের ধারা, যেন ঘৃতের ধারা। কোনো কোনো জীব একটু লোভে পড়িয়া আঙুলের আগায় সেই মধু তুলিয়া একটু চাকিলেন, ভালো লাগিল; আবার চাকিলেন, ক্রমে খাইতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের দেখাদেখি আরো পাঁচ জনে চাকিতে ও খাইতে লাগিলেন। কেহ কেহ বা পেট পুরিয়া খাইতে লাগিলেন। এতদিন জীবগণ লঘুকলেবর ছিলেন; খাইতে খাইতে তাঁহাদের শরীর ভারি হইয়া উঠিল, শক্ত হইয়া উঠিল, কর্কশ হইয়া উঠিল। তাঁহাদের যে গুণগুলি ছিল, সেগুলি ক্রমে লোপ হইল, দেহের জ্যোতি লোপ হইল, শুধু প্রীতি ভক্ষণ করিয়া আর তাঁহাদের চলে না, অন্তরীক্ষে আর তাঁহারা বেড়াইতে পারেন না; সুতরাং চন্দ্রসূর্যের দরকার হইল, নক্ষত্রের দরকার হইল; দিন, রাত্রি, মাস, সংবৎসরের দরকার হইল।

পৃথিবীর রস খাইতে খাইতে তাঁহাদের রঙও সেইমতো হইয়া গেল। এইরূপে অনেক দিন যায়। যাঁহারা অধিক আহার করেন, তাঁহাদের রঙ খারাপ হইয়া উঠে; আর যাঁহারা অল্প আহার করেন, তাঁহাদের রঙ ভালো থাকে। ভালো রঙের লোকে মন্দ রঙের লোককে অবজ্ঞা করে। সুতরাং "আমি বড়ো" "তুমি ছোটো" এই মান-অভিমান জাগিয়া উঠিল। এতদিন যে ধর্ম তাঁহাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল, অভিমানের উদয়ে সে ধর্মের প্রভাব খর্ব হইয়া গেল। পৃথিবী হইতে সে রসও লোপ পাইয়া গেল। তখন তাঁহারা খান কী? পৃথিবীর সর্বত্র ভুঁইপটপটি উঠিল— চারি দিকে যেন ব্যাঙের ছাতা ফুটিয়া উঠিল। আহা, তাহার কী বর্ণ! কী রঙ! কী গন্ধ! কী আস্বাদ! মিষ্ট যেন মৌমাচের মধু। পৃথিবীর রস অন্তর্ধান হইলে জীব-সকল দুঃখে গাইয়া উঠিলেন— হায় রস! হায় রস!

ক্রমে তাঁহারা ভুঁইপটপটি খাইতে লাগিলেন। ভুঁইপটপটির মতো তাঁহাদের রঙ হইল। এইরূপে কত কাল-কালান্তর কাটিয়া গেল। যাঁহারা অধিক আহার করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের রঙ খারাপ হইয়া আসিল; যাঁহারা অল্প আহার করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের রঙ ভালো থাকিল। যাঁহাদের রঙ ভালো, তাঁহারা খারাপ রঙের লোককে অবজ্ঞা করেন। "আমি বড়ো", "তুমি ছোটো" এই মান-অভিমান বাড়িয়া উঠিল। ভুঁইপটপটির লোপ হইল, তাহার জায়গায় বনলতা জন্মাইল। লোকে তাহাই আহার করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের রঙ বনলতার মতো হইয়া গেল। ক্রমে বনলতার বেলায়ও মান-অভিমান আসিয়া জুটিল, বনলতারও লোপ হইল। এবার আসিলেন শালিধান।

এ ধানের কণা নাই, তুষ নাই, অতি সুগন্ধ। সন্ধ্যায় ধান কাটিলে, সকালে আবার গজাইয়া উঠে, সকালে কাটিলে সন্ধ্যায় আবার গজাইয়া উঠে; শুধু গজাইয়া উঠে, এমন নয়, একেবারে ধান পাকিয়া উঠে, বারো ঘণ্টায় একেবারে পাকা ধান পাওয়া যায়। এই ধান খাইয়া লোকে কতকাল রহিল। প্রথম প্রথম সকলেই সকাল-সন্ধ্যা দুই বেলা ধান ঝাড়িয়া আনিত। সকাল-সন্ধ্যায়ই খাইত, সঞ্চয়ের নামটিও করিত না; কিন্তু ক্রমে দু-একজন ভাবিল, দু বেলায়ই ধান কাটিতে হইবে কেন? এক বেলাতেই দু বেলার ধান যোগাড় করিয়া আনি। তাহারা তাহাই করিতে লাগিল। তাহাদের দেখাদেখি অনেকেই সেইরূপ করিতে লাগিল, বরঞ্চ সঞ্চয়ের মাত্রা বাড়িয়া গেল। এখন আর দু বেলার সঞ্চয়ে কুলায় না, দুই দিনের সঞ্চয় হইতে লাগিল, ক্রমে দুই সপ্তাহেরও সঞ্চয় হইতে লাগিল।

ক্রমে ধানের কণা আর তুষ, বাড়িতে লাগিল। আর, সকালে ধান কাটিলে সন্ধ্যায় আর গজায় না, সন্ধ্যায় কাটিলে সকালে আর গজায় না।

অন্নরসের সঙ্গে সঙ্গে আর-এক উৎপাত আসিয়া জুটিল। কতকগুলি জীবের শরীরে পুরুষের চিহ্ন দেখা দিল, কতকগুলি জীবের স্ত্রীচিহ্ন দেখা দিল। তাহারা আবার পরস্পরের প্রতি অনুরাগ দেখাইতে লাগিল, একদৃষ্টিতে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত, ক্রমে দোষ উৎপন্ন হইল। দোষ উৎপন্ন হইলে লোকে লাঠি, ঠেঙা, ঢিল, পাটকেল মারিতে লাগিল, গায়ে ধুলা দিতে লাগিল। দেশে অধর্ম উপস্থিত হইল। অধর্ম উপস্থিত হইল বলিয়া সাড়া পড়িয়া গেল। এ কী? একটি জীব আর-একটি জীবের দোষ উৎপন্ন করিয়া দেয়— এত বড়ো অন্যায়। ইহা ধর্মবিরুদ্ধ, নিয়মবিরুদ্ধ। ক্রমে ক্রমে অনেক দিনের পর এ দোষ সহিয়া গেল। লোকে মনে করিল, ইহা ধর্মসম্মত, সমাজ-সম্মত, সহবতসম্মত। লোকেও প্রথমে ভয়ে ভয়ে একদিন দুই দিন একত্র বাস করিত, এখন মাস, পক্ষ, সংবৎসর একত্র বাস করিতে লাগিল, গৃহকর্ম সকলও স্ত্রীলোকদিগকে করাইতে লাগিল, ক্রমে অধর্মের কথা চাপা পড়িয়া গেল।

ওদিকে কণাওয়ালা, তুষওয়ালা ধান খেত না করিলে আর জন্মায় না। কতকগুলি দুষ্টলোকে অন্যায় করিয়া সঞ্চয় করিতে গিয়া আমাদের এমন সুখের খোরাকে ছাই দিল। যাই হউক, এখন আমাদের এক কাজ করিতে হইবে। এখন খেত ভাগ করিতে হইবে, সীমাসরহদ্দ বাঁধিয়া দিতে হইবে, কাহার কোন্ খেত ঠিক করিয়া দিতে হইবে— এই খেত তোমার, এই খেত আমার, এই খেত রামের, এই খেত শ্যামের। এইরূপে আবার কিছুদিন চলিল।

একজন বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল— আমার তো এই খেত, এই ধান। যদি কম জন্মায়, কী করিয়া চলিবে? সে মনে মনে ঠাহরাইল, দিক আর না দিক, অন্যের ধান আমি তুলিয়া লইব। সে আপনার ধানগুলি সঞ্চয় করিয়া অপরের খেতের ধানগুলি উঠাইয়া লইয়া আসিল। তৃতীয় ব্যক্তি দেখিতে পাইয়া বলিল, "তুমি করো কী? পরের ধান তাহাকে না বলিয়া তুলিয়া আনিতেছ? আর এরূপ করিবে না।" কিন্তু আবার সে পরের ধান না বলিয়া তুলিয়া আনিল। তৃতীয় ব্যক্তি দেখিতে পাইয়া আবার বলিল, "তুমি ফের এই কাজ করিলে?" সে বলিল, "আর এরূপ হইবে না।" কিন্তু কিছুদিন পরে সে আবার পরের ধান উঠাইয়া আনিল। তৃতীয় ব্যক্তি এবার আর চুপ করিয়া রহিল না। সে তাহাকে বেশ উত্তম মধ্যম দিয়া দিল। তখন ধানচোর হাত তুলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল, 'দেখো ভাই, আমাকে মারিতেছে, দেখো ভাই, আমাকে মারিতেছে, কী অন্যায়! কী অন্যায়!" এইরূপে পৃথিবীতে চুরি মিথ্যাকথা ও শাস্তির প্রাদুর্ভাব হইল।

তখন সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিতে লাগিল— আইস, আমরা একজন বলবান্, বুদ্ধিমান্ সকলের মন জোগাইয়া চলে— এমন লোককে আমাদের খেত রাখিবার জন্য নিযুক্ত করি। তাহাকে আমরা সকলের ফসলের অংশ দিব। সে অপরাধের দণ্ড দিবে, ভালো লোককে রক্ষা করিবে, আর আমাদের ভাগমতো ফসল দেওয়াইয়া দিবে। তাহারা একজন লোক বাছিয়া লইল। তাহাকে তাহারা ফসলের ছয় ভাগের এক ভাগ দিতে রাজি হইল। সকলের সম্মতিক্রমে সে রাজা হইল এইজন্য তাহার নাম হইল মহাসম্মত। এইরূপে তেজোময় জীব অনন্ত আকাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে ক্রমে লোভে পড়িয়া

মাটিতে মাটি হইয়া গেল। শেষে তাহাদের খেত আগলাইবার জন্য একজন খেতওয়ালার দরকার হইল। সেই খেতওয়ালাই রাজা, ফসলের ছয় ভাগের এক ভাগ তাহার মাহিনা।

'মহাবস্তু অবদানে' বুদ্ধদেবের জন্মকথা উপলক্ষে এই বৃত্তান্তটি দেওয়া হইয়াছে। এই মহাসম্মতের অনেক পুরুষ পরে ইক্ষ্বাকু, ইক্ষ্বাকুর অনেক পুরুষ পরে শুদ্ধোদন, শুদ্ধোদনের পুত্র বুদ্ধদেব। সুতরাং 'মহাবস্তু'র বর্ণনাটি প্রাচীন বলিয়াই বোধ হয়।

পালি 'ত্রিপিটকে'ও এইরূপ একটি গল্প আছে, 'অগ্‌গিঞ্ঞ সুত্ত', অর্থাৎ অগ্রণ্যসূত্র, অর্থাৎ কে সকলের আগে— গল্পচ্ছলে তাহার উপদেশ। থেরাবাদীরা এ গল্পটি স্বয়ং বুদ্ধদেবের মুখ হইতে বাহির করিয়াছেন। বুদ্ধদেবের এক শিষ্য ছিলেন, তাঁহার নাম বাশিষ্ঠ-ভারদ্বাজ, তিনি যদিও ভিক্ষু হইয়াছিলেন, ব্রাহ্মণের ছেলে বলিয়া মনে মনে গর্ব করিতেন। তাই বুদ্ধদেব একদিন তাঁহাকে এই গল্পটি শুনাইয়া দেন। তিনি বলিয়া দেন, ব্রাহ্মণ অগ্রণ্য নয়, ভিক্ষুই অগ্রণ্য।

যে-কেহ মহাবস্তুর অবদানের 'রাজবংশে আদি' অধ্যায়টি ও "অগ্রণ্য সূত্র"টি মন দিয়া পাঠ করিবেন, তাঁহারই মনে হইবে, 'মহাবস্তু' দেখিয়াই এই সূত্রটি তৈয়ারি হইয়াছে। রাজবংশের কথা বলিতে গেলে রাজা কেমন করিয়া হইলেন, সেটা জানিবার ইচ্ছা আপনিই হয়। সুতরাং ঐরূপ স্থলে রাজা যে সকলের সম্মতি অনুসারে খেত আগলাইবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন, সে কথাটি বলা আবশ্যক। খেত তো খেতই আছে, তাহার আবার আগলানো কী? সুতরাং খেত আগলাইবার কারণও বলার দরকার হয়। কেন খেত আগলাইবার দরকার হয়, বলিতে গেলে বলিতে হয়, লোকের দোষে। সে দোষ কী? কেমন করিয়া হইল, তাহাও বলিবার প্রয়োজন হয়। 'মহাবস্তুতে' এগুলি সব পর-পর বলা আছে। উহাতে বাজে কথা নাই। কিন্তু পালিসূত্রে অনেকগুলি বাজে কথা আছে। স্ত্রীপুরুষে মার খাইয়া বনে পলাইয়া গেল, ক্রমে বনে তাহাদের বাস হইল, বনে গ্রাম নগর পত্তন হইল, ইত্যাদি, ইত্যাদি। এ-সকল কথা এ উপলক্ষে বলার কোনো দরকারই দেখি না। তাই বলিতেছিলাম, 'মহাবস্তু' দেখিয়াই সূত্র প্রস্তুত হইয়াছে। আরো ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র চারি বর্ণের কথা, তাহার মধ্যে ব্রাহ্মণ বড়ো কিনা, এ-সকল কথার মীমাংসা কি এ গল্পের দ্বারা হইতে পারে, এ যেন গণেশের মাথায় গজমুণ্ড দেওয়া। ভাষা দেখিলেও বোধ হয়, 'মহাবস্তু' আগে ও সূত্রটি তাহার পরে।

এখানে আর-একটি কথা বলা আবশ্যক। রাজার উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা দেশে নানা মত চলিতেছে। রাজা যে ঈশ্বরের অংশ— এই মতটি অধিক দেশেই চলিত। রাজা যে প্রজার চাকর, একথা অনেকেই বলিতে সাহস করে না। এখনকার দিনে তো অবস্থাটি ঠিক উল্‌টাইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধদের মধ্যে এই মত অনেক দিন চলিয়াছিল। চন্দ্রকীর্তি[১] খৃ. পঞ্চম শতকে বলিয়াছেন—

গণদাসস্য তে গর্ব্বঃ ষড়্‌ভাগেন ভৃতস্য কঃ।

"তুমি তো দেশের লোকের দাস। ফসলের ছয় ভাগের একভাগ মাহিনাই তোমার জীবিকা। তুমি আবার গুমর করো কী?"

নারায়ণ'
বৈশাখ, ১৩২৪ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. বৌদ্ধদর্শনের অন্যতম শাখা মাধ্যমিক দর্শনের বিশিষ্ট প্রবক্তা চন্দ্রকীর্তি নিজের রচনায় নাগার্জুন ও আর্যদেবের মতবাদ পরিপুষ্ট করেছিলেন। ভিন্‌ট্যরনিট্‌স মনে করেন, চন্দ্রকীর্তি খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে বর্তমান ছিলেন। তারনাথের বিবরণ অনুযায়ী ইনি দক্ষিণ ভারতের সমস্ত নামে কোনো জায়গার অধিবাসী ছিলেন। অল্প বয়সেই মেধার পরিচয় দেন এবং ভিক্ষু হয়ে সমস্ত পিটক এবং নাগার্জুনের সমস্ত শাস্ত্র ও উপদেশ আয়ত্ত করেন। চন্দ্রকীর্তি ধর্মপাল এবং কমলবুদ্ধির ছাত্র ছিলেন। নালন্দায় উপাধ্যায় পদে বৃত হন। তারনাথ উল্লেখ করেছেন, তিব্বতে মনে করা হয়, চন্দ্রকীর্তি ৩০০ বছর বেঁচে ছিলেন, ছবিতে আঁকা গোরু দুইয়ে সংঘের সকলকে ক্ষীর পরিবেশন করতেন, পাথরের সিংহে চড়ে তুর্কি-সৈন্যদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এইসব অলৌকিক কিংবদন্তি থেকে তিব্বতে চন্দ্রকীর্তির প্রতিপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। মাধ্যমিক দর্শনের বিকাশের ধারায় চন্দ্রকীর্তির মতবাদকে বলা হয় প্রাসঙ্গিকবাদ। ভাববিবেক নামে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের একজন মাধ্যমিক দার্শনিক বলেছিলেন, কেবল অন্যের মতের স্ববিরোধ দেখানো ঠিক নয়, তার বিপক্ষে নিজেদের যুক্তি দেখানো উচিত। ভাববিবেকের উপসম্প্রদায়কে স্বতন্ত্র-মাধ্যমিক বলা হয়। এঁর সমকালীন দার্শনিক বুদ্ধপালিত মূল মাধ্যমিক বিচারপদ্ধতির সমর্থক ছিলেন। তাঁর উপসম্প্রদায় প্রাসঙ্গিক নামে পরিচিত। চন্দ্রকীর্তি এই মতই প্রবলভাবে সমর্থন করেন। শ্চেরবাটস্কোই চন্দ্রকীর্তি সম্পর্কে লিখেছেন, "...a mighty champion of the purely negative method of establishing monism; he succeeds in driving Bhavavivek's school, *Madhyamik Svatantra,* into the shade and finally settles that form of the Madhyamika system which is now studied in all monastic schools of Tibet and Mongolia, where it is considered to represent the true philosophic basis of Mahayana Buddhism." (*Buddhist Conception of Nirvana,* Varanasi, p. 67). চন্দ্রকীর্তির প্রধান রচনা 'মাধ্যমিকাবতার' এবং 'প্রসন্নপদা'। মনীষার শক্তিতে এবং যুক্তিনিষ্ঠ অথচ স্বচ্ছন্দ রচনা শৈলীর গুণে চন্দ্রকীর্তি বৌদ্ধ-পণ্ডিতদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখকের মর্যাদা পেয়ে এসেছেন।

এই বইয়ের পৃ. ৭৭-৭৮ (প্রাসঙ্গিক তথ্য), সূত্র ১ দ্র.।

পরিশিষ্ট

বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম

বাংলা দেশের ইতিহাস পাওয়া যায় না। কিন্তু বাংলা যে বহু পূর্বকালে, এমন-কি আর্যগণের পঞ্জাবে আসিবার বহু পূর্বেও সভ্যজাতির বাস ছিল, তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ব্রহ্মপুত্র ও সমুদ্রের মধ্যবর্তী স্থানে অতি প্রাচীনকালে মানুষে হাতি পোষ মানাইয়াছে। 'রামায়ণে' বলো, 'মহাভারতে' বলো, বৌদ্ধ 'ত্রিপিটকে' বলো, 'জাতকে' বলো, জৈন 'অঙ্গ গ্রন্থে' বলো, সব জায়গায় পোষা হাতির কথা শুনা যায়। কিন্তু এই পোষমানানোটি বাংলা দেশের লোকেরই কাজ ছিল। যাহারা পোষ মানাইত তাহারা দীর্ঘকায়, কৃশ অথচ বলিষ্ঠ, এবং স্বর্ণবর্ণ ছিল। তাহারা ঝাঁকড়া চুল রাখিত, চামড়া পরিত এবং হাতির সঙ্গে হিমালয়ের উপর হইতে সমুদ্রের তীর পর্যন্ত গমনাগমন করিত। সে জাতি এখন কোথায় গেল বলিতে পারা যায় না। তবে তাহারা হাতি পোষ মানাইয়া পৃথিবীর একটি বড়ো উপকার করিয়া গিয়াছে।

'ঋগ্বেদে' বাংলা দেশের নাম পাওয়া যায় না। কিন্তু 'ঋগ্বেদে'র 'ঐতরেয় আরণ্যকে' তিনটি জাতির নাম পাওয়া যায়। এখানে জাতি শব্দের অর্থ ইংরাজিতে যাহাকে caste বলে তাহা নহে— কিন্তু ethnic race। একটির নাম বঙ্গ, একটির নাম বগধ এবং আর-একটির নাম চের[১]। দ্রবিড় জাতির সাধারণ নাম চের। একথা কেহ কেহ অস্বীকার করিলেও চেররা দ্রবিড় জাতির যে একটা খুব বড়ো অংশ ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ছোটোনাগপুরে অনেক অর্ধসভ্য জাতি আপনাদিগকে চেরদিগের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়। তাহারা বলিয়া থাকে, রোটাস্‌গড়ের নিকটবর্তী স্থান হইতে তাহারা ছোটোনাগপুরে আসিয়াছিল; কিন্তু কতকাল পূর্বে, সেকথা তাহারা বলিতে পারে না। কোনো কোনো anthropologist বলেন, বঙ্গ বা বং নামে এক দ্রবিড় জাতি বাংলা দেশে বাস করিত। বগধ জাতি এখনো বাংলা দেশে আছে। রাঢ়ের বাগদিরাই তাহাদের বংশধর। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, উহারা আপনাদের ভিতরে যে ভাষায় কথাবার্তা কয়— তাহা বাংলা নয়। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রমুখ ভদ্রজাতিরা সে ভাষা কিছুই জানেন না। আবার অনেকে মনে করেন যে, মগধ ও বগধ একই জাতি, অথবা, এক জাতিরই দুই শাখা মাত্র। মগধের কথা কোনো কোনো বেদে শুনিতে পাওয়া যায়। তথায় বাস করিলে ব্রাহ্মণকে পতিত হইতে হইত।

এতদ্ভিন্ন উত্তরবঙ্গে কিরাত, পৌণ্ড্র এবং কৈবর্ত এই তিনটি জাতি ছিল। বেদের আর্যগণ এই তিন জাতিকে দস্যু বলিয়া বর্ণনা করিতেন। অর্থাৎ তাহারা আর্যদিগের শত্রু ছিল। কিরাতেরা এখন দার্জিলিং ও কাঠমুণ্ডের মধ্যে পর্বতময় দেশে বাস করে। নেপালিরা তাহাদিগকে "কিরান্তি" বলে।[২] মালদহের পুঁড়রা পৌণ্ড্রগণের বংশ। উহাদের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্ধন[৩] অতি প্রাচীনকাল হইতে উত্তরবঙ্গের একটি প্রধান নগর ছিল।

কৈবর্তরা উত্তরবঙ্গে খুব প্রবল ছিল। বল্লালসেন[৪] কৈবর্তদিগকে ভাগ করিয়া এক দলকে উত্তরবঙ্গে রাখেন এবং আর-এক দলকে উড়িষ্যার প্রান্তদেশে বাস করান। এখনো ঐ দুই স্থলে কৈবর্তের সংখ্যা অধিক। সেন্‌সাস রিপোর্টে দেখা যায় বাংলায় যত জাতি (Caste) আছে তাহাদের মধ্যে কৈবর্তের সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা অধিক।

বুদ্ধদেবের জন্মগ্রহণের পূর্বেও বাংলায় এই সকল জাতি বাস করিত। ইঁহারা কতক পরিমাণে সভ্য হইয়াছিল; কারণ, জৈনদিগের প্রায় সকল তীর্থংকরই বাংলা দেশে বিশেষত রাঢ়ে বহুদিন বাস, তপস্যা ও সিদ্ধিলাভপূর্বক আপন আপন ধর্মের মূলভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। জৈন যতিদিগের অনেক আচার ব্যবহার, বিশেষত তাহাদিগের পোশাক পরিচ্ছদ বাঙালিদিগের মতো। বৌদ্ধ যতিদিগেরও তাহাই।

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম দুইটি সাংখ্য দর্শনের ফলে বাহির হইয়াছে। আবার, আশ্চর্যের বিষয় ইহাই যে, সাংখ্যশাস্ত্র-প্রবর্তক কপিলের আশ্রম বাংলাতেই ছিল। খুলনা জেলায় এখনো কপিলমুনি বলিয়া একটি স্থান আছে। গঙ্গাসাগরের নিকট কপিলের অন্য একটি আশ্রমও আছে। বুদ্ধদেব যে প্রথম প্রথম সাংখ্য-পণ্ডিতদিগেরই চেলা হইয়াছিলেন একথা অশ্বঘোষ[৫] স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। কপিলের মতের উপর বুদ্ধদেব কোন্ কোন্ বিষয় নূতন প্রবর্তিত করিয়া নিজ মতের উন্নতি বিধান করিয়াছেন তাহাও অশ্বঘোষ দেখাইয়া গিয়াছেন। কপিল দ্বৈতবাদী ছিলেন, কিন্তু বৈদিক ঋষিরা সকলেই প্রায় অদ্বৈতবাদী। শংকরাচার্য সাংখ্যকে "অশিষ্ট" বলিয়াছেন, অর্থাৎ তিনি মনে করিতেন উহা একটা বেদবহির্ভূত মত। তাঁহারা ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, সাংখ্য নিরাকরণে আমার প্রয়োজন নাই। তবে যে যত্ন করিয়া আমি উহার নিরাকরণ করিতেছি তাহার কারণ, মনু প্রভৃতি কয়েক জন "শিষ্ট" এই মত গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া অনেকের ইহাকে শিষ্ট বলিয়া ভ্রম হইতে পারে, এজন্য নিরাকরণ করা আবশ্যক। শংকরাচার্য কয়েক শতাব্দী পরে হেমাদ্রি[৬] সাংখ্য ও কপিলমতে ভেদ করিয়াছেন। তাঁহার মতে যাহারা সাংখ্যশাস্ত্রে পারদর্শী তাহাদের স্থান অতি উচ্চে এবং যাহারা কপিলমতে পারদর্শী তাহাদের স্থান অতি নীচ। এমন-কি ব্রাহ্মণদের সহিত কপিলদের এক পংক্তিতে বসাও উচিত নহে। বাঙালিদের উপর আর্য ঋষিদিগের এবং তাঁহাদের বংশধরদিগের অনুগ্রহ বড়োই বেশি। তাঁহারা বলেন, তীর্থযাত্রা ভিন্ন বঙ্গ দেশে গেলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। হেমাদ্রি লিখিয়াছেন শ্রাদ্ধের পংক্তিতে বাঙালিকে বসিতে দিবে না। এই-সকল ব্যাপার দেখিয়া স্পষ্টই প্রমাণ হয় যে, বাংলা দেশ আর্যদের দেশ ছিল না। তবে বাংলায় ব্রাহ্মণ কবে আসিল? তাম্রশাসন বা পাথরের লেখা না দেখিলে যাঁহারা কিছুই বিশ্বাস করিতে রাজি হন না তাঁহাদের উপকারার্থ এই কথা বলিতে পারা যায় যে, খৃষ্টীয় ৪৩৬ সালে মহারাজাধিরাজ কুমার গুপ্তের অধিকার কালে রাজশাহি অঞ্চলে একজন ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করা হয়।[৭] ইহার একশত বা দেড়শত বৎসর পরে ফরিদপুরে কতকগুলি ব্রাহ্মণ কিছু কিছু জমিজমা লইয়া বাস করে; এটাও তাম্রশাসনের কথা।[৮] তবে কোনো কোনো পণ্ডিত এই তাম্রশাসনগুলিকে জাল বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান। জাল হইলেও ১০/১২ শত বৎসরের পূর্বে ঐ জাল প্রস্তুত হইয়াছে, স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং বাংলায় ঐ কালে

ব্রাহ্মণের বাসের সম্বন্ধে যে উহা প্রমাণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পঞ্চ ব্রাহ্মণের বাংলায় আসা আদিশূরের সময়ে ঘটে।[৯] আদিশূরের কোনো তাম্রশাসন পাওয়া যায় না— সুতরাং বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিকদিগের মতে আদিশূরের নামে কোনো রাজা থাকাই সম্ভবপর নয়। অতটা বিজ্ঞান কিন্তু সংসারে চলে না। আদিশূর রাজা থাকুন আর নাই থাকুন, কিন্তু পাঁচ জন ব্রাহ্মণ যে এককালে বঙ্গ দেশে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের বংশধরেরা রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রশ্রেণী হইয়া উঠিয়াছেন, একথা সন্দেহ করিবার কোনো কারণ দেখি না। তবে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, সেটা কোন্ কালে? প্রাচীন ঘটকের পুথিতে বলে, বেদে বাণাঙ্গ শাকে ৬৫৪ শকে অর্থাৎ ৭৩২ খৃস্টাব্দে তাঁহারা বাংলায় আসেন একথা অবিশ্বাস করিবার কোনো কারণ নাই; কারণ, তখন সমগ্র ভারতব্যাপী একটা ঘোর আন্দোলন চলিতেছিল। কুমারিল ভট্ট[১০] মীমাংসা সূত্রের শবর-ভাষ্যের এক টীকা লিখিয়া পুনরায় বৈদিকধর্ম প্রচারের চেষ্টা করিতেছিলেন। মহাকবি ভবভূতি[১১] তাঁহারই শিষ্য ছিলেন। তিনি তখন কনোজের ব্রাহ্মণগণের নেতা। কনোজ তখন একজন প্রবল পরাক্রান্ত ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী মহারাজার রাজধানী। সুতরাং সেখান হইতে যে কয়েক জন ব্রাহ্মণ আসিয়া অব্রাহ্মণ বঙ্গ দেশে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রচার করিবেন, তাহা আর বিচিত্র কী? কনোজ হইতে ব্রাহ্মণেরা বাংলায় আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে, এদেশে সাত শত ঘর মাত্র ব্রাহ্মণ আছেন। কিন্তু তাঁহারা নামেই ব্রাহ্মণ, বৈদিক ক্রিয়াকলাপ কিছু জানেন না। তাঁহাদিগের ঐ কথাও অবিশ্বাস করিবার কোনো কারণ নাই। কেন-না ইতিপূর্বে তাম্রশাসন হইতে দেখাইয়াছি যে, বাংলায় ঐকালে ব্রাহ্মণ বাস করাইবার চেষ্টা হইয়াছিল।

কিন্তু সাত শত ঘর অকর্মঠ ব্রাহ্মণ এবং পাঁচ ঘর কর্মঠ ব্রাহ্মণ লইয়া কিছু বাংলা দেশ হয় না। সুতরাং এদেশে অন্য ধর্মও ছিল এবং সে ধর্মের প্রবল একটা যাজককুলও ছিল। হুয়েন-ৎসাঙ ৬২৯ খৃস্টাব্দ হইতে ৬৪৫ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষে থাকিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, বাংলা দেশে তখন এক লক্ষেরও অধিক বৌদ্ধ ভিক্ষুক ভিন্ন ভিন্ন সংঘারামে বা বিহারে বাস করিতেন। এতদ্ভিন্ন অন্য ধর্মাবলম্বী ভিক্ষুরাও ছিলেন— অর্থাৎ জৈন প্রভৃতি ধর্মের ভিক্ষুরাও ছিলেন। ভিক্ষুরা রোজগার করিয়া খান না, ভিক্ষা করিয়া খান। তিন বাড়িতে ভিক্ষা পেলে চতুর্থ বাড়িতে যাইবার তাঁহাদের নিয়ম ছিল না। আবার একবার যে বাড়িতে ভিক্ষা পাইয়াছেন, একমাসের ভিতরে সে বাড়িতে পুনরায় আসিতে পারিবেন না, ইহাও তাঁহাদের নিয়ম ছিল। সুতরাং একটি যতিকে প্রতিপালন করিতে হইলে অন্তত একশত ঘর গৃহস্থ বৌদ্ধ থাকা চাই। অতএব লক্ষাধিক ভিক্ষু প্রতিপালনের জন্য অন্তত এক কোটি বৌদ্ধ গৃহস্থ থাকা চাই। ছিলও তাহাই— দেশটা বৌদ্ধধর্মে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণকে বৌদ্ধেরা তখন গ্রাহ্যই করিতেন না। অন্য ধর্মাবলম্বীদিগকে তাঁহারা তখন বেশ দাবাইয়া রাখিতে পারিতেন।

বাংলা দেশে বৌদ্ধধর্ম কবে আরম্ভ হয় তাহার কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের যাহা মূল স্থান, বাংলা তাহার অতি সন্নিকট। ইহাতে বোধ হয় যে, বুদ্ধদেব জীবিত থাকিতেই এই দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রচার হয়। তিনি নির্বাণের দিনে নিজেই বলিয়া গিয়াছেন, "বাংলার রাজকুমার বিজয়[১৩] আজ সিংহলে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সিংহলে

আমার ধর্ম চিরস্থায়ী হইবে।" সুতরাং বুদ্ধদেবের জীবিতকালে শুধু যে বাংলায় বৌদ্ধধর্ম প্রচার হইয়াছিল এমত নহে কিন্তু বাংলা দেশ হইতে অন্য দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রচারকও যাইতেছিল।

বাংলা দেশে খুব বড়ো বড়ো দুইটি নগর ছিল— একটি পৌণ্ড্রবর্ধন এবং আর-একটি তাম্রলিপ্তি[১৪], প্রাচীন নাম দামলিপ্তি অর্থাৎ তামিলদিগের শহর। ভ্রাতা বীতাশোক পাছে মগধ সাম্রাজ্য লইয়া তাঁহার সহিত ঝগড়া করে এইজন্য অশোক তাহাকে বৌদ্ধ-ভিক্ষু করিয়া পৌণ্ড্রবর্ধনের এক বিহারে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। সুতরাং সেখানেও পূর্ব হইতেই বিহার ছিল। তাম্রলিপ্তি বৌদ্ধদিগের একটি প্রধান আড্ডা ছিল। তাঁহারা এখান হইতে অন্যান্য দেশে বাণিজ্য ও ধর্ম প্রচার করিতে যাইতেন। এই বন্দর দিয়াই অশোকরাজা তাঁহার ছেলে ও মেয়েকে বোধিবৃক্ষের এক ডাল দিয়া সিংহল দেশে পাঠাইয়াছিলেন। সে ডালটি এখন দুই-তিন মাইল ব্যাপী অশ্বত্থ বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং হুয়েন-ৎসাঙের পূর্বে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের কতদূর প্রচার হইয়াছিল তাহার কিছু কিছু আভাস পাওয়া গেল। যে-সকল জাতি বাংলায় বাস করিত— কিরাত, পৌণ্ড্র, কৈবর্ত, বঙ্গ, বগধ সকলেই বৌদ্ধ হইয়াছিল। তবে বৌদ্ধদের একটা দোষ ছিল— পশুহত্যা যাহাদের ব্যবসায় ও জীবিকা তাহাদিগকে তাঁহারা দীক্ষা দিতেন না। কিন্তু যাহারা ঐরূপ জাতীয় ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া সুব্যবসায় গ্রহণ করিত, তাহাদিগকে দিতেন। সেই জন্যই বাংলায় হেলে কৈবর্ত ও জেলে কৈর্বত বলিয়া দুইটি জাতি হইয়াছিল। এক দলে বৌদ্ধ-দীক্ষা পাইত আর-এক দল পাইত না। কিন্তু দীক্ষা পাইত না বলিয়া যে তাহারা বৌদ্ধ ছিল না একথা যেন কেহ মনে না করেন। কারণ শিক্ষা-দীক্ষা না পাইলেও কেবল মাত্র 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' 'ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি' 'সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি' বলিলেই তাহারা বৌদ্ধ হইতে পারিত অর্থাৎ ভিক্ষু মহাশয়েরা তাহাদিগকে কোনোরূপ শিক্ষা-দীক্ষা না দিয়াও তাহাদিগের নিকটে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিতেন।

এখন যাঁহারা হিন্দুধর্মের ও ব্রাহ্মণদের প্রধান ভক্ত তাঁহাদের পূর্বপুরুষেরা প্রায় সকলেই তখন বৌদ্ধ ছিলেন। বৌদ্ধদের যে-সকল সংস্কৃত গ্রন্থ আছে— তাহাদের গ্রন্থকার অনেকেই কায়স্থ বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আচার্য, উপাধ্যায়, ভদন্ত, ভিক্ষু, পিণ্ডপাতিক এবং মহোপাধ্যায় প্রভৃতি নামে ভূষিত হইতেন।

গুপ্ত উপাধিধারী বহু-সংখ্যক লোকে বৌদ্ধগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে রামপাল রাজার সময় অভয়াকর গুপ্ত[১৫] একজন পরম পণ্ডিত এবং প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। বৌদ্ধেরা তখন কোনো ব্রাহ্মণকে আপনাদের দলে টানিতে পারিলে বড়োই আনন্দিত হইত। কেন-না তাহা হইলে তাহাদের সংস্কৃত পুস্তক লিখাইবার বড়োই সুবিধা হইত। এখন নেপালে অবিবাহিত ভিক্ষু নাই। ভিক্ষুরা সকলেই বিবাহ করে, সন্তান উৎপাদন করে এবং নামে মাত্র ভিক্ষু হয়। তথাপি যদি একজন ব্রাহ্মণের ছেলে পায় তবে এখনো তাহারা অত্যন্ত আদরের সহিত তাহাকে ভিক্ষু করিয়া লয়। ঐরূপ হইবার কারণ, ব্রাহ্মণ-ভিক্ষু ও অন্য জাতি ভিক্ষুর মধ্যে একটু তফাত ছিল— ব্রাহ্মণেরা সুশব্দবাদী হইত অর্থাৎ ব্যাকরণ দুরস্ত করিয়া সংস্কৃত লিখিত কিন্তু অব্রাহ্মণ বৌদ্ধেরা একেবারেই সুশব্দবাদী

ছিলেন না, ব্যাকরণের ধারও ধারিতেন না। তাঁহারা বলিতেন, আমরা দেখিব কেবল অর্থশরণতা ার্থাৎ অর্থটি যাহাতে প্রকাশ হয় অর্থাৎ এখানকার নৈয়ায়িকদের যেমন মত ছিল, "অস্মাকানাং নৈয়ায়িকানাং অর্থনি তাৎপর্য্যং শব্দনি কোশ্চিন্তা।" সে যাহা হউক ব্রাহ্মণ-বৌদ্ধের সংখ্যা কিন্তু অত্যন্ত কম ছিল। গুপ্ত উপাধিধারী প্রভাকর গুপ্ত একজন ভারি বিচারমল্ল ছিলেন। তিনি শুভাকর গুপ্তের[১৬] মত প্রচার করিতেন, সর্ববাদী প্রমথনে শুভাকর সিংহস্বরূপ ছিলেন। ইঁহারা দুই জনে শুভাকর গুপ্তের দ্বারা একখানা বৌদ্ধদেব স্মৃতির গ্রন্থ লেখান। তাহার কিয়দংশ পাওয়া গিয়াছে। কর উপাধিধারী অনেকেও বৌদ্ধগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। কয়েক জন তৈলিকপাদ বৌদ্ধধর্ম প্রচারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। বণিকদের তো কথাই নাই। ইঁহারাই বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিতেন ও বিহারের অনেক খরচ চালাইতেন। তদ্ভিন্ন মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিতেন, মঠ প্রতিষ্ঠা করিতেন ও পুস্তক লিখিয়া মঠকে দান করিতেন। ঐরূপে সকল জাতির লোকেই তখন বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। মাছ মারিয়া খায় যে কৈবর্ত সেও বাদ যায় নাই। পাল রাজারা তো বৌদ্ধ ছিলেনই। তাঁহাদের অধীন যত ছোটোছোটো রাজা ছিলেন তাঁহারাও বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। তবে মানতের বেলা তাঁহারা কোনো ধর্মই বাছিতেন না। রোগ শান্তি, ভূত শান্তি, যুদ্ধে জয়-পরাজয় এই-সকলের জন্য সব রকমের দেবতার মানত করিতেন, 'মহাভারতে'র পাঠ শুনিতেন, ব্রাহ্মণদের বাড়ি যজ্ঞে উপস্থিত থাকিতেন, হোমের ফোঁটা লইতেন, ব্রাহ্মণদিগকে ভূমিদান করিতেন, বিষ্ণু শিব প্রভৃতির মন্দির নির্মাণ করিয়া দিতেন। অথচ তাঁহারা বৌদ্ধ ছিলেন। কারণ, ঐ সঙ্গে সকালে উঠিয়া তাঁহারা 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি' 'সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি' বলিতেন, সংঘ-ভোজন করাইতেন, সম্যক্ সম্ভোজন* করাইতেন, স্তূপ নির্মাণ করাইতেন, বিহার নির্মাণ করাইতেন, বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ করাইতেন এবং নানাবিধ বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি নির্মাণ করাইতেন।

বৌদ্ধধর্ম তো শুধু শীল ও বিনয় লইয়া— তাহার মধ্যে দেবদেবীর মূর্তি কোথা হইতে আসিল? ব্রহ্মদেশ, সিংহল প্রভৃতি দেশে এখনো দেবদেবীর প্রাদুর্ভাব তত নাই। কিন্তু বাংলায় খুব ছিল। যাহারা বাংলা হইতে বৌদ্ধধর্ম পাইয়াছে তাহাদের মধ্যেও খুব আছে। যাহারা সিংহলের বৌদ্ধর্ধম দেখিয়া বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা করিয়াছেন তাঁহাদের দেব-দেবীর কথা শুনিলে আশ্চর্য বোধ হইতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক মহাযান মতে অনেক দেবদেবী আসিয়া জুটিয়াছিল। মহাযান মতটা বড়োই দার্শনিক যত কিনা— একেবারে সাংখ্য ভাঙিয়া অদ্বয়বাদে উপস্থিত কিনা— তাই উহাতেই দেবদেবী সকলেরা আগেই আসিয়া জুটিলেন। বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ— মহাযান মতে এই তিনটি জিনিস সূক্ষ্ম হইয়া দাঁড়াইল প্রজ্ঞা, উপায় ও বোধিসত্ত্ব। বুদ্ধ হইলেন উপায়, ধর্ম হইলেন প্রজ্ঞা এবং সংঘ হইলেন বোধিসত্ত্ব। দেখিতে দেখিতে প্রজ্ঞা ঠাকুরানী বুদ্ধের শক্তি হইয়া দাঁড়াইলেন; কারণ উপায় পুংলিঙ্গ এবং প্রজ্ঞা স্ত্রীলিঙ্গ। উভয়ের সংযোগে বোধিসত্ত্বের উৎপত্তি হইল। প্রজ্ঞা নিষ্কাম নিষ্ক্রিয়, উপায়ও নিষ্কাম নিষ্ক্রিয়, সুতরাং সৃষ্টি-স্থিতি-লয় চলে না। একটা

* এক বিহারের সকল ভিক্ষুকে খাওয়ানোর নাম সংঘ-ভোজন আর নিকটবর্তী সকল বিহারের সকল ভিক্ষুকে খাওয়ানোর নাম সম্যক্ সম্ভোজন।

সকাম সক্রিয় শক্তির দরকার— তিনি হইলেন বোধিসত্ত্ব। বুদ্ধ ও ধর্মের অপেক্ষা বোধিসত্ত্বের পূজা বেশি বেশি হইতে লাগিল। কারণ নিষ্কাম নিষ্ক্রিয়ের উপাসনা করিয়া কী হইবে? সুতরাং সকাম সক্রিয় শক্তির উপাসনা হইতে লাগিল— অনেকগুলি বোধিসত্ত্ব ঠাকুর হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাদের মধ্যে অবলোকিতেশ্বর প্রধান। বর্তমান কল্পের ধ্যানী বুদ্ধ অমিতাভ ও তাঁহার শক্তি পাণ্ডরা ইঁহাদের দুই জনের সংযোগে উৎপন্ন অবলোকিতেশ্বর— বর্তমান কল্পের প্রধান দেবতা। তাঁহার অনেক মূর্তি, অনেক মস্তক, অনেক হস্ত, অনেক পদ, অনেক নাম, অনেক মন্দির। তাঁহার ভক্তের সংখ্যাও অনেক বেশি। কারণ এই কল্পে কাহাকেও বুদ্ধ হইতে হইলে তাঁহার কৃপা ভিন্ন হইবার জো নাই। যাহা হউক, বুদ্ধাদির মূর্তিপূজা প্রচলিত হইবার সময় একটা বড়ো মুশকিল হইল— কারণ, এখন হইতে শক্তির সহিত জড়িত বুদ্ধমূর্তির উপাসনা আরম্ভ হইল। সুতরাং আমরা অর্থাৎ অভক্তেরা যাহাকে অশ্লীল বলি, সেই অশ্লীল মূর্তি সমূহেরও পূজা হইতে লাগিল। ঐ মূর্তির যে কত বিচিত্র ভঙ্গি আছে তাহা এখনকার লোকে কল্পনা করিতেই পারে না। অনেকে ইহাকে Tantric Buddhism বলেন। তন্ত্রে শিবশক্তি পূজা, যুগলাদ্য মূর্তির উপাসনা—এখানেও বুদ্ধ ও তাঁহার শক্তি পূজা, যুগলাদ্য মূর্তির উপাসনা। সুতরাং এই উপাসনারও নাম হইল তান্ত্রিক বৌদ্ধোপাসনা। বৌদ্ধধর্মে গোড়ায় যে কঠোরতা, কাঠিন্য ছিল এখন তাহা বেশ সরস হইয়া উঠিল। উহাতে লোকেরও মন ভিজিল। লোকে সহজে নির্মাণের পথ পাইল— ইহারই নাম সহজিয়া ধর্ম। সহজিয়া ধর্মের অর্থ ভগবান্ বুদ্ধ যখন সহজ ভাবে থাকেন। যখন তিনি শক্তির সহিত মিলিত, অথচ শক্তির সন্তান-সম্ভাবনা উপস্থিত হয় নাই। এই সময় ভগবানের কাছে যাহা বর চাওয়া যায় তাহাই পাওয়া যায়। এই সময়েই তাঁহার করুণার পরমা স্ফূর্তি। সুতরাং ভক্তের পক্ষেও উপাসনার এই প্রশস্ত সময়। এই যে সরস মধুর ভাব, ইহা ক্রমে অন্য অন্য ধর্মেও ছড়াইয়া পড়িল। বৈষ্ণবের যুগল মিলনও এই সহজরূপেরই রূপান্তর মাত্র; তবে বৈষ্ণবের সহজিয়া ও বৌদ্ধের সহজিয়া মতে একটু তফাত আছে। বৌদ্ধের সহজিয়া সম্পূর্ণভাবেই রূপক, এবং ঐ রূপক আপনাকে দিয়াও ফলাইতে পারা যায়। কিন্তু বৈষ্ণবের সহজিয়া ঠাকুর-ঠাকুরানীর সহজিয়া—তাহাতে একটু ভক্তিরস থাকে। নিজের দেহের উপর উহার experiment চলে না।

এই যে দেশব্যাপী বৌদ্ধধর্ম, ইহা এখন কোথায় গেল? যখন সহজিয়া ধর্মের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাবে বাঙালি একেবারে অকর্মণ্য ও নির্বীর্য হইয়া গিয়াছিল, ঠিক সেই সময় আফগানিস্তানের খিলিজিয়া আসিয়া উহাদের সমস্ত বিহার ভাঙিয়া দিল— দেবমূর্তি, বিশেষত যুগলাদ্য মূর্তি চূর্ণ করিয়া দিল— সহস্র সহস্র নেড়া ভিক্ষুর প্রাণনাশ করিল। বড়ো বড়ো বিহারে যে-সকল যথার্থ পণ্ডিত ও সাধু ছিলেন তাঁহারাও ঐ সঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন— তাঁহারাই ঐ ধর্মের অস্থি ও মজ্জাস্বরূপ ছিলেন। অস্থি ও মজ্জার নাশ হইলে দেহেরও নাশ হয়, সেইরূপ তাঁহাদের মৃত্যুতে সহজিয়া বৌদ্ধধর্মেরও নাশ হইল।

মুসলমান বিজয়ের এক বা দুই পুরুষ পূর্বে বল্লালসেন রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের সেন্‌সাস লইয়াছিলেন। সাড়ে তিন শত ঘর রাঢ়ী ও সাড়ে চারি শত ঘর বারেন্দ্র হইয়াছিল। ইহার উপর কিছু সাতশতী, কিছু পাশ্চাত্য ও কিছু দাক্ষিণাত্য ছিল। সুতরাং

ব্রাহ্মণসংখ্যা তখন সবসুদ্ধ দুই হাজার ঘরের অধিক ছিল বলিয়া বোধ হয় না। এতদিন ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধ-ভিক্ষুদের সহিত ঘোরতর বিচারে প্রবৃত্ত ছিলেন। কখনো তাঁহারা হঠিতেন, কখনো বা ইঁহারা হঠিতেন। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ প্রণীত বহু-সংখ্যক দার্শনিক পুস্তকে এক ঘোরতর বিচারের নিদর্শন পাওয়া যায়। মুসলমান বিজয়ে বৌদ্ধ-মন্দিরের ও বৌদ্ধ-দর্শনের একেবারে সর্বনাশ হইয়া গেল। উহাতে ব্রাহ্মণদের প্রভাব বৃদ্ধি হইল বটে কিন্তু বৌদ্ধের বদলে এখন মুসলমান মৌলবি ও ফকির তাহাদের প্রবল বিরোধী হইয়া উঠিল। সুতরাং দেশের যেখানে যাহারা জোর বেশি সেখানে তাহার আধিপত্য বিস্তৃত হইয়া পড়িল। ঐরূপে বাংলার অর্ধেক বৌদ্ধ মুসলমান হইয়া গেল এবং অপর অর্ধেক ব্রাহ্মণের শরণাগত হইল আর বৌদ্ধদিগের মধ্যে যাহারা তখন নিজের পায়ে দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল— মুসলমান ও ব্রাহ্মণ উভয় পক্ষ হইতেই তখন তাহাদের উপর নির্যাতন উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকে অনাচরণীয় করিয়া দিলেন অর্থাৎ অসভ্য বাগদি, কৈবর্ত, কিরাতের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন— আর মুসলমানেরা তাহাদের উপর নানারূপ দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল। কিন্তু এই ধর্মপ্রচার ব্যাপারে ব্রাহ্মণদের একটু বাহাদুরি দিতে হয়। তাহারা বাংলার রাজশক্তির সাহায্য প্রায়ই পায় নাই, তথাপি পাঁচটি মাত্র প্রাণী আসিয়া অর্ধেক দেশটাকে যে অল্পকালের মধ্যে হিন্দু করিয়া ফেলিয়াছিল ইহা অল্প বাহাদুরির কাজ নয়।

বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাবকালে যাহারা অনাচরণীয় ছিল এবং মুসলমানাধিকারের পরে নূতন সমাজে যাহারা অনাচরণীয় হইল— বৌদ্ধধর্ম শেষে তাহাদের মধ্যে নিবদ্ধ হইয়া পড়িল এবং তাহারা ক্রমে প্রজ্ঞা, উপায় ও বোধিসত্ত্ব ভুলিয়া গেল। শূন্যবাদ, বিজ্ঞানবাদ, করুণাবাদ ভুলিয়া গেল; দর্শন ভুলিয়া গেল। শীল বিনয় ভুলিয়া গেল। তখন রহিল জনকতক মূর্খ ভিক্ষু অথবা ভিক্ষু নামধারী বিবাহিত পুরোহিত। তাহারা আপনার মতো করিয়া বৌদ্ধধর্ম গড়িয়া লইল। তাহারা কূর্মরূপী এক ধর্মঠাকুর বাহির করিল। এই যে কূর্মরূপ ইহা আর-কিছু নহে, স্তূপের আকার। কূর্মের যেমন চারিটি পা ও গলা— এই পাঁচটা অঙ্গ থাকে, স্তূপেরও তেমনি পাঁচটা অঙ্গ থাকিত। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম চারি দিকে চারিটি ধ্যানীবুদ্ধ থাকিতেন এবং দক্ষিণ-পূর্ব কোণে আর-একটি ধ্যানীবুদ্ধ থাকিতেন— এইরূপে স্তূপটি পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের আবাসস্থান হইয়া ধর্মের সাক্ষাৎ মূর্তিরূপে পরিগণিত হইত। সুতরাং কূর্মরূপী ধর্ম ও স্তূপরূপী ধর্ম একই। পঞ্চ বুদ্ধের প্রত্যেকের যেমন একটি করিয়া শক্তি ছিল, ধর্মঠাকুরেরও তেমন একটি শক্তি হইলেন, তাঁহার নাম কামিণ্যা। তিনি সব দেবতার বড়ো। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, ভগবতী, বিশালাক্ষী, বাশুলি, কালী, গণেশ, রাজা, কোটাল, মন্ত্রী, এই-সকল ধর্মঠাকুরের আবরণ দেবতা। ধর্মঠাকুর আজও যে বাঁচিয়া আছেন, সে কেবল মানতের জোরে। নদীয়ার উত্তর জামালপুরের ধর্মঠাকুরের মন্দিরে বৈশাখি পূর্ণিমার দিনে বারো শত পাঁঠা পড়ে। ধর্মঠাকুর প্রত্যেক স্থানেই কোনো-না-কোনো রোগের ঔষধ দেন। বোড়ালের ধর্মঠাকুর 'ক্ষুদিরায়' রক্তামাশয়ের ঔষধ দেন। সোঁয়াগাছির ধর্মঠাকুর পেটের অসুখের ঔষধ দেন। বৈঁচির নিকটে অচলরায় পিত্তফোটের ঔষধ দেন। তিনি অনাচরণীয় জাতির হাতে পূজা খাইতে ভালোবাসেন। তাঁহার সেবকেরা প্রায় ডোম, হাড়ি ইত্যাদি অনাচরণীয় জাতি।

ধর্মমঙ্গলের কালুরায়কে লাউসেন যখন স্বর্গে নিতে চাহিলেন, কালুরায় (ডোম) তখন জিজ্ঞাসা করিল, সেখানে মদ ও শুয়রের মাংস পাওয়া যায় কিনা। লাউসেন বলিলেন, "না।" কালুরায় উহা শুনিয়া বলিল, "আমি যাইব না।" লাউসেন তখন কালু ডোমের উপর ধর্মঠাকুরের পূজার ভার দিয়া গেল। সেই অবধি ডোমেরা তাঁহার প্রধান পূজক। বাংলা দেশে ইহাই বৌদ্ধ ধর্মের শেষ পরিণাম।[১৭]

'উদ্বোধন'
আষাঢ়, ১৩২৪ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য

বৈশাখি পূর্ণিমায় কলকাতায় বিবেকানন্দ সোসাইটি আয়োজিত বুদ্ধোৎসব সভায় প্রবন্ধটি পড়া হয়েছিল।

১. এই বইয়ের পৃ. ৫০ (প্রাসঙ্গিক তথ্য), সূত্র. ৭ দ্র.

"বঙ্গা বগধাশ্চেরপাদাঃ"—'ঐতরেয় আরণ্যকে'র এই উক্তি অবলম্বন করে শাস্ত্রীমশায়ের দৃঢ় বিশ্বাস দাঁড়িয়েছিল যে, বাংলা দেশের বাগদিরাই 'ঐতরেয় আরণ্যক' উল্লিখিত 'বগধ' জাতির অধস্তন পুরুষ। নৃবিদ্যার কথা বলতে পারি না তবে শব্দবিদ্যার তরফে এই কথা জোর করে বলতে পারি যে বগধ শব্দ থেকে বাগদি শব্দ আসা কিছুতেই সম্ভব নয়। 'ব', 'ম' হতেও পারে কিন্তু শব্দ মধ্যবর্তী 'গ' কখনো অবিকৃত থাকতে পারে না এবং 'ধ'ও নয়।

কোথা থেকে শাস্ত্রীমশায় এই সংবাদ পেয়েছিলেন যে, বাগদিদের একটি স্বতন্ত্র কথ্য ভাষা ছিল; তার কোনো হদিশ নেই। তাঁর এ অনুমান আমার মতে সম্পূর্ণ মরীচিকা কল্পনা। শব্দবিদ্যার অনুসনন্ধানে দীর্ঘকাল ব্যাপৃত থেকে আমি বাংলায় শুধু একটি মাত্র 'জাতি' ভাষার (Caste Language) একদা অস্তিত্বের সন্ধান পেয়েছিলুম। কিন্তু সেও ঠিক ভাষা নয়, বিশিষ্ট ভাষাকোষ (Vocabulary) মাত্র। নিম্ন দামোদর অঞ্চলে মুচিদের মধ্যে আমি বিশিষ্ট শব্দাবলীময় ভাষার অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছিলুম এবং সে ভাষার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়েছিলুম *Indian Linguistics* পত্রিকার 'সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অভিনন্দন খণ্ডে' (১৯৫৫ খৃ.)

শ্রীসুকুমার সেন।

২. কিরাত শব্দটি সম্ভবত কোনো চীন-তিব্বতীয় উপজাতির নামের সংস্কৃত রূপ। পূর্ব নেপালের অধিবাসী ভোট-বর্মি কিরান্তি জাতি কিরাতদের কোনো শাখা হওয়া একান্তই সম্ভব। কিরাতেরা মঙ্গোলীয় জাতি থেকে উদ্ভূত এবং ভারতের অন্যতম প্রাচীন আদিবাসী। এঁদের প্রাচীনতম উল্লেখ আছে যজুর্বেদে। 'বাজসনেয়িসংহিতা' (৩০.১৬) ও 'তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণে' (৩.৪.১২.১) এঁদের পার্বত্য গুহাবাসী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে প্রায়ই কিরাতদের অসভ্য পার্বত্য-বন্য উপজাতি বলে উল্লেখ করা হলেও 'মহাভারতে' অর্জুনকে পরীক্ষা করার জন্য শিব ও পার্বতীর কিরাত-কিরাতীর ছদ্মবেশ নেবার গল্প আছে। এই গল্প কিরাতদের মর্যাদা স্বীকারেরই প্রমাণ বহন করছে। নৃতত্ত্ব এবং

ভাষাতত্ত্বের বিচারে মনে করা হয়, এই মঙ্গোলীয় জাতি খৃস্টপূর্ব দশম শতাব্দীতে ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে আসে এবং কালক্রমে হিমালয়ের পূর্ব ও উত্তর অঞ্চলে ছড়িয়ে যায়। দ্র. Suniti Kumar Chatterjee, *Kirata-Jana-Krti,* The Asiatic Society, Calcutta 1974, pp 28-36.

৩. পৌণ্ড্রবর্ধন, পুণ্ড্রবর্ধন উত্তরবঙ্গের প্রাচীনতম নগর। বর্তমান বাংলাদেশের বগুড়া শহর থেকে ১১/১২ কিলোমিটার দূরে করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে মহাস্থানগড়ের বিস্তীর্ণ এলাকায় পুণ্ড্রবর্ধনের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। স্থলপথ বাণিজ্যের যোগাযোগের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এই সমৃদ্ধ নগর বহু শতাব্দী ধরে শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং আঞ্চলিক শাসন-ব্যবস্থার প্রধান কেন্দ্র ছিল। মৌর্য আমল থেকে ত্রয়োদশ শতকে হিন্দু আমল পর্যন্ত পুণ্ড্রবর্ধনের গৌরব অম্লান ছিল। আনুমানিক ৬৩৮ খৃস্টাব্দে হিউয়েন্-ৎসাঙ দেখেছিলেন এই নগরের পরিধি প্রায় ১০ কিলোমিটার এবং নগরটি জলাশয় ফুল-ফলের বাগানে সাজানো। উৎখননের ফলে পুণ্ড্রবর্ধনের ধারাবাহিক ইতিহাস উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

৪. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ প্রকাশিত *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ* ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৭ সূত্র ২ দ্র.

৫. এই বইয়ের পৃ. ১৯-২১ (প্রাসঙ্গিক তথ্য), সূত্র ১৯ দ্র.

৬. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ প্রকাশিত *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ* ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৯ সূত্র ১৩ দ্র.

৭. কুমারগুপ্তের রাজত্বকাল ৪১৪-৫৫ খৃস্টাব্দ। উত্তরবঙ্গ তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। শাস্ত্রীমশায় এখানে কলইকুড়ি-সুলতানপুর তাম্রশাসনের কথা বলেছেন। শাসনটির তারিখ ১২০ সংবৎসর, গুপ্ত সংবতের ১২০ অব্দ, ১ বৈশাখ; খৃস্টাব্দ ৪৩৯-৪০। এই শাসনে শৃঙ্গবের বীথীর (আধুনিক মহকুমার মতো প্রদেশের প্রশাসনিক এলাকা) অন্তর্গত পূর্ণ-কৌশিকা থেকে আয়ুক্তক (বীথীশাসক) অচ্যুতদাস ও এই বীথীর অধিকরণ (পঞ্চায়েতের মতো শাসনসভা) তিন জন "বাজসনেয় চরণের চতুর্বেদী" ব্রাহ্মণকে অক্ষয়নীবীস্বরূপ (দান-বিক্রির অধিকারহীন স্থায়ীভাবে ভোগের যোগ্য) জমি দানের নির্দেশ দিয়েছেন। ব্রাহ্মণ তিন জনের নাম দেবভট্ট, অমরদত্ত এবং মহাসেনদত্ত। নামের সঙ্গে দত্ত পদবি থাকলেও শেষের দু জনও ব্রাহ্মণ। তাই একজন ব্রাহ্মণকে নয়, তিন জন ব্রাহ্মণকে জমি দানের উল্লেখ আছে। দ্র. দীনেশচন্দ্র সরকার, 'শিলালেখ-তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ', কলকাতা ১৯৮২, পৃ. ২২-২৯, ২০৯।

৮. এখানে ধর্মাদিত্যের প্রথম (৩ রাজ্যাঙ্ক) ও দ্বিতীয় কোটালিপাড়া তাম্রশাসন এবং গোপচন্দ্রের ১৮ রাজ্যাঙ্কের কোটালিপাড়া তাম্রশাসনের কথা বলা হয়েছে। ষষ্ঠ শতাব্দীতে গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য এবং সমাচারদেব ও জয়নাগ বাংলায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেছিলেন। গোপচন্দ্র এবং ধর্মাদিত্যের মধ্যে কে আগে রাজত্ব করেছিলেন এ বিষয়ে মতভেদ আছে। ধর্মাদিত্যের শাসন দুটিতে বারক মণ্ডলে, আধুনিক ফরিদপুরে চন্দ্রস্বামী এবং বসুদেবস্বামী ও গর্গস্বামী নামে ব্রাহ্মণ জমির গ্রহীতা। গোপচন্দ্রের শাসনে গ্রহীতা লৌহিত্য-তীরবাসী কাণ্বগোত্রের ব্রাহ্মণ ভট্টগোত্রীদত্তস্বামী।

কোটালিপাড়ায় পাওয়া ৫ খানি তাম্রশাসনের মধ্যে ধর্মাদিত্যর দু খানি ও গোপচন্দ্রের একখানি লিপি (*I-A,* xxxix, 1910, pp. 139-216) এবং সমাচারদেবের একখানি লিপি (*J-A-S-B.,* NS. vii, p.476) Frederic Eden Pargiter সম্পাদনা করেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই চারটিকেই জাল বলেছিলেন *(J-A-S-B.,* N.S. vi, p. 429; vii. p. 289; x. p. 425) রাখালদাসের মত গ্রাহ্য হয় নি।

৯. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ প্রকাশিত *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ* ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৬ সূত্র ১ দ্র.

১০. মীমাংসা-দর্শনের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কুমারিল ভট্ট, জীবৎকাল খৃস্টীয় সপ্তম শতক। জন্মস্থান মধ্যভারত, মতান্তরে কামরূপ অঞ্চল। 'শঙ্করদিগ্বিজয়' গ্রন্থে শংকরের উক্তিতে বলা হয়েছে, বেদবিহিত কর্মে বিমুখ সুগতপন্থীদের পর্যুদস্ত করার জন্য গুহ (কার্তিকেয়) কুমারিলরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। রাজশক্তির পোষকতায় পুষ্ট সুগত-পন্থী অর্থাৎ বৌদ্ধদের প্রতিপত্তিতে বেদ চর্চা শিথিল হয়ে এসেছিল। বৌদ্ধরা নিজেদের সিদ্ধান্তের অনুকূলভাবে শ্রুতি ও মীমাংসারও ব্যাখ্যা করতেন। এই সময়ে কুমারিলভট্ট মীমাংসাকে আস্তিক পথে আনবার জন্য যত্নবান হয়েছিলেন।

'শ্লোকবার্ত্তিকে'র শুরুতে কুমারিল বলেছেন—

'প্রায়েনৈব হি মীমাংসা লোকে লোকায়তীকৃতা।

তামাস্তিকপথে কর্ত্তুময়ং যত্নঃ কৃতো ময়া ॥ এই তত্ত্বগত সংগ্রামের দায়িত্ব পালনের জন্যই তাঁকে কার্তিকেয়র অবতাররূপে মাননা করা হয়। বেদব্যাসের শিষ্য জৈমিনি 'মীমাংসাদর্শন' নামে মূল সূত্রগ্রন্থ রচনা করেন। 'মীমাংসাদর্শনে'র ভাষ্য রচনা করেন শবরস্বামী। ভারতীয় দর্শনসূত্রের ভাষ্য যা-কিছু রচিত হয়েছিল তার মধ্যে শবরস্বামীর ভাষ্যই সম্ভবত প্রাচীনতম। শবরস্বামীর ভাষ্য অনুসরণ করে কুমারিল 'শ্লোকবার্ত্তিক', 'তন্ত্রবার্ত্তিক' ও 'টুপটীকা'— এই তিনখানি গ্রন্থ লেখেন। 'শ্লোকবার্ত্তিকে' তিনি জৈন-বৌদ্ধ প্রভৃতি মত খণ্ডন করে বেদের অপৌরুষেয়ত্ব, স্বতঃপ্রামাণ্য এবং বেদের অনুকূল সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করেছেন। 'মীমাংসাসূত্রে'র প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদ— "তর্কপাদে"র শাবরভাষ্য 'শ্লোকবার্ত্তিকে'র অবলম্বন। সম্পূর্ণ শ্লোকে রচিত। 'তন্ত্রবার্ত্তিকে'র অবলম্বন "তর্কপাদে"র পর থেকে তৃতীয় অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত অংশের শাবরভাষ্য। 'তন্ত্রবার্ত্তিক' গদ্য ও পদ্য মিশিয়ে লেখা। অবশিষ্ট শাবরভাষ্যের ব্যাখ্যা 'টুপটীকা' বা 'অনুষ্টুপটীকা'। অনুষ্টুপ ছন্দে লেখা 'টুপটীকা' এখন পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় গদ্য পাঠ। দ্র. ভূতনাথ সপ্ততীর্থ, "কুমারিলভট্ট", 'ভারতকোষ'; সুখময় ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ, 'পূর্ব্বমীমাংসাদর্শন', কলকাতা ১৯৮৩ খৃ., পৃ. ৭-১৩।

১১. 'মহাবীরচরিত', 'উত্তররামচরিত', 'মালতীমাধব' প্রণেতা ভবভূতির কাল সম্পর্কে অনিশ্চয়তা আছে। তিনি কালিদাসের পরবর্তী লেখক। কল্‌হণের 'রাজতরঙ্গিণী'তে কান্যকুব্জরাজ যশোবর্মনের আনুকূল্যপুষ্ট বলে একসঙ্গে ভবভূতি এবং বাক্‌পতিরাজের উল্লেখ আছে। বাক্‌পতিরাজ যশোবর্মনের প্রশস্তিময় 'গৌড়বহ' কাব্যে ভবভূতির উদ্দেশে তাঁর কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। 'গৌড়বহ' ৭৩৬ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে, কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্যের হাতে যশোবর্মনের পরাজয় ও লাঞ্ছনার আগে লেখা হয়েছিল। এই তথ্যের ভিত্তিতে মনে করা হয় ভবভূতি সপ্তম শতাব্দীর শেষ বা অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। কাশ্যপ গোত্রের কোনো ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বংশে তাঁর জন্ম। বাবার নাম নীলকণ্ঠ, মা জাতুকর্ণী। পদবি উদুম্বর। তাঁর নিবাস ছিল সম্ভবত বিদর্ভের পদ্মপুর নামে কোনো জায়গায়। 'মালতী-মাধব' নাটকের একটি পুথিতে তৃতীয় অঙ্কের পুষ্পিকায় এই নাটক কুমারিল-শিষ্যের রচনা বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। মাত্র একটি পুথির উল্লেখ থেকে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা যায় না। তবে সময়ের দিক থেকে ভবভূতির পক্ষে কুমারিলের শিষ্য হওয়া অসম্ভব নয়, বিশেষত তাঁর নাটকে মীমাংসাদর্শনে অর্জিত বিদ্যার পরিচয় আছে। দ্র. *H-S-L*, pp. 277-78.

১২. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ প্রকাশিত *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ* ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮৫ সূত্র ১ দ্র.

১৩. বিজয় সিংহের কাহিনী আছে খৃষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকে লেখা সিংহলের পালি গ্রন্থ 'দীপবংস' এবং 'মহাবংসে'। "লাঢ়" দেশের রাজা সিংহবাহুর ছেলে বিজয়। অশিষ্ট আচরণের জন্য ৬৯৯ জন অনুচর সহ সিংহবাহু তাঁকে নির্বাসিত করেন। নৌকায় ভাসতে ভাসতে বিজয় লঙ্কায় পৌছন বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণের দিনে (৪৮৩ বা ৪৮৬ খৃ. পূ.)। সিংহলে তিনি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই কাহিনীর সত্যাসত্য নির্ণয়ের মতো কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় নি। "লাঢ়"কে বাংলার "রাঢ়" অনুমান করে বিজয় সিংহকে বাঙালি বলা হয়। ভিন্নমতে "লাঢ়" "লাট", অর্থাৎ গুজরাট। শাস্ত্রীমশায় 'মহাবংসে' বিধৃত বুদ্ধদেবের উক্তি এখানে ব্যবহার করেছেন। 'মহাবংসে'র বর্ণনায় পরিনির্বাণের সময়ে সমবেত দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্রের উদ্দেশে বুদ্ধদেবের উক্তিতে বাংলা দেশ নয়, "লাঢ়"-এরই উল্লেখ আছে।

১৪. মেদিনীপুর জেলার তমলুক, প্রাচীন নাম তাম্রলিপ্ত। সিংহলের 'মহাবংস' গ্রন্থে উল্লেখ আছে অশোকের নির্দেশে মহেন্দ্র এবং সংঘমিত্রা বোধিদ্রুমের চারা নিয়ে এই বন্দর থেকে সিংহলে গিয়েছিলেন। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক প্লিনি এবং দ্বিতীয় শতাব্দীর গ্রীক লেখক টলেমির রচনায় তাম্রলিপ্তির উল্লেখ আছে। পঞ্চম শতাব্দীর গোড়ায় চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন এখানে ২২টি সংঘারাম দেখেছিলেন। সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন্-ৎসাঙ ১০টি সংঘারাম দেখেন। এক হাজারের বেশি ভিক্ষু এইসব সংঘারামে বাস করতেন। উৎখননে আবিষ্কৃত পুরা-নিদর্শন থেকে মৌর্য, শুঙ্গ এবং কুষাণযুগের নাগরিক সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। হিউয়েন-ৎসাঙের বিবরণ অনুযায়ী তখন সমুদ্রের একটি খাড়ির উপরে তাম্রলিপ্তের অবস্থান ছিল। স্থলপথ এবং জলপথ মিলিত হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে এই নগর ব্যবসার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল।

১৫. শরচ্চন্দ্র দাস তিব্বতি সূত্রে পাওয়া তথ্য নির্ভর করে অভয়াকর গুপ্ত নবম খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন বলেছেন। ফণীন্দ্রনাথ বসু মনে করেন, অভয়াকরের জন্ম একাদশ খৃষ্টাব্দের শেষ বা দ্বাদশের প্রথমে। (*Indian Teachers of Buddhist Universities,* p. 81)। জন্ম গৌড়ে, শিক্ষা মগধে। অধ্যয়ন-অধ্যাপনার জন্য অভয়াকর কঠোর পরিশ্রম করতেন। শব্দবিদ্যা, শিল্পস্থানবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, হেতুবিদ্যা, অধ্যাত্মবিদ্যা— এই পাঁচ বিষয়ে তিনি পারংগম ছিলেন। রাজা রামপাল প্রাসাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য তাঁকে আহ্বান করতেন। দীপংকরের মতো অভয়াকরের রচনা ও অনুবাদের সংখ্যা অনেক। তিনি তিব্বতিভাষা ভালো জানতেন। 'শ্রীমহাকালসাধননাম', 'শ্রীমহাকালান্তরসাধননাম' প্রভৃতি ৭ খানি তন্ত্রের বই তিব্বতিভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। 'শ্রীকালচক্রোদ্দান', 'শ্রীচক্র-সংবরাভিসময়', 'স্বাধিষ্ঠানকর্মোপদেশনাম' প্রভৃতি ২৬ খানি গ্রন্থ তাঁর মৌলিক রচনা। তেঙ্গুরের তালিকায় তাঁর নামের সঙ্গে পণ্ডিত, মহাপণ্ডিত, আচার্য, সিদ্ধ ও স্থবির বিশেষণ যুক্ত দেখা যায়।

১৬. এই বইয়ের পৃ. ১৯ (প্রাসঙ্গিক তথ্য), সূত্র ১৮ দ্র.

১৭. ধর্মপূজা বিষয়ে তথ্যের জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ প্রকাশিত *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ* ৩য় খণ্ড, পৃ. ২২২-২৯ দ্র.